CALCUTTA UNIVERSITY.

ÇRIGOPÁLA VASUMÁLLIK'S FELLOWSHIP.

1898.

LECTURES

ON

HINDU PHILOSOPHY

BY

MAHÁMAHOPÁDHYAYA

CHANDRAKÁNTA TARKÁLANKARA.

LATE PROFESSOR, CALCUTTA SANSKRIT COLLEGE,

HONOURARY MEMBER,
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, &C. &C.

SECOND EDITION.

PRINTED BY UPENDRA NÁTHA CHAKRAVARTTI,
AT THE SANSKRIT PRESS,
No. 62, AMHERST STREET, CALCUTTA.
1904.

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল বসুমল্লিকের

ফেলোশিপের লেক্‌চর।

প্রথম বর্ষ।

হিন্দুদর্শন।

স্তুবন্তি গুর্ব্বীমভিধেয়সম্পদং
বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতিপুরুষং রুচৌ
সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ॥

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৬২ নং আম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীট্‌, সংস্কৃতযন্ত্রে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮২৬।
আষাঢ়।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের বিদ্যানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি ও বদান্যতায় এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রথম ফেলোশিপের সৃষ্টি হইল। এজন্য তিনি দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। হিন্দুদর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে লেক্‌চর দেওয়াই ফেলোর কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

দর্শনশাস্ত্র অতি বৃহৎ ও গভীর গবেষণায় পরিপূর্ণ। এক একটি দর্শনের অনুশীলনেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইতে পারে, ইহা অত্যুক্তি নহে। সুতরাং দুইচারিটা কথায় ষড়্‌দর্শন বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে দর্শনবিষয়ে আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইয়াছে। আমি বৈশেষিক, ন্যায়, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জলদর্শন সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কয়েকটি কথা বলিয়াছি। উচিত বিবেচনা হওয়াতে প্রথমতঃ অনুক্রমণিকাস্বরূপে কিছু বলিয়া নামকরণপ্রণালী এবং সাধারণভাবে দর্শনশাস্ত্রবিষয়েও কিছু কিছু বলিয়াছি। বিষয়ের দুরপনেয় কাঠিন্যসত্ত্বেও সরল ভাষায় বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার উপর যে গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছে, ইহাতে সেই ভার কতদূর বহন করিতে পারিয়াছি, তাহা উদারহৃদয় সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। অতি সাবধানতার সহিত দুর্বোধ দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। বর্ষে অন্যূন ছয়টি লেক্‌চর দিবার নিয়ম। আমি নয়টি লেক্‌চর দিয়াছি। সময়ের অল্পতানিবন্ধন সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। মনুষ্যজনসুলভ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন স্থানে যদি স্খলিতপদ হইয়া থাকি, তাহা সুধীগণ ক্ষমা করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়

যে-অভাব-দূরীকরণোদ্দেশে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার সেই মহৎ উদ্দেশ্য যদি কিঞ্চিৎপরিমাণেও আমার দ্বারা সাধিত হয়, তাহা হইলে আমি আমার এই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। অলমিতি।

কলিকাতা।
শকাব্দাঃ ১৮২০
মাঘ।

বিনীত
শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

বাবু শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের প্রথমবর্ষের লেক্‌চর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধে এবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রণকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অল্প করা হইল। আমার শরীর স্বচ্ছন্দ না থাকায় এবারে বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বাবাজির প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণের ভারার্পণ করিয়াছিলাম। অল্পাংশমুদ্রণের পর তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন শ্রীমান্ বলাইচাঁদ গোস্বামী বাবাজি এই মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি ঐ ভার গ্রহণ না করিলে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে কিছুতেই দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পন্ন হইতে পারিত না। ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করি, উক্ত বাবাজিদ্বয় নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হউন।

কলিকাতা।
শকাব্দাঃ ১৮২৬
আষাঢ়।

বিনীত
শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা

সূচীপত্র।

প্রথম লেক্‌চর।

দ্বিতীয় লেক্‌চর।

নামকরণপ্রণালী।—

তৃতীয় লেক্‌চর।

দর্শনশাস্ত্র।—

চতুর্থ লেকচর।

বৈশেষিকদর্শন।—

পঞ্চম লেক্‌চর।

বৈশেষিকদর্শন।—

ষষ্ঠ লেক্চর।

ন্যায়দর্শন।—

সপ্তম লেক্‌চর।

সাঙ্খ্যদর্শন :—

অষ্টম লেক্‌চর।

সাঙ্খ্যদর্শন।—

নবম লেক্‌চর।

পাতঞ্জলদর্শন।—

কতিপয় আবশ্যক শব্দের সূচী।

শব্দ — পৃষ্ঠা

হ

লেক্‌চরে উল্লিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম।

ত্রিকাণ্ডমণ্ডন
ত্রিকাণ্ডমণ্ডনটীকা
ত্রিলোচন দাস

নকুলীশপাশুপতদর্শন
নব্যন্যায়
নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন
নিরুক্ত
নিরুক্তাচার্য্য
নৈয়ায়িক
ন্যায়কন্দলী
ন্যায়কুসুমাঞ্জলি
ন্যায়দর্শন
ন্যায়ভাষ্য
ন্যায়ভাষ্যকার
ন্যায়মঞ্জরী
ন্যায়লীলাবতী
ন্যায়বার্ত্তিক
ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা
ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি
ন্যায়বিদ্যা
ন্যায়সূচীনিবন্ধ
ন্যায়াচার্য্য

পঞ্চদশী
পঞ্চশিখাচার্য্য
পঞ্জিকা
পতঞ্জলি
পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ

পরিশিষ্ট প্রবোধ
পাণিনি
পাণিনিদর্শন
পাতঞ্জলদর্শন
পাতঞ্জলভাষ্য
পারসীকপ্রকাশ
পারসীপ্রকাশ
পুষ্পদন্ত
পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন
পূর্ব্বমীমাংসা
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন
প্রবচনভাষ্য
প্রশস্তপাদাচার্য্য

ফণিভাষ্য

বলদেব বিদ্যাভূষণ
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বৌদ্ধ
বৌদ্ধদর্শন
ব্রহ্মমীমাংসা
ব্রহ্মানন্দ

ভগবদ্গীতা
ভট্ট
ভট্টবার্ত্তিক
ভানুচন্দ্র
ভামতী
ভাসাপরিচ্ছেদ

ভাষ্যকার
ভোজদেব

মথুরানাথতর্কবাগীশ
মধুসূদন সরস্বতী
মনুসংহিতা
মহাভারত
মাধবাচার্য্য
মীমাংসক
মীমাংসাদর্শন
মীমাংসাভাষ্য
মীমাংসাভাষ্যকার
মেধাতিথি
মেরুতন্ত্র
মোক্ষধর্ম্ম

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
যাস্ক
যোগদর্শন
যোগবার্ত্তিক
যোগবিবৃতি

রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য
রঘুনাথশিরোমণি
রত্নপ্রভা
রসেশ্বরদর্শন
রামকৃষ্ণ
রামানুজদর্শন
রামানুজস্বামী

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৫৭	১৬	পক্ষে সাধ্যের	পক্ষের
২০৩	২৫	সদামুদ্রিত	সদামুদিত

বাবু শ্রীগোপালবসুমল্লিকের

ফেলোশিপের লেকচর।

প্রথম লেকচর।

উপক্রমণিকা।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে দর্শনশাস্ত্রাদির যেরূপ চর্চ্চা ছিল বর্ত্তমানকালে তাহা নাই (১)। হিন্দুরাজাদের সময়ে শাস্ত্রের অনুশাসনক্রমে সমাজ পরিচালিত হইত। হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রধান। হিন্দুরা বিবেচনা করেন যে, কেবল ভোগের জন্য নহে, প্রধানত ধর্ম্মসাধনের জন্যই তাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাবৎ সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মানুগত। তৎকালের লোকসকল ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, রাজারা ধর্ম্মরক্ষার

---

(১) কেহ কেহ বলেন যে, গৌড় বা বঙ্গদেশে কেবল ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল, সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনের চর্চ্চা বঙ্গদেশে কখনও ছিল না। একথা সত্য নহে। গৌড়দেশীয় মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ ও বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ বেদান্তদর্শনের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মানন্দকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা গৌড়ব্রহ্মানন্দী বলিয়া খ্যাত। রঘুনাথ-শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িক গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থে মীমাংসা, বেদান্ত ও সাংখ্যাদি দর্শনের মত তুলিয়াছেন এবং খণ্ডন করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথকবিরাজ নিজগ্রন্থে বেদান্তমত তুলিয়াছেন। বিখ্যাত স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য স্মৃতিতত্ত্বে মীমাংসাভাষ্য, শারীরকভাষ্য, অধিকরণমালা, বেদান্তের ভামতী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী এবং তন্ত্রবার্ত্তিকের পংক্তি তুলিয়াছেন, বেদান্তকল্পতরুর উল্লেখ করিয়াছেন, পাতঞ্জলদর্শনের সূত্র তুলিয়াছেন, মীমাংসাদর্শনের অনেক সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরবাচস্পতি ও রামকৃষ্ণ মীমাংসাদর্শনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাতন্ত্রব্যাকরণের পঞ্জিকাগ্রন্থে ত্রিলোচনদাস, কলাপচন্দ্রে সুষেণবিদ্যাভূষণ এবং [illegible]প্রবোধে গোপীনাথতর্কাচার্য্য সাংখ্যাদি দর্শনের মত তুলিয়াছেন।

জন্য সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদের কিছুই অদেয় বা অকর্ত্তব্য ছিল না। ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না, ধর্ম্মের কোনোরূপ ক্ষতিকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। অধ্যয়ন, তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত ও অবশ্যকর্ত্তব্য (১)। বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্টতপস্যারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)। ধর্ম্মজ্ঞান বেদাধ্যয়নসাধ্য (৩)। সুতরাং বেদের অক্ষরগ্রহণমাত্র হইলেই অধ্যয়ন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইত না। অর্থজ্ঞানেরও আবশ্যকতা ছিল। বেদের অর্থজ্ঞানীর প্রশংসা এবং অর্থজ্ঞানবিহীনের নিন্দা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় (৪)।

(১) 'তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিদেশিতৈঃ
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা॥'—মনুসংহিতা ২। ১৬৫)।

বহুপ্রকার তপস্যাবিশেষ ও শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ ব্রত আচরণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ উপনিষৎ এবং বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিবে।

'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ'।—রত্নপ্রভাপ্রভৃতিধৃতশ্রুতি।

বেদ অধ্যয়ন করিবে। এই বিধি নিত্য।

(২) 'বেদমেব সদাভ্যস্যেৎ তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥' -(মনুসংহিতা ২। ১৬৬)।

তপস্যাকরণেচ্ছুক ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করিবেন। কেন না, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট তপস্যা বলিয়া কথিত।

'আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহম্॥'—(মনুসংহিতা ২। ১৬৭)।

যিনি পুষ্পমালা ধারণ করিয়াও অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর নিয়ম না করিয়াও প্রত্যহ যথাশক্তি বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি নখাগ্রপর্য্যন্ত অর্থাৎ সমস্তশরীরব্যাপক শ্রেষ্ঠ তপস্যা করেন।

(৩) 'দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম।' (মীমাংসাভাষ্য ১। ১। ১)।

কর্ম্মের অববোধ বেদাধ্যয়নের দৃষ্ট প্রয়োজন।

(৪) 'স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥'—(নিরুক্ত ১।৬।২)।

যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ জানে না, সে গর্দ্দভের ন্যায় ভারবহ মাত্র। যিনি অর্থ জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ মঙ্গল প্রাপ্ত হন,—অর্থজ্ঞান-দ্বারা পাপসকল বিনষ্ট করিয়া নাক অর্থাৎ স্বর্গে গমন করেন।

অর্থজ্ঞান না থাকিলেও মন্ত্রাদির উচ্চারণে অদৃষ্ট বা পুণ্য হয় বটে, (১) কিন্তু কর্ম্মাববোধ বা ধর্ম্মজ্ঞান বেদের অর্থজ্ঞান ভিন্ন হইতেই পারে না। অর্থ জানিতে হইলেই আপাতত বিরুদ্ধার্থকরূপে প্রতীয়মান বাক্যসকলের মীমাংসা আবশ্যক হয়। দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন মীমাংসার অন্য উপায় নাই। মনু বলিয়াছেন যে, বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা যিনি বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানিতে পারেন, তর্কানভিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্ম জানিতে পারেন না (২)। তিনি আরও বলেন, যিনি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র উত্তমরূপে জানিবেন (৩)। ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণের জন্য পরিষদের আবশ্যকতা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ত্রিবেদবেত্তা, হৈতুক অর্থাৎ অনুমানকুশল, তর্কী অর্থাৎ উহাপোহক্ষমবুদ্ধিযুক্ত, নিরুক্তাভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যেতা, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ, এই দশ ব্যক্তি দ্বারা পরিষৎ গঠিত হয় (৪)।

জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের সর্ব্বপ্রথম অধিকরণেই (৫) সিদ্ধান্ত করা

(১) 'যদ্বাঽধ্যয়নসংসিদ্ধবিজ্ঞানরহিতোঽপি সন।
নাতীবাধিক্রিয়াশূন্যো ভর্ত্তৃযজ্ঞাদিদর্শনাৎ॥' —(ত্রিকাণ্ডমণ্ডন ১ [illegible])।
'অর্থজ্ঞানাভাবে কর্ম্মণ্যধিকারো নাস্তীতি বক্তুং ন যুক্তম্।' —(ত্রিকাণ্ডমণ্ডনটীকা)।

(২) 'আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥' —(মনুসংহিতা [illegible])।

(৩) 'প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥' —(মনুসংহিতা [illegible] ১০৫)।

(৪) 'ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥' —(মনুসংহিতা [illegible] ১১১)।

(৫) পঞ্চাঙ্গবিচার এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থাংশের নাম 'অধিকরণ'। [illegible]রের পঞ্চ অঙ্গ এই—

'বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং মতম্॥' —(ভাট্টবার্ত্তিক)।

'বিষয়'—বিচারযোগ্য বাক্য। অর্থাৎ যে বাক্যের অর্থ বিবেচিত হয়, তাহার নাম বিষয়। 'বিশয়'—সংশয়। অর্থাৎ এই বাক্যের এই অর্থ কি অন্য অর্থ—এইরূপ সংশয়ের নাম বিশয়। বস্তুগত্যা বাক্যের যে অর্থ, তদ্বিরুদ্ধ অর্থ সমর্থন করিবার জন্য যে

আছে যে, বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইলেই শিষ্য গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। বেদাধ্যয়নের পর বেদবাক্যবিচার দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক বিচারশাস্ত্র (মীমাংসাদি-দর্শন) অধ্যয়ন করিবে। তৎপরে গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার নিয়ম (১)। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে বেদের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রও অবশ্য অধ্যেতব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণগণ ক্ষণিক বৈষয়িক সুখকে সুখ বলিয়াই গণ্য করিতেন না,—তাকে দুঃখেরই প্রকারভেদ বলিয়া বিবেচনা করিতেন (২)। এমন কি পারলৌকিক সুখও বিনাশী বলিয়া তাহাতেও তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না, ইন্দ্রপদেরও কামনা করিতেন না, সুখদুঃখের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভোগ-বাসনা তাঁহাদের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারিত না। দেহধারণোপযোগী সামান্য ভোগেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

আত্মসাক্ষাৎকার 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে (৩)। দর্শনশাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের সোপান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য অধ্যয়ন করিতেন, পরমধর্ম্মের (আত্মসাক্ষাৎকারের) উপযোগী দর্শনশাস্ত্র যে তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন, এ কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। ঋষিগণ অধ্যাত্মবিদ্যার বিশেষ আদর করিতেন বলিয়া তাঁহাদের প্রণীত দর্শনগুলি অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিপূর্ণ। কেবল প্রস্থানভেদ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে প্রসঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক-পরিমাণে ভৌতিকাদি পদার্থের আলোচনা আছে

তর্কের উপন্যাস করা হয়, তাহার নাম 'পূর্ব্বপক্ষ'। সিদ্ধান্তের অনুকূল তর্কের উপন্যাসের নাম 'উত্তর'। বাক্যের তাৎপর্য্যার্থনিশ্চয়ের নাম 'নির্ণয়'।

(১) 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।'—(মীমাংসাদর্শন, ১ম সূত্র)।

'গুরুকুলান্মাসমাবর্ত্তিষ্ট কথং নু বেদবাক্যানি বিচারয়েদিত্যেবমর্থোঽয়মুপদেশঃ। * * *। বেদমধীত্য ত্বরিতেন ন স্নাতব্যম্ অনন্তরং ধর্ম্মো জিজ্ঞাসিতব্যঃ।'—(শাবরভাষ্য)।

(২) 'দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ।'—(ন্যায়দর্শন ৪।১।৫৩)।

(৩) 'অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্।'—(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)।

(১)। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দর্শনগুলিকে 'অধ্যাত্মদর্শন' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, এইজন্য দয়ালু মহর্ষিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অবলম্বন করিয়া দর্শনসকল প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কোন প্রস্থানই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। রুচি অনুসারে যিনি যে প্রস্থানের অনুসরণ করুন্ না কেন, শীঘ্র বা বিলম্বে সকলে একই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবেন। পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।'

ভগবন্, জল যে পথেই যাউক না কেন, উহা যেমন পরিশেষে সমুদ্রে যাইয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে সরল বা কুটিলপথগামী মনুষ্যদিগের তুমিই একমাত্র গম্য। 'হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র তাহাদের ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট পুষ্প ও ফল'—ভট্টমোক্ষমূলরও এ কথা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই (২)।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, যেমন ফলের জন্য আম্র রোপণ করিলে ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক হইয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিলে অর্থ আপনিই উৎপন্ন হয় (৩)। পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের জন্যই বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনোপযোগী অর্থ তাঁহাদের অনায়াসে লভ্য হইত। কারণ, কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পোষ্যবর্গ-ভরণ, (৪) এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হিন্দুরাজাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রের অনুশাসন আছে (৫)।

(১) ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যাইবে।

(২) Three lectures on the Vedanta Philosophy.

(৩) 'আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনুৎপদ্যেতে। এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে॥'—(শারীরকভাষ্যাদিধৃত আপস্তম্ব-বচন)।

(৪) 'পিতা মাতা গুরুর্ভ্রাতা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চৈব পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥'—(মনুসংহিতা)।

(৫) 'শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাঽস্য বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।'—(মনুসংহিতা ৮।২৩৫)।
'শ্রুতবৃত্তে—শাস্ত্রজ্ঞানানুষ্ঠানে।'—(কুল্লুকভট্ট)।
'ধর্ম্ম্যাং বৃত্তিং—যয়া কুটুম্বস্য ধর্ম্মস্যাবসাদনং ন ভবতি।'—(মেধাতিথি)।

বিদ্বন্মণ্ডলী অর্থবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত জীবন ধর্ম্মসাধনায় নিযুক্ত রাখিতেন। আগন্তুক আপদের জন্যও তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইত না। পিতা যেমন ঔরসপুত্রদিগকে রক্ষা করেন, হিন্দুরাজা সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন (১)।

পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে যে পরিমাণে দূরদর্শীদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে পরিমাণে শাস্ত্রগ্রন্থ এখন বিদ্যমান নাই। তাহার অন্যতম কারণ এই যে, বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের সময়ে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় (২)।

(১) 'সংরক্ষেৎ সর্ব্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্।'—(মনুসংহিতা ৭। ১২৫)।

(২) ধারেশ্বর মহারাজ ভোজদেব 'কামধেনু' নামে স্মৃতিসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। বোধ হয়, উহাই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ। কামধেনুর উপক্রমণিকায় গ্রন্থপ্রণয়নের ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এই।—ভোজদেবের দৌহিত্র এবং খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের পুত্র উজ্জয়িনীশ্বর মহারাজ মতাদিত্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ সৎকারার্থ শ্মশানে নীত হইয়াছে, এমন সময় একজন বৌদ্ধযোগী অভিপ্রেতার্থসাধনের উত্তম সুযোগ হইবে বিবেচনায়, যোগপ্রভাবে মহারাজ মতাদিত্যের শবদেহে প্রবিষ্ট হন। শ্মশানে মহারাজ জীবিত হইয়া উঠিলেন, রাজ্যময় আনন্দ-উৎসবের পরিসীমা রহিল না। কিছুকাল পরে মতাদিত্য একটি যজ্ঞ করিবেন, মন্ত্রীদিগের নিকট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রিগণ তাহার অনুমোদন করিলে তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত পণ্ডিত সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক লইয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইবেন। সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ একমত্যে যে যজ্ঞ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির করিবেন, সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। মন্ত্রীদিগের যত্নে অবিলম্বে রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। পণ্ডিতদিগের নির্দ্দেশানুসারে শিপ্রানদীর তটে দীর্ঘায়তন যজ্ঞবাট এবং বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞকুণ্ডসকল প্রস্তুত হইল। যজ্ঞদীক্ষার দিন অবধারিত হইল। ইতিমধ্যে একদিন মতাদিত্য কোন কৌশলে পণ্ডিতদিগকে রাজধানীর কিছু দূরে পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতবর্গ রাজধানী হইতে দূরে যাইলে, মতাদিত্যের আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞকুণ্ডসকলে অগ্নি প্রজ্বলিত এবং ঐ অগ্নিতে পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মপুস্তকসকল ভস্মীভূত হইল। পণ্ডিতগণ যথাসময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। মতাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের বহুলপ্রচার করিবার অভিলাষে রাজ্যমধ্যে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই বৃত্তান্ত মহারাজ ভোজদেবের কর্ণগত হইল। 'মতাদিত্য তাঁহার দৌহিত্র এবং বিক্রমাদিত্যের পুত্র,

অন্যপ্রকারেও যে শাস্ত্রগ্রন্থের বিলোপ হইয়াছে, ঐতিহাসিকদিগের তাহা অপরিজ্ঞাত নাই (১)।

ঘাত হইলেই প্রতিঘাত হইবার নিয়ম। বৌদ্ধেরা দার্শনিক বিচারে স্বপক্ষসমর্থন করিতে প্রয়াস পাইলেন। হিন্দুদার্শনিকগণও তাহা খণ্ডন করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে তৎকালে দর্শনজগতে একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধদিগের দার্শনিক তর্ক খণ্ডন করিবার জন্য যেসকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থনিচয় রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেক-গুলি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

তখনও দেশ বহিঃশত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। তখনও দেশে শান্তি বিরাজমানা ছিল। কালে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল "কোরাণে যাহা আছে, তাহার জন্য গ্রন্থান্তর নিষ্প্রয়োজন, কোরাণে যাহা নাই, তাহা অপ্রমাণ ও অসত্য, সুতরাং যে গ্রন্থ ঐরূপ অসত্য বিষয়ের উপদেশ দেয়, তাহা অনিষ্টকর, তাহার অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নহে"—এই অদ্ভুত যুক্তি-বলে যে-জাতীয় সেনাপতির আদেশে আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার বিখ্যাত পুস্তকালয় ভস্মীভূত হইয়াছিল, (২) দুর্ভাগ্যক্রমে সেই-জাতীয় রাজা ভারতের

কেন তাঁহার ঈদৃশ দুর্ম্মতি হইল?' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। জ্যোতিষী-গণনায় স্থির হইল যে, প্রকৃত মহাদিত্য জীবিত নাই। মহাদিত্যের শরীরে একজন বৌদ্ধ পরকায়প্রবেশ-পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অবিলম্বে ধারানগরীতে পর-কায়প্রবেশের বিঘটক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। যে দিন যে সময়ে ধারানগরীতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল, সেই-দিন সেই সময়ে মহাদিত্যের দেহও প্রাণবিযুক্ত হইল। তাহার পর ভারতবর্ষের যেখানে যে শাস্ত্রগ্রন্থ অবশিষ্ট ছিল, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া এবং ভারতীয় পণ্ডিতবর্গকে ধারানগরীতে সমবেত করাইয়া, শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে এবং সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর কণ্ঠস্থ শাস্ত্রবাক্যসকল সংগ্রহ করিয়া, মহারাজ ভোজ 'কামধেনু'গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেসকল শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পূর্ণ এবং যেসকল গ্রন্থের যে যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কামধেনুর প্রারম্ভে তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন।

(১) মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়কালে তাঁহারা 'সহ্যাদ্রিখণ্ড' পুস্তক বিনষ্ট করিয়াছেন। ইত্যাদি।

(২) কেহ কেহ বলেন, আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয় ভস্মীভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সেনাপতির আদেশে হয় নাই।

বহিঃশত্রুরূপে উপস্থিত হইলেন (১)। যে প্রবল শত্রুর আক্রমণে হিন্দু-রাজাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ও পরমারাধ্য দেবমূর্ত্তি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, কে বলিতে পারে যে, ঐ আক্রমণে শাস্ত্রগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নাই? প্রবল বহিঃশত্রুর পুনঃপুন আক্রমণে দেশ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল।

'ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।' এইরূপ সঙ্কটসময়ে হিন্দুরাজাদের পরস্পর মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। জবন, দেশের রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজবিপ্লবে যেসকল অনিষ্ট হইয়া থাকে, ভারতের সম্বন্ধেও তাহার কোন বর্জিত বিধি নাই; ভারতেও ঐসকল অনিষ্ট উপস্থিত হইল। দেশে ঘোর অশান্তির আবির্ভাব হইল। এক হস্তে ধর্ম্মগ্রন্থ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করা যাঁহাদের রীতি, সেই শ্রেণীর রাজার প্রথম অধিকারকালে হিন্দু প্রজাদের কিরূপ দুরবস্থা হইবার সম্ভব, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

তখন দেশের রাজা-প্রজা সকলেই আত্মরক্ষা লইয়া ব্যস্ত। রাজা আর পণ্ডিতদিগের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন না, ঔরসপুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। সে সময় কোনরূপে পোষ্যবর্গভরণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলেই শাস্ত্রব্যবসায়িগণ কৃতার্থ হইতেন। পোষ্যবর্গভরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহাদের আবশ্যক হইয়া উঠিল। অর্থচিন্তা কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রচিন্তার স্থান অধিকার করিল। নানা কারণে লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠাও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া পড়িল। এসময়ে বিদ্যার উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। কিন্তু তখনও বিদ্যাচর্চ্চা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। কারণ, তৎকালে ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মনিষ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে আলোড়িত হইলেও পরিলুপ্ত হয় নাই।

শাস্ত্রগ্রন্থসকল সংস্কৃতভাষায় রচিত। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে সংস্কৃতভাষায় প্রবেশাধিকার হয় না। সংস্কৃতভাষাধ্যায়ীদিগকে বাধ্য হইয়া

(১) সুলতান মামুদ ও নাদিরশাহ প্রভৃতি বাস্তবিক ভারতবর্ষের বহিঃশত্রু। তাঁহারা রাজ্যবিস্তার-অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। ভারতের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করাই তাঁহাদের ভারত-আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক-কথায় বলিতে গেলে, তাঁহারা রাজারূপে ভারতে উপস্থিত হন নাই,—দস্যুরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং সেরূপ দুঃসময়েও ব্যাকরণের অধ্যয়ন বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনে নিয়মিত। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে ধর্ম্মকর্ম্মের বিধিব্যবস্থা জানিবার উপায়ান্তর নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়ন অপেক্ষাকৃত অল্পকাল ও অল্পায়াস সাধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের ধর্ম্মসভায় ব্যবস্থা-প্রদান ও ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগমও হইত। পক্ষান্তরে, দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন দীর্ঘকালসাধ্য এবং সমাজে দার্শনিকদিগের যথেষ্ট সমাদর থাকিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের ন্যায় তাঁহাদের নিত্য প্রয়োজন হইত না। ক্রমে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন বিরল হইতে বিরলতর হইতে আরম্ভ হইল। তখনও মধ্যে মধ্যে প্রবীণ প্রবীণ দার্শনিক ও অন্যান্য পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিকারগ্রস্ত অচেতন রোগীর ক্ষণিক চেতনাসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী—পূর্ব্বপ্রতিভার শেষ বিকাশ মাত্র।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে সম্রাট্ আকবরের নাম উল্লেখ না করিলে অসঙ্গত হয়। মহাত্মা আকবর কতকগুলি অসাধারণ সঙ্কল্প লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকালে সভাসদগণের নিকট কস্তূরী বিতরণ করিবার সময়ে হোমাউনের আশংসা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছিল। আকবর অসাধারণ প্রতিভাবলে রাজশাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জাতিনির্বিশেষে তুল্যরূপে সমস্ত প্রজামণ্ডলীর রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কথিত আছে যে, আকবরের যত্নে কতিপয় মুসলমান ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক শাস্ত্রগুরুর নিকট সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, 'অল্লোপনিষৎ' তাঁহার সময়ে ঐরূপে শিক্ষিত মুসলমান দ্বারা রচিত হয়। অল্লোপনিষৎ কিন্তু অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডের একখানি উপনিষৎ। তাহার অর্থ অন্যরূপ। সে যাহা হউক, আকবরের সন্তোষার্থে তাহার অন্যতম সভাসদ্ বিহারী কৃষ্ণদাস 'পারসীকপ্রকাশ' নামে অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করেন। 'তাজিক'নামক প্রখ্যাত অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিষগ্রন্থও সম্ভবতঃ তাঁহার বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের উৎসাহেই রচিত হইয়া থাকিবে (১)।

(১) 'পারসীকপ্রকাশ' একখানি অভিধান; চলিত পারসীভাষায় শব্দগুলি

আকবর সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে সম্মানিত এবং উপাধিদ্বারা ভূষিত করিতেন (১)। তিনি রাজ্যশাসনের যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া যান, তাহা তাঁহার স্বর্গারোহণের পরেও অনেককাল দেশে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আকবরের রাজনীতির ন্যায় তাঁহার সংস্কৃতানুরাগও তাঁহার সহিত অন্তর্হিত হয় নাই, তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও অনুবৃত্ত ছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট সংস্কৃতগ্রন্থ রচিত হয়। শাজেহানের প্রসাদলাভের জন্য বেদাঙ্গ রায় 'পারসীপ্রকাশ'-নামক জ্যোতিগ্রর্ন্থ রচনা করেন (২)। এখনপর্য্যন্তও গুজরাট-অঞ্চলের মুসলমানগণ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

পারসীশব্দের অর্থ সঙ্কলিত হইযাছে। 'তাজিক' সংস্কৃত ও পারসীক শব্দের সংযোগে রচিত একখানি জ্যোতিগ্রর্ন্থ। এই অদ্ভুত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাপ্রণালী প্রদর্শনের জন্য এক-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'মাহশ্চন্দ্রে চ মাসে চ গুরৌ ক্রম্নিণি মুশ্‌তরী।
সিদ্ধান্তে পেশণে হল্লো মেহর্ স্যাৎ করুণার্কয়োঃ॥'—(পারসীকপ্রকাশ)।

'যদা আপতাপো ভবেদ্দুম্মুনস্থোঽথবা চন্দ্রপুত্রো গলিম্বক্সযুক্তঃ।
যদা মুশ্‌তরী মালখানাগতঃ স্যাদ্ভবেদ্ভূমিপালোঽথবা বাদশাহা॥' (তাজিক)।

প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দ্বিতীয় শ্লোকটির তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে।—যাহার জন্মকালে আপতাপ অর্থাৎ সূর্য্য দুম্মুনস্থ অর্থাৎ শত্রুগৃহস্থিত, অথবা চন্দ্রপুত্র অর্থাৎ বুধ গলিম্বক্সযুক্ত অর্থাৎ পাপগ্রহযুক্ত, মুশ্‌তরী অর্থাৎ বৃহস্পতি মালখানাগত অর্থাৎ ধনগৃহগত হয়, সেই ব্যক্তি ভূমিপাল অর্থাৎ রাজা, অথবা বাদশাহা অর্থাৎ সম্রাট্ হয়।

(১) কাদম্বরীর টীকাকার ভানুচন্দ্র ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে,—

'শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্দ্রঃ অকব্বরক্ষ্মাপতিদত্তমানঃ।'

ঐ গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে—'পাতিশাহ-শ্রীঅকব্বরপ্রদাপিতোপাধ্যায়পদধারক * * *' ইত্যাদি।

ভানুচন্দ্রের শিষ্য সিদ্ধচন্দ্র কাদম্বরীর উত্তরভাগের টীকা করেন। তিনি পুষ্পিকায় এইরূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

'শ্রীঅকব্বরপ্রদত্তখুস্ফহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়' ইত্যাদি।

(২) পারসীপ্রকাশের প্রথম শ্লোক এই—

কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত রাজগণ সিংহাসনারূঢ় হইলেন। রাজ্যশাসনবিষয়ে তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল না, বলবতী ইচ্ছাও ছিল না। অল্পে অল্পে তাঁহারা বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। রাজার দৃষ্টি না থাকায় রক্ষাধিকৃত অমাত্যবর্গ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তির স্থানে অশান্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রজাদের নানারূপ দুঃখকষ্টের পরিসীমা রহিল না। অত্যন্ত গরম হইলেই জল হয়। বিধাতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় ভারতের শাসনদণ্ড ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত হইল। রাজবিপ্লবের প্রথমাংশে যে-সকল অসুবিধা অনিবার্য্য, ইংরাজরাজের রাজ্যাধিকারের প্রথমাংশেও তাহা অল্পবিস্তর হইয়াছিল।

ইংরাজের সুশাসনে এখন দেশমধ্যে শান্তি বিরাজমান। ইংরাজী-বিদ্যার প্রভাবে দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ নিজে বিদ্বান্, সুতরাং বিদ্যানুরাগী। এতদ্দেশীয় আর্য্যগণ পরলোকপ্রধান ছিলেন। তাঁহারা পরলোক লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইহলোকের জন্য বড়-একটা ভাবিতেন না। ভূমণ্ডলে যে-কয়েকটা দিন থাকিতে হইবে, তাহা কোনো-একরূপে কাটিয়া গেলেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিতেন (১)। তাঁহাদের দর্শন অধ্যাত্মবিদ্যাবিশেষ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইউরোপীয় মনীষিগণের রুচি অন্যরূপ। তাঁহারা ইহলোকের সমুন্নতির জন্য যত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, অধ্যাত্মবিষয়ে তত যত্ন করা আবশ্যক মনে করেন না। ইউরোপীয় অধিকাংশ দর্শন বা বিজ্ঞান ইহলোকের বিষয় লইয়া প্রণীত, সুতরাং ভৌতিক। অনেক দেশীয় বিদ্যার্থিগণ ইউরোপীয় দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন, দেশীয় দর্শনাদির প্রতি দৃক্পাতও করিতেন না। অধিকন্তু দেশীয় শাস্ত্রে

'নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরীং হরিহরৌ লম্বোদরাদীন্ দ্বিজান
শ্রীমচ্ছাহজহানরেন্দ্রপরমপ্রীতিপ্রসাদাপ্তয়ে।
কৃত্বা সংস্কৃতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কৌতুকং
জ্যোতিঃশাস্ত্রপদোপযোগি সরলং বেদাঙ্গরায়ঃ সুধীঃ॥'

(১) কথিত আছে, মনুষ্যের পরমায়ু অল্প। ভূমণ্ডলে অল্পদিন থাকিতে হয়। এই বিবেচনায় লোমশমুনি নিজের বাসের জন্য পর্ণকুটীর-নির্ম্মাণও আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। আর্য্যগণ ইহলোকে এমনই আস্থাবান্।

কোন সত্য বা চিন্তয়িতব্য বিষয় আছে, তাঁহারা ইহা মনে করিতেও পারিতেন না। যাঁহারা দেশীয় শাস্ত্রনিচয় না জানিয়াই তৎসম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন এবং তদনুরূপ সংস্কার পোষণ করেন, তাঁহারাই যে ইংরাজীবিদ্যায় অনভিজ্ঞ দেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' বলিয়া ঘৃণা করেন, ইহা কৌতুকোদ্দীপক হইলেও দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

এখন স্রোত অন্যদিকে ফিরিতেছে। ইংরাজীবিদ্যাধ্যেতা ছাত্রগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেশীয়শাস্ত্রে সত্য আছে,—চিন্তয়িতব্য বিষয় আছে। কারণ, ইউরোপীয় অনেক মনীষী সংস্কৃতশাস্ত্র-অধ্যয়নের জন্য তাঁহাদের অমূল্য সময় ব্যয় করিতেছেন; সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছেন; সংস্কৃতশাস্ত্রে নূতন নূতন বিষয় অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইতেছেন; সংস্কৃতশাস্ত্রের উৎকর্ষ বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রবন্ধ প্রচার করিতেছেন। রাজা রাজকীয়ভাষার বিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, উচ্চ-সংস্কৃতশিক্ষার জন্য সংস্কৃতবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; বিলুপ্তকল্প চতুষ্পাঠীর রক্ষার জন্য নানাবিধ সদুপায় অবলম্বন করিতেছেন; টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকদিগকে বৃত্তিপ্রদান করিতেছেন; উপাধিপরীক্ষার সৃষ্টি করিয়া কৃতবিদ্য ছাত্র ও অধ্যাপকদিগকে পুরস্কৃত করিতেছেন; যোগ্যতর অধ্যাপকদিগকে উপাধিদ্বারা সম্মানিত করিতেছেন। যত্নের সহিত হস্তলিখিত সংস্কৃতপুস্তক রক্ষা করিতেছেন; হস্তলিখিত সংস্কৃতপুস্তকসকলের সূচীপ্রস্তুতের জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিতেছেন; আশিয়াটিক সোসাইটীকে সাহায্য করিয়া এবং অন্য উপায়ে সংস্কৃতপুস্তকাবলী মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সংস্কৃতশাস্ত্র অন্তঃসারশূন্য নহে। উহাতে গভীর সত্যসকল নিহিত রহিয়াছে। উহাতে জানিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, অপর ব্যক্তিরাও তাহাই করিয়া থাকেন (১)। এইজন্য, ইংরাজীবিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয়

(১) "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"—(ভগবদ্গীতা ৩। ২১)।

না, সংস্কৃতবিদ্যা-শিক্ষার জন্য—সংস্কৃতদর্শনের আলোচনার জন্য, তাঁহাদের প্রচুর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না। উদারহৃদয় বাবু শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোশিপের প্রবর্ত্তনা এবং দেশীয়শাস্ত্রের অনুশীলনার্থ শিক্ষিতমণ্ডলীর উপস্থিত সমাগমই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। দেশীয় বা জাতীয় বিদ্যার অনুশীলন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জাতীয়বিদ্যার অনুশীলন—জাতীয়শাস্ত্রের আলোচনা ভিন্ন কোন জাতিই সমুন্নত হইতে পারেন না। অন্যান্য সভ্যদেশের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে মুসলমানভ্রাতাদের আচরণ প্রশংসনীয়। তাঁহারা জাতীয়বিদ্যার অনুশীলন না করিয়া কেবল রাজকীয়বিদ্যার অনুশীলনে পরিতৃপ্ত হন না।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা এমন রাজা পাইয়াছি, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের শাস্ত্রালোচনার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। অপক্ষপাতী ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের আগ্রহে দেশীয় দর্শনাদিশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ অঙ্কুরিত ও রাজার অনুগ্রহে পল্লবিত হইয়াছে। অধ্যবসায়-অবলম্বনে কৃতবিদ্যমণ্ডলী উহা পুষ্পফলে শোভিত করিবেন, এরূপ আশা করিলে অসঙ্গত হইবে না। রাজবিদ্যায় কৃতবিদ্য দেশীয় মনীষিগণ যখন দেশীয় দর্শনাদির সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বিষয়সকলের অনুশীলন ও পর্য্যালোচনা করিবেন এবং পদে-পদে শাস্ত্রকারদিগের অপারসীম ক্ষমতা ও কৌশল অবলোকন করিয়া তাঁহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইবেন, তখন এদেশে বিদ্যাবিষয়ে যুগান্তরের প্রাদুর্ভাব হইবে। কৃতবিদ্যগণ শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অনুবাদের প্রতি নির্ভর করিবেন না,—স্বয়ং শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হইবেন, ইহা কল্পনা করিতেও কত মধুর। যখন সত্যসত্যই উহা কার্য্যে পরিণত হইবে, তখনকার মাধুর্য্য বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই,—সে শুভদিনের তুলনা নাই। আশা করা অনুচিত নহে যে, অনতিবিলম্বে সেই শুভদিন সমাগত হইবে। শুভক্ষণে কৃতবিদ্যদিগের শুভবুদ্ধি হইয়াছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে, দেশের উপকার ত হইবেই, কৃতবিদ্যগণও অল্প লাভবান্ হইবেন না। দেশীয় বস্তু বিদেশীয়-ভাষায় প্রচারিত না হইলে তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন না, নিজেদের

বস্তু নিজেরা চিনিতে পারেন না, নিজেরা সমাদর করিতে জানেন না, পরের পরিচয়ে ও পরের সমাদর দেখিয়া চিনিবেন ও সমাদর করিতে শিখিবেন, ইহা কৃতবিদ্যদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। এরূপ দৃষ্টান্তও একান্ত বিরল নহে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত বলিয়া যাহা গ্রহণ করা হয়, শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা এদেশে বহুকালপূর্ব্বে সমুদ্ভাবিত হইয়াছিল। পৃথিবীর গতি, গোলত্ব ও নিরাধারত্ব প্রভৃতি শতশত বিষয় ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সে যাহা হউক, এখন সাধারণ্যে দেশীয়বিদ্যাপ্রচারের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যাঁহারা এই উপাদেয় বিষয়ের প্রবর্ত্তক ও সাহায্যকারী, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম লিখিত হউক। সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে সমুৎসুক, 'দর্শনশাস্ত্র নীরস ও কঠিন'—এই প্রবাদবাক্য শুনিয়া তাঁহারা যেন মন্দোৎসাহ না হন, ইহাই প্রার্থনীয়। অধিকাংশ প্রবাদবাক্য অপেক্ষাকৃত অজ্ঞলোকের প্রবর্ত্তিত। প্রবাদবাক্য শুনিলেই তাহা অটল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা অসঙ্গত। আবার প্রবাদবাক্যগুলি কেবলই অলীক,—উহার মূলে কোনও সত্য নাই, সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অনুচিত। স্থিরচিত্তে প্রবাদবাক্যের তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে আস্থা বা অনাস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত প্রবাদবাক্যে দুইটি অংশ আছে;—১ম, দর্শনশাস্ত্র নীরস; ২য়, দর্শনশাস্ত্র কঠিন। এই অংশদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

যাহাতে রস আছে, তাহা সরস; যাহাতে রস নাই তাহা নীরস। 'দর্শনশাস্ত্র নীরস' এই প্রবাদাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবাদ-স্রষ্টার মতে দর্শনশাস্ত্রে কোনও রস নাই। কিন্তু রসের সত্তা বা অসত্তা নির্ণয় করিতে হইলে, রসের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। রসের প্রকৃতি জানিতে পারিলে, রসের সত্তা বা অসত্তা সহজে নির্ণীত হইতে পারে। আলঙ্কারিকদিগের মতে 'অলৌকিক চমৎকার'—রসের প্রাণ বা সার (১)। চমৎকার—একপ্রকার আনন্দ বা বিস্ময়। যাহার অপর নাম

(১) 'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।

'চিত্তবিস্তার' (১)। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার অনুশীলন বা পর্য্যালোচনায় সুখানুভব বা বিস্ময় জন্মে, তাহা 'সরস' এবং যাহার অনুশীলন বা পর্য্যালোচনায় সুখানুভব বা বিস্ময় হয় না, তাহা 'নীরস'। এইখানেই 'দর্শনশাস্ত্র নীরস' এই প্রবাদাংশের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল। কারণ, যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যে তদ্দ্বারা নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব। দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনকারিগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাঁহারা ইউরোপীয়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য, তাঁহারা দেশীয়দর্শন না হউক, ইউরোপীয়দর্শন অবশ্যই অধ্যয়ন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, ইউরোপীয়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যারসাস্বাদন করিতে পারেন না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, উপস্থিত শিক্ষিতমণ্ডলী আমার উক্তি সমর্থন করিবেন। সুহৃদ্বিয়োগাদি করুণাদিরসের আলম্বন, সুতরাং উহা কেবলই দুঃখময়, উহাতে সুখানুভব হয় না—এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন যে, করুণাদিরসেও যে পরমসুখের আবির্ভাব হয়, সহৃদয়দিগের অনুভবই তাহার প্রমাণ (২)।

সত্য বটে, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেহ কেহ সুখানুভব করিতে পারেন না। কিন্তু রসময় কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ত কেহ কেহ রসানুভব করিতে পারেন না। তা বলিয়া কি কাব্যশাস্ত্রকেও নীরস বলিতে হইবে? দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সুখানুভব না করিবার কারণ—দর্শনশাস্ত্রের নীরসতা নহে। যাঁহারা সুখানুভব করিতে পারেন না, তাঁহারা বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যবশত দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশাধিকারলাভে বঞ্চিত, অথবা তাঁহাদের রসবিষয়িণী বাসনা নাই। রসবিষয়িণী বাসনা না থাকিলে

স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

(১) 'সুখবিশেষপর্য্যবসিতচমৎকারং প্রত্যপি' ইত্যাদি। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)।

'চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্য্যায়ঃ।'(সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

(২) 'করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

রসের আস্বাদন বা অনুভব হয় না (১)। কাব্য করিবার জন্য যেমন বীজভূত-শক্তি বা সংস্কারবিশেষ অপেক্ষণীয়, কাব্য বুঝিবার জন্যও সেইরূপ বীজভূত শক্তি বা সংস্কারবিশেষের অপেক্ষা আছে। যথাক্রমে উক্ত শক্তি-দ্বয়ের নাম—কর্তৃত্বশক্তি ও বোদ্ধৃত্বশক্তি। যাঁহার বোদ্ধৃত্বশক্তি নাই, তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে (২)। ইহাও আলঙ্কারিক-দিগেরই সিদ্ধান্ত। কাব্যবিষয়ে আলঙ্কারিকেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধেও সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব স্থির হইতেছে যে, দর্শনশাস্ত্রের রসাস্বাদনে অসমর্থ ব্যক্তিই উক্ত প্রবাদাংশের স্রষ্টা।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, দর্শনশাস্ত্রে যদি রস আছে, তবে ঐ রস কি-নামে অভিহিত হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা 'অদ্ভুতরস' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। বিস্ময় বা চমৎকার যে-রসের স্থায়িভাব, তাহার নাম 'অদ্ভুত-রস' (৩)। স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষপ্রতিষেধ উপলক্ষে দর্শনকারগণ যেরূপ অলৌকিক কৌশল ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্মিত বা চমৎকৃত হইতে হয়। কোন আলঙ্কারিকের মতে রসমাত্রই 'অদ্ভুত' (৪)। শৃঙ্গার, বীর, হাস্য প্রভৃতি অদ্ভুতরসেরই অবান্তর প্রভেদ। দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্যশাস্ত্রসম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। সমস্ত শাস্ত্রেই অসাধারণ কৌশল ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর্য্যালোচনা করিলেও অল্লাধিক চমৎকারের বা বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্রেই অল্লাধিক-পরিমাণে অদ্ভুতরস বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(১) 'ন বিদ্যতে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

(২) 'শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ। যাং বিনা কবিত্বং ন প্রসরেৎ প্রসৃতং বা উপহসনীয়ং স্যাৎ।' (কাব্যপ্রকাশ)।

(৩) 'অদ্ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ।' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

(৪) 'রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

শৃঙ্গার, হাস্য প্রভৃতি মনোমত কয়েকটি রস যেখানে নাই, তাহাই যদি 'নীরস' বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তবে তত্তদ্রসপ্রধান কয়েকখানি কাব্য ভিন্ন কোন গ্রন্থই অধ্যেতব্যশ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে না।

'দর্শনশাস্ত্র কঠিন' ইহা প্রবাদের দ্বিতীয় অংশ। এ অংশে সত্য আছে। দর্শনশাস্ত্রের কাঠিন্য দুই কারণে হইয়াছে;—ভাষা ও প্রতিপাদ্য বিষয়। অশ্রুতপূর্ব্ব অনন্যসুলভ কতকগুলি পারিভাষিকশব্দ দর্শনশাস্ত্রের ভাষাগত কাঠিন্য সম্পাদন করিয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়সকল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। সুতরাং উহাতে বিষয়গত কাঠিন্যও যথেষ্ট আছে। কেবল দর্শনশাস্ত্রই কঠিন নহে। সকল শাস্ত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে অশ্রুতপূর্ব্ব অনন্যসাধারণ পারিভাষিক শব্দ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূক্ষ্মতা আছে। অতএব সকল শাস্ত্রই অল্পবিস্তর কঠিন। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ যেরূপ কৌশল ও বিবেচনা পূর্ব্বক বিষয়সকলের সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে কাঠিন্য অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সোপানারোহণের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়।

'বিষয়সন্নিবেশের কৌশলেও দর্শনশাস্ত্রের কাঠিন্য কিছুমাত্র নিরাকৃত হয় নাই,'—তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনবিষয়ে সমুৎসুক সুধীগণের উৎসাহ মন্দীভূত হইবার কোনও হেতু দেখা যায় না। কারণ কাঠিন্যের চরম ফল—পরিশ্রমের আধিক্য। যে বিষয় যত কঠিন, তাহা আয়ত্ত করিতে তদনুরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু পরিশ্রম ভিন্ন জগতে কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অথচ পরিশ্রম করিতে হইবে বলিয়া কেহই কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হন না। অলসপ্রকৃতি লোকেই পরিশ্রমকে ভয় করিয়া থাকে। জনৈক গ্রন্থকার অলসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্যয়ন দুঃখের হেতু, কে এই দুঃখকর অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়? (১)। কৃতবিদ্যগণ এই উক্তি শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিবেন না। আশা করা অন্যায় নহে

(১) 'অলসো বদতি দুঃখহেতুরেতদধ্যয়নং, কো হ্যেতদধ্যেতুং শক্তঃ?।'
(কাতন্ত্রপঞ্জিকা)।

যে, ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে অর্জ্জুন যেমন আনন্দিত হইতেন (১), দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সুধীগণ তেমনি দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইবেন। নিকষপ্রস্তর দ্বারা যেমন স্বর্ণের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়, পরিশ্রমদ্বারা সেইরূপ বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইতে পারে। যে-বিষয়-সম্পাদনে যে-পরিমাণ পরিশ্রম আবশ্যক হয়, সেই বিষয়ও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হওয়া সঙ্গত। অনায়াসসম্পাদ্য বিষয়ের উৎকর্ষ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণতঃ পরিশ্রমানুসারেই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচিত হইয়া থাকে। লোকে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম্ম ও মোক্ষের উত্তরোত্তর উৎকর্ষও ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। ধর্ম্ম বহুল-আয়াস-সাধ্য বটে, কিন্তু মোক্ষ বহুলতম-আয়াস-সাধ্য—অনেক-জন্মপরম্পরা-আয়াসলভ্য। অথচ মোক্ষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা মোক্ষতুল্য বস্ত্বন্তর নাই।

অভিনিবেশপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ পরিশ্রমশীল। পরিশ্রম করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। কারণ, সাংখ্যাচার্য্যদের মতে—মনুষ্য রজোবিশাল অর্থাৎ রজঃপ্রধান (২)। রজোগুণ 'চল' অর্থাৎ ক্রিয়াশীল (৩)। সুতরাং রজঃপ্রধান মনুষ্যের পক্ষে ক্রিয়া অর্থাৎ কোন-না-কোন একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক। শিশুদিগের নির্নিমিত্ত হস্তপদাদিসঞ্চালন; বালকদিগের বস্তুসকলের ধারণ, বিক্ষেপণ, বিনাশন ও অপরাপর নিষ্কারণ অনুষ্ঠান; যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের হস্তপদাদির চাপল্য ও অন্যান্য বৃথাচেষ্টা এই কারণেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন না, প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন স্বভাবের অন্যথাকরণ সাধ্যাতীত। সহস্র সহস্র শিল্পী ঐকমত্যে যুগসহস্র চেষ্টা করিলেও সলিলের শীতলতা, দহনের উষ্ণতা, তপনের প্রকাশকতা, পবনের মনোহর স্পর্শের অন্যথা করিতে পারে না। এইজন্যই সুষুপ্তিকালেও শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হস্তপদাদিসঞ্চালনের

---

(১) 'অতীব সমরং দৃষ্ট্বা হর্ষো বস্যোপজায়তে।' (মহাভারত)।

(২) 'মধ্যে রজোবিশালঃ।' (সাঙ্খ্যকারিকা)।

(৩) 'উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।' (সাঙ্খ্যকারিকা)।

অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবের অন্যথা হইতে পারে না বলিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥' (১)

—কেহ কখনও ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণসকল প্রাণিদিগকে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করে। তাহারা অস্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, মনুষ্য যখন কর্ম্ম বা পরিশ্রম না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন সেই পরিশ্রম উৎকৃষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াই প্রার্থনীয়।

'কর্ম্ম বা পরিশ্রম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ'—এই সিদ্ধান্তে কিছু কিছু আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। তাহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত ও মীমাংসিত হইতেছে। প্রথমতঃ, নিদিধ্যাসন বা সমাধি, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সমাধি-কালে যোগীদিগের কর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না। আসনদ্বারা শরীর নিশ্চল থাকে। কুম্ভকদ্বারা প্রাণবায়ুর ক্রিয়াপর্য্যন্ত নিয়মিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক হইলে সমাধি হইতে পারে না, সমাধি হইলে কর্ম্মের স্বাভাবিকত্ব-সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। এইরূপ উভয়পক্ষে যে দোষ হয়, তাহাকে দার্শনিকেরা 'উভয়তঃপাশা রজ্জুঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। যে রজ্জুর উভয়প্রান্তে বন্ধনযন্ত্র থাকে, তাহাকে 'উভয়তঃপাশা রজ্জু' বলে। উভয়তঃপাশা রজ্জুর কোনদিকেই যাইবার উপায় নাই। কারণ, যে দিকেই যাওয়া যাউক না কেন, বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। উল্লিখিতশ্রেণীর দোষও এইরূপ। যে পক্ষই অবলম্বন করা যাউক না কেন, দোষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ স্বভাবের অন্যথা করা সাধ্যাতীত হইলেও, প্রযত্নদ্বারা কিয়ৎকালের জন্য কোন কোন স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রতিরোধ বা বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ করিতে পারা যায়। যেমন, অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু একজাতীয় মণি আছে,

(১) ভগবদ্গীতা। ৩। ৫।

(২) ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ইহাকে ডাইলেমা (Dilemma) বলিয়া নির্দ্দে

যাহা নিকটে রাখিলে, তৎকালে অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রতিরুদ্ধ হয় (১)। তখন দহনের সহিত দাহ্যবস্তুর সংযোগ করিলেও উহা দগ্ধ হয় না। জলের শীতলতা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও অগ্নি বা আতপ সংযোগে তাহার সাময়িক-উষ্ণতা-সম্পাদন বা শীতলতার প্রতিরোধ হইয়া থাকে। প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা জলের স্বাভাবিক দ্রবত্ব কিয়ৎকালের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইয়া করকা ও তুষারেরও উৎপত্তি হয়। সেইরূপ কর্ম্ম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বারা সমাধিসময়ে তাহা প্রতিরুদ্ধ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক উপায় দ্বারা স্বভাবের অন্যথাকরণ সাধ্যাতীত হইলেও শাস্ত্রীয় উপায়ের অসাধ্য কিছুই নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইলেও,—আমাদের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও, শাস্ত্রোক্ত শমদমাদি ও জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়প্রবণতা ও মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া থাকে। মনুষ্য স্বভাবতঃ গুরু ও স্থূল হইলেও, লঘিমা ও অণিমারূপ যোগবিভূতি দ্বারা এত লঘু ও এত সূক্ষ্ম হইতে পারে যে, চন্দ্ররশ্মি-অবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমন ও শিলার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। যোগশাস্ত্রোক্ত বিভূতি-সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কেন না, যোগসাধনা দ্বারা যে-কোন-একটি বিভূতি লাভ করিতে পারিলে, শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ে যোগীর দৃঢ়তর বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে, এই অভিপ্রায়েই যোগশাস্ত্রে চিত্তের পরিকর্ম্ম (২) ও বিভূতিসকল উপদিষ্ট হইয়াছে (৩)। ইহার শতশত

(১) ইহা কি এশ্‌বেস্‌টস্ (Asbestos)?

(২) 'মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।'
(পাতঞ্জলসূত্র। ১। ৩৩।)

সুখসম্ভোগাপন্ন সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, দুঃখিত সমস্ত প্রাণীতে করুণা, পুণ্যশীলদিগের প্রতি মুদিতা এবং পাপশীলদিগের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এই ভাবনাচতুষ্টয় যোগশাস্ত্রে চিত্তপরিকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত।

(৩) 'তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিষয়ঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপ্যাপবর্গাৎ শ্রদ্ধীয়তে। এতদর্থমেবেদং চিত্তপরিকর্ম্ম নির্দিশ্যতে।' (যোগভাষ্য [illegible] । ৩৫।)

শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাহুল্যভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে বিরত হইলাম।

তৃতীয়তঃ, কর্ম্ম বা পরিশ্রম দুইপ্রকার,—বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ। সমাধিকালে বাহ্যকর্ম্ম না থাকিলেও আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম থাকে। কুম্ভক-দ্বারা প্রাণবায়ুর বহিঃসঞ্চার নিবারিত হয় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সঞ্চার নিবারিত হয় না। আভ্যন্তরীণ-বায়ু-সঞ্চার না থাকিলে শরীর পূতি-গন্ধযুক্ত ও গলিত হইতে পারে। শরীরধারণপ্রযত্নও সমাধিকালে বিলুপ্ত হয় না। শরীরধারণপ্রযত্ন না থাকিলে যোগীর শরীর পড়িয়া যাইতে পারে। প্রাণবায়ুর আভ্যন্তরীণ সঞ্চার থাকে বলিয়াই সমাধিকালে যোগী-দিগের পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পিপীলিকাসঞ্চরণের ন্যায় একপ্রকার স্পর্শ অনুভূত হয়, এবং প্রাণবায়ু ধমনীবিশেষে প্রতিহত হইয়া ঘণ্টাদি-ধ্বনির ন্যায় একরূপ ধ্বনি উৎপাদন করে, তাহাও যোগিগণ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

সমাধিকালে ধ্যেয়বস্তুর যথার্থ স্বরূপের যে পরিস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, উহা 'জ্ঞান'—উহা প্রত্যক্ষের পরাকাষ্ঠা, উহা 'ক্রিয়া' নহে। 'জ্ঞান' কারণ; 'ক্রিয়া'—কার্য্য। আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় (১)। 'জ্ঞান' হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হয়; 'ইচ্ছা' কৃতি বা প্রযত্নের অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উৎপাদন করে; 'প্রযত্ন' চেষ্টা বা কায়িকব্যাপারের জনক; 'ক্রিয়া' চেষ্টাজন্য (২)। যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে আমাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়টি উপাদেয় বা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহার 'উপাদান' বা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা, এবং জ্ঞাত বিষয়টি হেয় বা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহার 'হান' বা বর্জন করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। অজ্ঞাতবিষয়ে কখনও ইচ্ছা হইতে পারে না। 'ইচ্ছা' তদনুরূপ প্রযত্ন উৎপাদন করে। প্রযত্নদ্বারা চেষ্টা

(১) 'আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়মর্থেন।' (ন্যায়ভাষ্য)।

(২) 'জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা তজ্জন্যৈব ক্রিয়োচ্যতে।' (কারিকা)।

জন্মে। চেষ্টা হইতে হান বা উপাদান সম্পন্ন হয়। সুতরাং জ্ঞান' ক্রিয়ার উৎপত্তির হেতু, উহা ক্রিয়া নহে।

যেরূপ বলা হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'ক্রিয়া' প্রযত্নসাধ্য, 'জ্ঞান' প্রযত্নসাধ্য নহে,—প্রত্যুত ইচ্ছা দ্বারা প্রযত্নের সাধন। 'প্রযত্ন'—চেষ্টাদ্বারা ক্রিয়ার সাধন। সুতরাং 'জ্ঞান' ও 'মানসী ক্রিয়া' আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। কদাচিৎ কোন ক্রিয়া কোন জ্ঞানের 'প্রযোজক' অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বা ব্যবহিতরূপে পরম্পরা-হেতু হইলেও, ঐ প্রয়োজকক্রিয়াও যে জ্ঞানজন্য ও জ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রমাণদ্বারা প্রমেয়ের যথার্থ স্বরূপের অবগতির নাম 'জ্ঞান'। অর্থাৎ 'জ্ঞান' জ্ঞেয়বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হয় ও তাহারই প্রকাশ করে (১)। 'মানসী ক্রিয়া' বস্তুর স্বরূপের অপেক্ষা করে না। যেমন পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে (২) পুরুষ ও স্ত্রী প্রভৃতি পাঁচটি বস্তুকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে। পুরুষাদিতে অগ্নিবুদ্ধি 'মানসী ক্রিয়া', জ্ঞান নহে। কারণ, উহা পুরুষপ্রযত্নসাধ্য এবং উহাতে বস্তুর স্বরূপের অপেক্ষা নাই। অধিকন্তু, উহা বিধিপরতন্ত্র। প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা 'জ্ঞান', মানসী ক্রিয়া নহে। কারণ, উহা পুরুষপ্রযত্নসাধ্য নহে, উহা বস্তুস্বরূপের অপেক্ষা করে,—উহা বস্তুতন্ত্র, বিধিপরতন্ত্র নহে। 'মানসী ক্রিয়া'—বস্তুতন্ত্র নহে, পুরুষতন্ত্র কেন না, পুরুষাদিতে অগ্নিবুদ্ধি পুরুষের ইচ্ছাধীন। পুরুষ ইচ্ছা করিলে পুরুষাদিতে অগ্নিবুদ্ধি করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে অগ্নিবুদ্ধি না করিতেও পারে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইলে যে অগ্নিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষাদিতে অগ্নিবুদ্ধির ন্যায় পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। উহা বস্তুতন্ত্র। পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও উহা উৎপন্ন হইবে। সুতরাং প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি 'জ্ঞান', 'মানসী ক্রিয়া' নহে। ফলতঃ 'জ্ঞান'—বস্তুস্বরূপসাপেক্ষ, 'মানসী ক্রিয়া'—বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষ। জ্ঞান ও মানসী ক্রিয়ার এই সূক্ষ্ম প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

---

(১) স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যথার্থজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা বলা হইল।

(২) ছান্দোগ্যোপনিষদাদিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে।

'কর্ম্ম বা পরিশ্রম মনুষ্যের স্বাভাবিক'—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কর্ম্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক হইলে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন না হইলে মুক্তি হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক কর্ম্মবন্ধনের সমুচ্ছেদ সম্ভবপর নহে।

এই আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। লৌকিক উপায়ে কর্ম্মবন্ধনের সমুচ্ছেদ অসম্ভব হইলেও, অলৌকিক অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপায়ে উহা সম্ভবপর হইবার কিছুই বাধা নাই। বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, দ্বিতীয় আপত্তির কিছুমাত্র সারবত্তা নাই। তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

'কর্ম্ম বা পরিশ্রম করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ'—এই সিদ্ধান্তে মনুষ্যশব্দের অর্থের প্রতি মনোযোগ করা আবশ্যক। মনুষ্যশব্দের অর্থ 'সংঘাত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীর। কারণ, মনুষ্যত্ব-ব্রাহ্মণত্ব-প্রভৃতি 'জাতি' বা ধর্ম্ম—শরীরগত। 'আত্মা' সংঘাতসংযুক্ত হইলেও আত্মার মনুষ্যত্ব বা ব্রাহ্মণত্বাদি 'জাতি' নাই। নট যেমন তত্তদ্বেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক কোনসময় অজাতশত্রু, কোন সময় বৎসরাজ, কোনসময় বা জামদগ্ন্য হয়, আত্মাও তদ্রূপ বিভিন্ন শরীর পরিগ্রহ করিয়া কোনসময় মনুষ্য, কোনসময় বা পশ্বাদিরূপে প্রতীয়মান হয়। 'আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি প্রতীতি 'অধ্যাস'মাত্র অর্থাৎ ভ্রমাত্মক জ্ঞান। 'সংঘাত' ও 'আত্মা' তমঃপ্রকাশের ন্যায় অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও, দোষপ্রযুক্ত ঐ ভেদ প্রতীত হয় না। প্রত্যুত সংঘাত ও আত্মাকে এক করিয়া 'আমি মনুষ্য', আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি জ্ঞান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা— ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-ভেদাতীত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,—'রজোগুণ ক্রিয়াস্বভাব', সুতরাং রজঃপ্রধান মনুষ্যও ক্রিয়াস্বভাব। 'শরীর—ভৌতিক পদার্থ, সুতরাং ত্রিগুণাত্মক। অর্থাৎ সমস্ত জড়বর্গই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের কার্য্য। 'উপাদেয়' বা কার্য্য—উপাদানের সমানধর্ম্মা হইয়া থাকে। যেমন ঘটের 'উপাদান' —মৃত্তিকা অর্থাৎ মৃত্তিকাদ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয়, এইজন্য ঘটও মৃ[illegible]ক। সুবর্ণদ্বারা কুণ্ডল নির্ম্মিত হয়, এইজন্য কুণ্ডল সুবর্ণাত্মক। [illegible]দ্বারা ভূত ও ভৌতিকের নির্ম্মাণ হয়, এইজন্য ভূত ও ভৌতিক সকলই

ত্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে মনুষ্যশরীর—রজঃপ্রধান, সুতরাং ক্রিয়াস্বভাব। আত্মা জড় নহে, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা চেতন। আত্মা ত্রিগুণাত্মক নহে, আত্মা গুণাতীত। গুণাতীত আত্মার ক্রিয়া হইতে পারে না। কারণ, ক্রিয়া—রজোগুণের কার্য্য। পক্ষান্তরে, শরীরের মুক্তি হয় না, আত্মার মুক্তি হয়। অতএব 'কর্ম্ম' শরীরের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, আত্মার মুক্তি-লাভের কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে না।

আত্মা গুণাতীত বলিয়া 'নিষ্ক্রিয়'। নৈয়ায়িকমতে ক্রিয়ার যেরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদনুসারেও আত্মাতে ক্রিয়া হইতে পারে না। যাহার পরিমাণ অপকৃষ্ট অর্থাৎ যে বস্তু কোন-নির্দ্দিষ্টদেশ-পরিচ্ছিন্ন, তাহাকে 'মূর্ত্ত' বলে। 'মূর্ত্তত্ব'—ক্রিয়ার কারণ। অর্থাৎ মূর্ত্তপদার্থই ক্রিয়ার আশ্রয়—মূর্ত্ত পদার্থেই ক্রিয়া জন্মে। শরীর—মূর্ত্তপদার্থ, সুতরাং ক্রিয়ার আশ্রয়। আত্মা 'অমূর্ত্ত'—বিভু বা সর্ব্বব্যাপক, এইজন্য আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় নহে। অর্থাৎ আত্মা—'নিষ্ক্রিয়'। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়টি সহজবোধ্য হইতে পারে। 'গমন'—একটি ক্রিয়া। উত্তরদেশ-সংযোগানুকূল ব্যাপারের নাম 'গমন'। যে দেশে যে অধিষ্ঠিত থাকে, তদ্দেশ অপেক্ষা ভিন্নদেশই তাহার পক্ষে 'উত্তরদেশ'। যে ব্যাপার বা ক্রিয়া দ্বারা উত্তরদেশের সহিত সংযোগ সম্পন্ন হয়, তাহাই 'উত্তরদেশ-সংযোগানুকূল ব্যাপার' বা গমনক্রিয়া। যাহা 'মূর্ত্ত' অর্থাৎ যাহার পরিমাণ কোন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ, তাহারই গমনক্রিয়া হইতে পারে। কেন না, মূর্ত্তপদার্থেরই পূর্ব্বদেশসংযোগ বিনষ্ট হইয়া দেশান্তরের সহিত সংযোগ হওয়া সম্ভবপর। যাহা 'অমূর্ত্ত', অর্থাৎ যাহার পরিমাণ দেশবিশেষ-পরিচ্ছিন্ন নহে—যাহা বিভু বা সর্ব্বদেশসংযুক্ত, কোনরূপেই তাহার গমনক্রিয়া হইতে পারে না। কেন না, যে সমস্তদেশে অধিষ্ঠিত, তাহার পক্ষে দেশান্তর বা উত্তরদেশ সম্ভব হয় না। আত্মা—অমূর্ত্ত বা বিভু, সুতরাং আত্মা 'নিষ্ক্রিয়'।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে, তাহার কর্ম্মও নাই, তাহার বন্ধনও নাই, তাহার ছেদনও নাই। সুতরাং 'কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে আত্মা মুক্ত হন', অজাত পুত্রের নামকরণের ন্যায়" এই উক্তি নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতেছে। শরীরের কর্ম্ম দ্বারা যদি আত্মার বন্ধন হয়,

তবে দেবদত্তের কর্ম্ম দ্বারাও যজ্ঞদত্তের বন্ধন হইতে পারে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শরীরের কর্ম্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ হইবার বাধা নাই। কেন না, শরীর ও আত্মাকে এক করিয়া—

'অহং স্থূলঃ, অহং কৃশঃ, অহং করোমি, অহং গচ্ছামি।—

অর্থাৎ 'আমি স্থূল', আমি কৃশ', আমি করিতেছি', আমি যাইতেছি'— ইত্যাকার শতশত অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান বর্ত্তমান আছে। শরীর ও আত্মার যখন অভেদাধ্যাস রহিয়াছে, তখন শরীরের কর্ম্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের অভেদাধ্যাস নাই। অর্থাৎ আত্মা ও দেহকে এক করিয়া যেমন 'অহং মনুষ্যঃ' ইত্যাদি অভেদাধ্যাস আছে, দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তকে এক করিয়া সেইরূপ অভেদাধ্যাস দেবদত্তের বা যজ্ঞদত্তের নাই। এইজন্য দেবদত্তের কর্ম্ম যজ্ঞদত্তের বন্ধনস্বরূপ হয় না। অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান—যত অনর্থের মূল। একএকটি মিথ্যাজ্ঞানের জন্য আমাদিগকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহা সকলেই জানেন, স্থলবিশেষে পুত্রাদির কার্য্যের জন্য পিত্রাদিকে দায়ী হইতে হয়। 'সংসর্গাধ্যাস' অর্থাৎ 'আমার পুত্র', 'আমার পরিজন' ইত্যাদি 'মমকার' তাহার কারণ। সৈনিকেরা যুদ্ধ করেন, সৈনিকের জয় বা পরাজয় রাজার ইষ্ট বা অনিষ্ট সম্পাদন করে। কারণ, সৈনিকদিগের প্রতি রাজার মমকার বা সংসর্গাধ্যাস আছে। যে রাজার সৈনিকদিগের প্রতি মমকার বা সংসর্গাধ্যাস নাই, সৈনিকদিগের জয় বা পরাজয়ে তাঁহার ইষ্ট বা অনিষ্ট হয় না। যে সৈনিকদিগের প্রতি যে রাজার মমকার বা সংসর্গাধ্যাস ছিল, বৈরাগ্যাদিকারণবশতঃ তাঁহার সেই অধ্যাস অপনীত হইলে, সেই সৈনিকদিগের জয়পরাজয়ে আর তাঁহার ইষ্টানিষ্ট হয় না। রাজর্ষি জনকের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা 'মিথ্যাজ্ঞান' অর্থাৎ অহঙ্কার-মমকার অপনীত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে,—

'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভো ন মে ক্ষতিঃ।'—

'মিথিলানগরী প্রজ্বলিত হইলে আমার লাভও নাই, ক্ষতিও নাই।' তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা, উভয়বিধ অধ্যাস অর্থাৎ অহঙ্কার-মমকার বিদূরিত হইলে, শরীরের কর্ম্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ হয় না। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে যে,--

'অশ্বমেধসহস্রেণ ব্রহ্মহত্যাশতেন বা।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যন্তে যেষাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতম্ ॥'—

যাঁহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম আছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়াছে, সহস্র অশ্বমেধ ও শত ব্রহ্মবধ করিলেও তাঁহারা পুণ্যপাপলিপ্ত হন না।'

ফলতঃ বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে বস্তুগত্যা আত্মার কর্ম্মবন্ধন নাই। মিথ্যাজ্ঞানমূলে আত্মার বন্ধন এবং মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হইলেই 'মুক্তি হইল' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত। এইসকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ন্যায়মতে 'প্রযত্ন'—আত্মার গুণ, শরীরের গুণ নহে। ক্রিয়ানুকূল প্রযত্নের আশ্রয়—'কর্ত্তা'। অর্থাৎ যাহার প্রযত্নদ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তিনিই 'কর্ত্তা'। শরীরে 'ক্রিয়া' জন্মে বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়ার জনক প্রযত্ন—আত্মাশ্রিত। প্রথমতঃ আত্মাতে প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, পরে সেই প্রযত্নদ্বারা শরীরের 'ক্রিয়া' নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব 'আত্মা'—ক্রিয়ার আশ্রয় না হইলেও, ক্রিয়ার কর্ত্তা।

'ক্রিয়া' অন্যগত হইলেও, ক্রিয়ার কর্ত্তা ক্রিয়াজন্য শুভাশুভ ফলভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। পুরুষের প্রযত্ন দ্বারা বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, নিক্ষিপ্ত বাণ বধ্যের বধসম্পাদন করে। এস্থলে গতিক্রিয়া বাণসমবেত হইলেও, যে পুরুষ তাহার কর্ত্তা, অর্থাৎ যাহার প্রযত্নদ্বারা বাণের ক্রিয়া সমুৎপন্ন হইয়াছে, সে-ই বধের ফলভাগী, বাণ বধের ফলভাগী নহে। সেইরূপ 'ক্রিয়া' শরীরসমবেত হইলেও, শরীর—ক্রিয়ার ফলভাগী নহে, ক্রিয়ার কর্ত্তা আত্মাই তাহার ফলভাগী। সুতরাং ন্যায়মতে—শরীরসমবেত ক্রিয়া আত্মার বন্ধনস্বরূপ হইবে, ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই।

'কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' (১)—ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বেদান্তদর্শনেও আত্মার ঔপাধিক কর্তৃত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে—'কর্তৃত্ব' গুণধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের মতে 'কর্তৃত্ব' গুণের ধর্ম্ম হইলেও, এবং আত্মা সম্পূর্ণ উদাসীন বা মধ্যস্থ হইলেও, তিনি (আত্মা) কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হন। তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধি—ত্রিগুণাত্মিকা।

---

(১) বেদান্তদর্শন ২। ৩। ৩৩ সূত্র।

প্রযত্নাদি—বুদ্ধিধর্ম্ম। বুদ্ধি বিশেষভাবে আত্মার সন্নিহিতা বলিয়া, আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন। এই সন্নিধান বা সংযোগবশতঃ অচেতনা বুদ্ধি চিচ্ছায়াপত্তিদ্বারা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মানা হয়। এবং মুখের মালিন্য না থাকিলেও, মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পাড়লে, দর্পণধর্ম্ম 'মালিন্য' যেমন মুখে আরোপিত হয়, তেমনি আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলেও, বুদ্ধিধর্ম্ম 'কর্তৃত্ব' বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত আত্মাতে আরোপিত হয়। ভগবান্ও ইহাই বলিয়াছেন।—

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' (১)

সমস্ত কর্ম্মই প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ হয়। আত্মা 'অহঙ্কারবিমূঢ়' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাধ্যাস দ্বারা বিমূঢ় হইয়া নিজেকে 'কর্ম্মের কর্ত্তা' বলিয়া বিবেচনা করেন। বুদ্ধিধর্ম্মের আত্মাতে আরোপ হয় বলিয়াই, আত্মার সংসার এবং সুখদুঃখভোগ ব্যপদিষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ বা বীজভাব নষ্ট করে। কর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইলে, কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও, ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কেন না, মিথ্যাজ্ঞান কর্ম্মফলের সহকারি-কারণ। যাঁহার আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহার সঞ্চিত-কর্ম্মরূপ কারণ থাকিলেও, মিথ্যাজ্ঞানরূপ সহকারি-কারণ নাই বলিয়া, কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবে না। এবিষয়ে শাস্ত্রে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এই—

'মিথ্যাজ্ঞানসলিলাবসিক্তায়ামেবাত্মভূমৌ কর্ম্মবীজং ফলাঙ্কুরমারভতে, নতু তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসলিলায়ামূষরায়ামপি।' (২)

বীজ অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ। তাই বলিয়া নির্জল শুষ্কভূমিতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুর জন্মে না। কিন্তু জলসিক্ত ভূমিই অঙ্কুরোৎপত্তির উপযুক্ত স্থান। প্রস্তাবিত বিষয়ে 'কর্ম্ম'—বীজ, 'আত্মা'—ভূমি, 'মিথ্যা-জ্ঞান'—জল, 'ফল'—অঙ্কুর, 'তত্ত্বজ্ঞান'—নিদাঘ অর্থাৎ গ্রীষ্ম-ঋতু বা

---

(১) ভগবদ্গীতা। ৩। ২৭।

(২) চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। ভামতী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ইহার সমানার্থ বাক্য আছে।

প্রথরতাপরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃতবাক্যের এই অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ-জলসিক্ত আত্মরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে, তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিদাঘদ্বারা যাঁহার মিথ্যা-জ্ঞানরূপ সলিল নিপীত হইয়াছে, তথাবিধ শুষ্ক উষর আত্মভূমিতে কর্ম্মফল জন্মে না।

প্রসঙ্গক্রমে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। পরিশ্রমের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে বক্ষ্যমাণ আপত্তি উঠিতে পারে। পরিশ্রম করিলে কষ্ট বা দুঃখ হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুঃখ স্বভাবতঃ 'দ্বিষ্ট' অর্থাৎ দ্বেষের বিষয়। কেহই দুঃখ ভালবাসে না। সকলেই দুঃখকে দ্বেষ করিয়া থাকে। সুতরাং দুঃখ 'দ্বিষ্ট'। পরিশ্রম দুঃখজনক, সুতরাং 'দ্বিষ্টসাধন'। 'দ্বিষ্ট-সাধনতাজ্ঞান" নিবৃত্তির কারণ। অতএব পরিশ্রমে প্রবৃত্তি না হইয়া নিবৃত্তিই হইতে পারে। ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, দ্বিষ্টসাধনতা-জ্ঞান যেমন নিবৃত্তির কারণ, 'ইষ্টসাধনতাজ্ঞান' তেমনি প্রবৃত্তির কারণ। 'ইষ্ট'—ইচ্ছার বিষয়। যাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, তাহার সাধন; অর্থাৎ যদ্দ্বারা অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়, তাহাকে 'ইষ্টসাধন' কহে। পরিশ্রম-দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায়, সুতরাং পরিশ্রম 'ইষ্টসাধন'। কেন না, সুখ ও দুঃখাভাবই সহজতঃ ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। পরিশ্রম-দ্বারা সুখ ও দুঃখাভাব সম্পন্ন হয়। অতএব পরিশ্রমের 'দ্বিষ্টসাধনতা আছে' বলিয়া যেমন তদ্বিষয়ে নিবৃত্তি হইতে পারে, 'ইষ্টসাধনতা আছে' বলিয়া সেইরূপ প্রবৃত্তিও ত হইতে পারে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ। এক বিষয়ে, এক কালে, এক পুরুষের পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হওয়া একান্ত অসম্ভব। কেবল 'ইষ্টসাধনতাজ্ঞান' প্রবৃত্তির এবং 'দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান' নিবৃত্তির কারণ হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বিষয়লাভ দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কারণ, এমন বিষয় নাই, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সম্পাদন করে। সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর সুখ ও দুঃখের সাধন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

'দৃষ্টং কিমপি লোকেঽস্মিন্ ন নির্দোষং ন নির্গুণম্।'

সুখসম্পাদনে প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক। অভিলষিত শব্দাদি-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিমত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ—ইন্দ্রিয়পরিচালনাসাপেক্ষ। অনেকস্থলে অভিমত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধসম্পাদন—চেষ্টাসাপেক্ষ। যাঁহারা অভিনয়-দর্শন বা গীতশ্রবণ-জন্য সুখানুভব করেন, তাঁহারা নাট্যশালাদিতে যাইয়া অভিমতবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ সম্পাদনপূর্ব্বক সুখানুভব করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক সুখসাধনের সহিত অন্ততঃ কিয়ন্মাত্র দুঃখ অপরিহার্য্য রহিয়াছে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া কখনই বিষয়-গ্রহণ করা যায় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুলির পরিচালনা আবশ্যক হয়। 'ইষ্টসাধনতাজ্ঞান'মাত্র প্রবৃত্তির এবং 'দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান'মাত্র নিবৃত্তির কারণ হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই-জন্য আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ বটে, কিন্তু বলবদ্দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় দ্বেষ হয়, তাহার নাম 'বলবদ্দ্বিষ্ট'। মধু ও 'বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজনবিষয়ে কাহারই প্রবৃত্তি হয় না। মধুমিশ্রিত অন্ন সুস্বাদু। তাহার ভোজন 'ইষ্টসাধন' হইলেও, বিষমিশ্রিত অন্নের ভোজন 'বলবদ্দ্বিষ্টসাধন'। কেন না, বিষমিশ্রিত-অন্ন-ভোজনে মৃত্যু হইতে পারে। মৃত্যু—বলবদ্দ্বিষ্ট। এইজন্য মধুবিষামিশ্রিত-অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমাত্র প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইলে, মধুবিষমিশ্রিত-অন্ন-ভোজনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হয় না বলিয়াই, 'বলবদ্দ্বিষ্ট-সাধনতাজ্ঞান' প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। এবং 'দ্বিষ্ট-সাধনতাজ্ঞান' নিবৃত্তির কারণ হইলেও, 'বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান' নিবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যে বিষয়ে উৎকট বা অতিশয় অভিলাষ জন্মে, তাহাকে 'বলদিষ্ট' কহে। 'বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞান' নিবৃত্তির প্রতিবন্ধক না হইলে, পাকাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, বরং নিবৃত্তি হওয়াই সঙ্গত হয়। কারণ, পাক করিতে কষ্ট হয়, সুতরাং পাকের 'দ্বিষ্টসাধনতা' আছে। কিন্তু পাকের 'বলবদিষ্টসাধনতা' আছে, এইজন্য পাকবিষয়ে নিবৃত্তি হয় না, প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে। কেন না,

পাক করিয়া ভোজন করিলে যে তৃপ্তি বা সুখ হয়, তাহা 'বলবদিষ্ট'। ইষ্ট ও দ্বিষ্টগত বলবত্ত্ব স্বভাবতঃ ব্যবস্থিত নহে। অবস্থাভেদে এবং রুচি-ভেদে উহা বিবেচিত হইয়া থাকে। এক অবস্থায় যাহা 'বলবদ্দ্বিষ্ট' বলিয়া বোধ হয়, অবস্থান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া থাকে দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ যথার্থ বলিয়াছেন,—

'ভিন্নস্পৃহাণাং প্রতি চার্থমর্থং
দ্বিষ্টত্বমিষ্টত্বমপব্যবস্থম।'

হস্তপদাদির ছেদন 'বলবদ্দ্বিষ্ট,' কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা 'দ্বিষ্ট' না হইয়া 'ইষ্ট' হইয়া থাকে। যখন হস্তপদাদিতে এমন দূষিত ক্ষত জন্মে যে, তাহা ছেদন না করিলে জীবনরক্ষা হইবার উপায়ান্তর থাকে না, তখন জীবনরক্ষার জন্য লোকে হস্তপদাদি ছেদন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন জীবনরক্ষা 'বলবদিষ্ট' বলিয়া হস্তপদাদিচ্ছেদন 'বলবদ্দ্বিষ্ট' বিবেচিত হয় না। এমন লোকও নিতান্ত বিরল নহে, যে জীবনরক্ষার জন্যও হস্তপদাদি ছেদন করিতে চাহে না। তাহারা বিবেচনা করে যে, মৃত্যু মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী, সকলকেই মরিতে হইবে। সুতরাং কয়েকদিন জীবনধারণের জন্য হস্তপদাদি ছেদন করা সঙ্গত নহে। বীরগণ শত্রুর উপর জয়লাভ এত অভ্যর্হিত বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং মহাজনেরা যশ এত ভালবাসেন যে, তজ্জন্য তাঁহারা শরীররক্ষার দিকে দৃষ্টিই করেন না। কবি বলিয়াছেন,—

'চিন্তা যশসি ন বপুষি প্রায়ঃ পরিদৃশ্যতে মহতাম্।'

অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। ক্ষুধার তাড়নায় শরীররক্ষার জন্য সকলেই ভোজন করিয়া থাকেন। ভোজন অল্পপরিশ্রমসাধ্য নহে। হস্ত-সঞ্চালন, মুখসঞ্চালন ও আহার্য্যবস্তুর গলাধঃকরণে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। অনেকে ভোজনকালে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া থাকেন, তথাপি ভোজন হইতে নিবৃত্ত হন না। আবার দুইটি দুঃখ বলবদ্দ্বেষবিষয় হইলেও সময়বিশেষে উহার মধ্যে একটি দুঃখ বিশেষরূপে 'বিদ্বিষ্ট' হইয়া উঠে। তখন ঐ দুঃখ পরিহারের জন্য অপর দুঃখটি অঙ্গীকৃত হয়। তৎকালে উহা 'বলবদ্দ্বিষ্ট' বলিয়া বিবেচিত হয় না। শোকাকুলদিগের আত্মহত্যা ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। ক্ষণিক সুখলাভের

প্রত্যাশায় লোকে কত কষ্ট স্বীকার করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার কারণও আছে। অভাব, বস্তুর গৌরব সম্পাদন করে। মনুষ্য—রজঃপ্রধান, 'দুঃখ'—রজোগুণের পরিণামবিশেষ। সুতরাং মনুষ্য 'দুঃখে জড়িত' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুখ—সত্ত্বগুণের কার্য্য। মনুষ্যের সত্ত্বগুণ থাকিলেও তাহা প্রধান নহে। মনুষ্যের পক্ষে দুঃখ যেরূপ সুলভ, সুখ সেরূপ সুলভ নহে। কিন্তু সুখের মোহিনী শক্তি অতুলনীয়। সুখের প্রত্যাশা তাড়িতের ন্যায় অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ উৎপাদন করে। ভূতাবিষ্টের ন্যায় দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া লোক সুখসম্পাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। সামান্য সেতু যেমন প্রখর স্রোতের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বাধাবিঘ্ন তৎকালে উৎসাহ-উদ্যম প্রতিহত করিতে পারে না। তখন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। অক্লান্তমনে অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। এইজন্য কবি বলিয়াছেন,—

'ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে'—

এস্থলে সুখশব্দ একবচনান্ত ও দুঃখশব্দ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিয়া কবি নিজের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, কবির বাক্য যথার্থ, ইহাতে অত্যুক্তির লেশমাত্র নাই। সত্যসত্যই একএকটি সুখ লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে অনেকপ্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয়। দুঃখের কশাঘাত না থাকিলে, জগতে সুখের এত আদর হইত কি না, সন্দেহ। প্রতিপক্ষ না থাকিলে কোন বস্তুরই গৌরব পরিস্ফুট হয় না। অন্ধকার যেমন আলোকের গৌরব ও উপাদেয়তার তুলাদণ্ড, অর্থাৎ অন্ধকারের গাঢ়তার তারতম্য যেমন আলোকের উপাদেয়তার তারতম্য সম্পাদন করে, সেইরূপ দুঃখ, সুখের আদরের ও উপাদেয়তার তুলাদণ্ড কি না, তাহাও বিবেচ্য।

'সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।'—

'ঘোরতর অন্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায় অনেক-দুঃখ-অনুভবের পর সুখ শোভা পায়।'—এই উক্তি দ্বারা কবিরও তাহাই অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। ধনলাভ করিতে পারিলে

সুখস্বচ্ছন্দতা হইবে, এই আশায় মুগ্ধ হইয়া ধনার্জ্জনের জন্য লোকে কতই-না কষ্ট করিয়া থাকে। অধিক কি, যে শরীরের বা জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা-সম্পাদনের জন্য লোকে ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, ধনার্জ্জনব্যাসক্ত ব্যক্তি তৎকালে সেই শরীর বা জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করেন ধনার্জ্জনের জন্য শরীর বা জীবন বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহা মোহান্ধ মানবের অনুরূপ কার্য্য; সুখের মোহিনী শক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। সুখপ্রত্যাশায় কষ্টভোগের এবং সুবিধা-সম্পাদনের জন্য অসুবিধাভোগের শতশত নিদর্শন সকলেই অবগত আছেন। অপরিসীম পরিশ্রম ও অসুবিধাভোগের পর অভিলষিত-বস্তু-লাভ হইলে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার তুলনা নাই। অভিমত-বস্তু-লাভের এমনই মাহাত্ম্য যে, পরিশ্রমের ফললাভ হইলে পরিশ্রম-ক্লেশ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়। তখন উহা স্মৃতিপথেও অল্পই উদিত হইয়া থাকে। মনে নূতন স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কালিদাস যথার্থ বলিয়াছেন,—

'ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।'

অনায়াসলব্ধ বস্তুর লাভেও আনন্দ হয় বটে, কিন্তু পরিশ্রমলব্ধ-বস্তু-লাভের আনন্দ তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনায়াসলব্ধ বস্তু অপেক্ষা পরিশ্রমলব্ধ বস্তু মনস্বীদিগের সমধিক প্রীতিপ্রদ ও আদরণীয় হইয়া থাকে। লোকের অভাবের পরিসীমা নাই। অথচ পরিশ্রম ভিন্ন একটি অভাবও পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং পরিশ্রমের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। ফলতঃ পরিশ্রম আপাততঃ দুঃখকর হইলেও, পরিণামে উহা অসীম সুখের কারণ হইয়া থাকে। অতি সামান্য অভাবও যখন পরিশ্রম ভিন্ন পরিপূর্ণ হয় না, তখন দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলনের অভাব বিনা-পরিশ্রমে বা সামান্য পরিশ্রমে পরিপূর্ণ হইবে, এরূপ কল্পনা করাও অসঙ্গত। অলস ও সামান্য ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র। মহদ্ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই উচ্চতম লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত। তাঁহারা কখনই সামান্য বিষয় লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। ক্রমোন্নতি যদি মানবের প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তবে মানব উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতর হইতে উচ্চতম বিষয় লক্ষ্য ও অবলম্বন করিবে, এবং লক্ষ্যের উচ্চতাই মানবের মহত্ত্বের পরিচায়ক হইবে, ইহাও

প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরিশ্রম যদি বস্তুর উপাদেয়তা বা উৎকর্ষের পরিমাণনির্দ্দেশক হয়, তবে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন অধিকপরিশ্রমসাধ্য বলিয়া, দর্শনশাস্ত্র সমধিক উপাদেয় বা উৎকৃষ্ট, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরিশ্রমলব্ধ বস্তুই মনস্বীদিগের সমধিক প্রীতিপ্রদ। যে সুধী মানব ভূলোকস্থিত হইয়া দ্যুলোকস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আকার, সংস্থান, গতি, স্থিতি প্রভৃতি কত অচিন্তনীয় বিষয়সকলের তথ্যাবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন, অন্তরিক্ষলোকস্থিত বিদ্যুৎ যাঁহাদের বুদ্ধিবলে বশীভূত হইয়া কিঙ্করীর ন্যায় আজ্ঞাসম্পাদন করিতেছে, অন্নপাক করিবার সময় স্থালীর আচ্ছাদন শরাবের স্পন্দনরূপ সামান্য ঘটনা অবলম্বনে যাঁহারা আশ্চর্য্যকর কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেছেন, নৈসর্গিক কর্ম্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক বিদেহমুক্তিলাভের জন্য যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগের অনুশীলন করিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই সুধী মানবগণের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের পরিশ্রম—

'নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনম্।'—

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপরে যাহা করিতে পারেন, আমরা চেষ্টা করিলে তাহা করিতে পারিব না, আমাদের পূজাপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ যে দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুশীলনও করিতে পারিব না, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ইহার কল্পনাও লজ্জাকর। কতকগুলি পরিশ্রম আমাদের এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর তত পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভোজনের পরিশ্রমের উল্লেখ করিতে পারা যায়। তাহার কারণ এই যে, পরিশ্রম অর্থাৎ শক্তির পরিচালনা দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অল্পশক্তির পক্ষে যাহা আয়াসকর বা পরিশ্রম, বর্দ্ধিতশক্তির পক্ষে তাহা বিনোদমাত্র। একসময় যাহা সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়, চেষ্টাপ্রভাবে অন্যসময়ে তাহাই সাধ্যায়ত্ত বা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে সকল পরিশ্রমেই অভ্যস্ত হইতে পারা যায়। যাহার রসনা পিত্তদূষিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে শর্করা যেমন তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ যাঁহারা কখনও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু পিত্তদূষিত ব্যক্তি পুনঃপুনঃ শর্করার

আস্বাদন করিতে থাকিলে, কালে শর্করার মধুরতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহার পিত্তদোষও বিদূরিত হয়; তদ্রূপ দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকিলে, অল্পকাল পরেই উহার কষ্টকরত্ব থাকে না, অধিকন্তু অনুশীলন-কারী দর্শনশাস্ত্রের মাধুর্য্য অনুভব করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতে পারেন। একটি বিষয় আয়ত্ত হইলে, অপর বিষয়টি জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে ও তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে আয়ত্ত করা যায়। শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ হইলে, শ্রমের কষ্টকরত্ব সহজেই অপনীত হয়। কবি বলিয়াছেন যে, যাহার রসনা অপবিদ্যারূপ পিত্ত দ্বারা উপতপ্ত হইয়াছে, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণচরিত্রাদিরূপ শর্করা তাহার পক্ষে রুচিকর হয় না। কিন্তু আদর-পূর্ব্বক প্রতিদিন সেবা করিলে, উহা স্বাদু বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং রোগের মূল বিনষ্ট করে (১)।

উত্তম ব্যক্তির সমাদর যদি বস্তুর উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে হিন্দুদর্শনের উৎকৃষ্টতা সর্ব্ববাদিসম্মত, বলা যাইতে পারে। কেবল দেশীয় সুধীগণের কথা বলিতেছি না, ইউরোপীয় মনীষিগণের মূল্যবান্ সময়ের অনেক অংশ হিন্দুদর্শনের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। যাঁহারা তীক্ষ্নমনীষাবলে বিজ্ঞানাদি নানাবিধ উৎকৃষ্ট শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া তাহার সারোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হিন্দুদর্শন অকিঞ্চিৎকর, অসার বা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র হইলে তাঁহারা বিজ্ঞানাদি উৎকৃষ্টশাস্ত্রের অনুশীলন পরিত্যাগ বা সঙ্কুচিত করিয়া হিন্দুদর্শনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন না। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে সূক্ষ্মদর্শীদিগের যে জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হয় না, হিন্দুদর্শনের অনুশীলন তাহার নিবৃত্তি করিতে পারে। বিজ্ঞান যে বিষয়ে প্রদীপের আলোক প্রদান করিতেও সমর্থ হয় না, হিন্দুদর্শন তথায় সূর্য্যের আলোক বিকীর্ণ করিতে সক্ষম। বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্র ভূত-ভৌতিক-পদার্থমাত্রে সীমাবদ্ধ।

---

(১) 'স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাঽপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকৈব।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেব্যমানা
স্বাদ্বী ভবেদপি চ তদ্গদমূলহন্ত্রী॥'

উদ্ভট।

'আত্মা, পরলোক' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিজ্ঞান অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, বা কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। যখন বিজ্ঞান অধ্যাত্ম-বিষয়ে অগ্রসর হইবে, তখন দর্শনশাস্ত্র হইতে প্রচুর সাহায্য পাইবে, এবং তখন দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসকল 'বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া যদি জগতের প্রায় সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায় এবং তদ্দ্বারা প্রয়োজন-নির্ব্বাহ হয়, তবে আত্মাকে না জানিলেই বা ক্ষতি কি? ইহলোকসর্ব্বস্ব সংসারী জীবের অনুরূপ কথা বটে! শাস্ত্রে বলে, সংসারের সমস্ত বিষয় আত্মার উপকরণ বা প্রয়োজননির্ব্বাহক। সমস্ত বস্তু, আত্মার্থ বলিয়াই প্রিয়। ধন আমাদের প্রিয়, কেন না, ধন আত্মার ভোগসাধন। স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়, কেন না, স্ত্রীপুত্রাদি আত্মার ভোগসাধন বা প্রয়োজননির্ব্বা-হক। লোকে ধনের জন্য ধনকে ভালবাসে না। স্ত্রীপুত্রাদির জন্য স্ত্রীপুত্রাদিকে ভালবাসে না। আত্মার অভিলষিত-সম্পাদক বলিয়াই সকলকে ভালবাসে। এত প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রাদিও যদি নিজের প্রতিকূল হয়, তবে তাহাদিগকে কেহই ভালবাসে না। আত্মা কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। আত্মাতে প্রীতি 'নিরুপাধিক' অর্থাৎ স্বাভাবিক। স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত বিষয়ে প্রীতি 'সোপাধিক' অর্থাৎ আত্মার প্রীতিসাধন বলিয়া। সুতরাং আত্মা নিরতিশয় প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়বস্তু নাই (১)। আত্মাকে না জানিয়া যাঁহারা আত্মার প্রীতিসাধন বিষয় জানিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হন, তাঁহারা একান্ত হাস্যাস্পদ ও নিতান্ত মোহান্ধ। দেবর্ষি নারদ অপর সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী হইয়াও আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন নাই বলিয়া শোকাকুলচিত্তে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট

(১) 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।'—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪।৫

'তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥'—

পঞ্চদশী, প্রথম তত্ত্ববিবেক ৮

শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১)। পূজ্যপাদ আচার্য্যস্বামী বলিয়াছেন যে, আত্মতত্ত্ব না জানিয়া সমস্ত বেদ ও অপর সমস্ত বিদ্যা জানিলেও পুরুষ কৃতার্থ হইতে পারে না (২)। আমি সমস্ত বিষয় জানিতেছি পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতেছি, বুদ্ধিবলে অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছি, অথচ কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে—'তুমি কে', তাহা হইলে বলিব যে, 'আমি কে, তাহা জানি না।' ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে? গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্—'আমি কে', তাহা জানিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, 'আমি কিছুই জানি না।' কেহ বলেন যে, 'জ্ঞান কি', তাহা তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, হিন্দুদর্শনে আত্মার বিষয়ে বিস্তর বিশদ ব্যাখ্যা আছে। আত্মজ্ঞ হওয়া সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করা উচিত।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপীয়দর্শন অপেক্ষা ভারতীয়দর্শনের উৎকর্ষবিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভট্ট মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে— "মাধ্যমিক বা অধুনাতন ইউরোপীয়দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় পুরাতন দর্শন অনেক জ্ঞানগর্ভ। বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক দুরধিগম্য বিষয়ের অধিগম হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞানবিষয়ে প্রায় কিছুই হয় নাই। ভারতীয় নির্জন বনের নিস্তব্ধতার মধ্যে যে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল, জনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ রাজমার্গে তাহা পাওয়া যায় না।" জর্ম্মণির সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক শোপেন্‌হর প্রকাশ্য বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন যে— "ভারতীয় কাব্য ও দর্শন এক্ষণে ইউরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অভিনিবিষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাতে এত গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার তুলনায়

(১) 'অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ। * * * সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি। নাত্মবিৎ। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।'—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১।১—৩

(২) 'সর্ব্বানপি বেদানধীত্য সর্ব্বং চান্যদ্বেদ্যমধিগম্যাপ্যকৃতার্থ এব ভবতি যাবদাত্মতত্ত্বং ন জানাতি।'—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য। ৬।১।৩

ইউরোপীয়দর্শন অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং আমরা ভারতীয় দর্শনকর্ত্তাদের উদ্দেশে প্রণত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের স্বতই মনে হয় যে, মনুষ্যজাতির আস্থস্থান উচ্চদর্শনের জন্মভূমি।” ফ্রেডরিক শ্লিগল্ বলেন যে—“গ্রীকদর্শনের উচ্চশ্রেণীর যুক্তিতত্ত্ব ভারতীয়দর্শনের যুক্তিতত্ত্বের নিকট প্রস্ফুট দিবালোকে নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।” তিনি আরও বলেন যে—“পুরাকালে ভারতীয়গণ যথার্থ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেয় যে, মনুষ্য ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াই তাহার প্রত্যেক উদ্যম ও কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।”

ভিক্টর্ কোজিন্ দেশীয়শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, “উপনিষৎ-অধ্যয়ন অপেক্ষা মঙ্গলদায়ক ও উন্নতিসাধক অধ্যয়ন ইহজগতে আর নাই।” ‘উপনিষৎ-অধ্যয়নে জীবদ্দশায় যেরূপ শান্তি পাইয়াছেন, মৃত্যুকালেও সেইরূপ শান্তি পাইবেন,’ এরূপ আশাও তিনি করিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর এই মত সমর্থন করিয়া বলেন যে, “মনুষ্যদিগকে সুখে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত করাই যদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে বেদান্তদর্শনদ্বারা সে উদ্দেশ্য যেরূপ সুসিদ্ধ হইয়াছে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না।” সর্ উইলিয়ম জোন্স বলেন যে—“বেদান্তাদির সুচারু প্রস্তাবসকল পাঠ করিলে ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না যে, গ্রীসীয় পিথাগোরস বা প্লেটো তাঁহাদের উচ্চ ফোয়ারাসকল ভারতীয় জ্ঞানীদিগের উৎস হইতে পূর্ণ করিয়াছিলেন।”

ইউরোপীয় দূরদর্শিগণ কেহ স্পষ্টভাষায় কেহ বা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইউরোপীয়দর্শন, ভারতীয়দর্শন হইতে সংগৃহীত। ইহা সম্ভবপর বটে। কারণ, গ্রীসদেশই ইউরোপীয় দর্শনের ও সভ্যতার আদি বিকাশস্থান। গ্রীসদেশ হইতেই ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হয়। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের মতভেদ নাই। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের মত অন্যরূপ হইলেও, গ্রীসীয়দিগের মতে—মিশরদেশ বা ইজিপ্টে প্রথম সভ্যতার উৎপত্তি হয়। গ্রীসীয় মনীষিগণ উহা স্বদেশে লইয়া যান বা মিশরীয়গণ গ্রীসে যাইয়া বসবাস করায় গ্রীসদেশেও সভ্যতার বিকাশ হয়। গ্রীসীয় সভ্-

প্রথম দার্শনিক পিথাগোরস্ মিশরদেশে শিক্ষালাভ করেন। তিনি মিশরদেশে শিক্ষিত হইয়া এশিয়াখণ্ডের নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে প্রতিগমন করেন এবং ইটালীর ক্রতনা-নগরীতে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার দর্শনে জন্মান্তর অঙ্গীকৃত ও আমিষভোজন পাপজনক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্লেটো ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দার্শনিক এবং প্লেটোর দর্শন ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দর্শন। ইনিও ইজিপ্টে বহুদিন বাস করিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি পরলোক মানিতেন এবং একেশ্বরবাদী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি ইজিপ্টেই একেশ্বরবাদ অবগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বকালে ইজিপ্টই ইউরোপীয়দিগের উচ্চশিক্ষার স্থান ছিল। অন্ততঃ নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যয়ন না করিলে যেমন বঙ্গদেশীয়দিগের শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত না, সেইরূপ ইজিপ্টে অধ্যয়ন না করিলে ইউরোপীয়দিগের শিক্ষাও উচ্চতা প্রাপ্ত হইত না। তাৎকালিক ইউরোপীয়দিগের পক্ষে মিশরদেশ নবদ্বীপ ছিল, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিশরদেশের সংস্কৃত নাম—'মিশ্রদেশ'। কথিত আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মিশ্রদেশ অতি উচ্চশ্রেণীর বাণিজ্যস্থান ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ বাণিজ্যোপলক্ষে তথায় যাইতেন এবং সাময়িক বাস করিতেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দেশীয় লোকসকল তথায় মিশ্রিত হইতেন বলিয়া উহার নাম 'মিশ্রদেশ' হইয়াছিল। আর্য্যগণ সভ্য। অমরসিংহের মতে—মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু, এই কয়টি শব্দ একার্থবোধক (১)। আর্য্যগণকর্ত্তৃক মিশরদেশে সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হয়। অতি পূর্ব্বকালের ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এশিয়াখণ্ড প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের পরিজ্ঞাত দেশসকলের মধ্যে মিশরদেশে তাঁহারা প্রথম সভ্যতা দেখিয়াছিলেন বলিয়া, সম্ভবতঃ তাহাকেই সভ্যতার আদিজন্মভূমিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিথাগোরসের সময় এশিয়া-খণ্ডের অনেক দেশ পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি মিশরে শিক্ষা-সমাপন করিয়া সবিশেষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য এশিয়াখণ্ডের অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি (পিথাগোরস) সভ্যদেশে (মিশর-

(১) 'মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ।' ব্রহ্মবর্গ ২

দেশে) অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া অসভ্যদেশে (এশিয়াখণ্ডে) পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা অপেক্ষা, তিনি সভ্যদেশে অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া সভ্যতর দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন,—এইরূপ কল্পনা সমধিক সঙ্গত। সে যাহা হউক, ইউরোপীয় মনীষিগণ যে-ভারতীয়দর্শনে সমধিক আস্থাবান্ ও ভক্তিমান্, যে-ভারতীয়দর্শন বুদ্ধির নির্ম্মলতা-সম্পাদনের উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের লীলাক্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুভয়রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ, যে ভারতসন্তান সেই ভারতীয়দর্শনের অনুশীলনের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে বিচারমূঢ় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। দর্শনশাস্ত্রকে দূর হইতে ব্যাঘ্ররূপে কল্পনা করিয়া ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। সাহসপূর্ব্বক নিকটে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, উহা ব্যাঘ্র নহে, বিচিত্রবর্ণশোভিত সুরভি। উহা হইতে তীক্ষ্ণনখদংষ্ট্রাঘাতের ভয় নাই, যত্নপূর্ব্বক উহাকে দোহন করিলে পুষ্টিকর সুমধুর ক্ষীর পাওয়া যাইবে।

'আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।'

যাহাকে অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অগ্নি নহে, স্পর্শযোগ্য রত্ন।
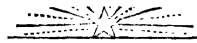
দ্বিতীয় লেক্‌চর।

নামকরণপ্রণালী।

দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দর্শনশাস্ত্র কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে 'দর্শন' এই সংজ্ঞা বা নাম হইতে কতদূর সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। দৃশ্‌ধাতু ও ল্যুট্, যুট্ বা অনট্ প্রত্যয়ের যোগে দর্শনশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দৃশ্‌ধাতুর অর্থ জানিতে না পারিলে দর্শন-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জানা যায় না। ধাতুর অর্থ জানিতে হইলে প্রথমেই ধাতুপাঠের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ধাতুপাঠে দৃশ্‌ধাতু প্রেক্ষণ অর্থে পঠিত হইয়াছে। প্র উপসর্গ পূর্ব্ব ঈক্ষ্‌ধাতু হইতে 'প্রেক্ষণ'শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ঈক্ষ্‌ধাতুর অর্থ না জানিলে দৃশ্‌ধাতুর অর্থ জানিতে পারা যায় না। ধাতুপাঠে ঈক্ষ্‌ধাতু দর্শনার্থে পঠিত। সুতরাং ধাতুপাঠের সাহায্যে দৃশ্‌ধাতু এবং ঈক্ষ্‌ধাতুর অর্থ অবগত হইবার প্রত্যাশা বিফল হইল। কেন না, ধাতুপাঠ অনুসারে দৃশ্‌ধাতুর অর্থ প্রেক্ষণ এবং ঈক্ষ্‌-ধাতুর অর্থ দর্শন। এখন উপায়ান্তর-অবলম্বনে দৃশ্‌ধাতুর অর্থ স্থির করিতে হইবে।

উপায়ান্তরের সাহায্যে অর্থনির্ণয় করিতে হইলে প্রয়োগানুসারে অর্থ-নির্ণয় করা উৎকৃষ্টকল্প। প্রাকৃতভাষায় দৃশ্‌ধাতুর স্থানে "পেক্‌খ" আদেশ হয়। বিদ্যাপতির 'পেখনু' এবং বাঙ্গালাভাষায় 'দেখ'শব্দ প্রাকৃত 'পেক্‌খ'শব্দের অপভ্রংশমাত্র। চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষস্থলে সচরাচর 'দেখ' বলা হইয়া থাকে। সংস্কৃতভাষাতেও চাক্ষুষজ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ দৃশ্‌ধাতু প্রযুক্ত হয়। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন যে, চাক্ষুষ-জ্ঞানই দৃশ্‌ধাতুর মুখ্য অর্থ। দৃশ্‌ধাতুর অর্থ চাক্ষুষজ্ঞান, ইহা নৈয়ায়িকেরাও স্বীকার করেন। উহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য

চাক্ষুষজ্ঞানসাধন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নাম দর্শনেন্দ্রিয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন, শাস্ত্র চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দর্শনশাস্ত্র সাক্ষাৎ না হউক, পরম্পরা আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বটে। কেন না দর্শনশাস্ত্র আত্মমননের উপায়। আত্মমনন যোগরূপে পরিণত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সত্য বটে, আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ কি মানস, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু উপনিষদে অনেকস্থলে আত্মসাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ্‌ধাতু এবং ঈক্ষ্‌ধাতু প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষজ্ঞানস্বরূপ, এরূপ বলিলেও কোন বাধা হইতে পারে না। যদিও রূপবদ্বহির্দ্রব্যই চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, তথাপি লৌকিক প্রত্যক্ষস্থলেই তথাবিধ নিয়ম, আত্মার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, অলৌকিক—যোগজধর্ম্মজন্য। যে যোগজ ধর্ম্ম দ্বারা অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ বস্তুরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যে যোগজধর্ম্মবলে ভাগীরথী ও সমুদ্র পরিপীত, দণ্ডকরাজ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, সেই যোগজ ধর্ম্ম দ্বারা আত্মার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিশ্বরূপদর্শনকালে ভগবদিচ্ছায় অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তদ্দ্বারা চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য বিষয়সকলও তিনি দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস যোগপ্রভাবে সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি হস্তিনারাজধানীতে অবস্থিত থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রসংগ্রামের সমস্ত বিষয় স্বয়ং দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যথাযথ বিবৃত করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ যোগজধর্ম্মের প্রভাব অচিন্তনীয়, সন্দেহ নাই। রশ্মিবিশেষের সাহায্যে ব্যবহিত বস্তুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও এখন স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং কারণান্তরপ্রভাবে সচরাচর পরিদৃষ্ট লৌকিক নিয়মের স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষজ্ঞানস্বরূপ না হইলেও বেদে আত্মসাক্ষাৎকার অর্থে দৃশ্‌ধাতুর প্রচুর প্রয়োগ থাকায় আত্মসাক্ষাৎকারও দৃশ্‌ধাতুর অর্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং যে শাস্ত্র আত্মসাক্ষাৎকারের

সাধন, তাহাকে অনায়াসে দর্শনশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। শ্রবণমননাদিও আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন বলিয়া দর্শনপদবাচ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রবণমননাদি শাস্ত্র নহে, সুতরাং দর্শনশাস্ত্র বলিলে শ্রবণমননাদিকে না বুঝাইয়া শাস্ত্রবিশেষকেই বুঝাইবে। অল্পকথায় ব্যবহার সম্পাদন করিবার জন্য সমস্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত না হইয়া অনেকসময় সংজ্ঞার একদেশমাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই একদেশদ্বারা সমুদায়ের কার্য্য সম্পন্ন হয়। যেমন ভীমসেনকে ভীম, রামচন্দ্রকে রাম সত্যভামাকে সত্যা বা ভামা বলা হয়, সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রকেও দর্শন বলা হইয়া থাকে। এমন কি, সংক্ষেপের জন্য নামের একটি অক্ষরদ্বারাও সমুদায়ের ব্যবহার শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন নাই, দুই-একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রেতপক্ষের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া, কোজাগরপূর্ণিমার পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া, চৈত্রাবলীর পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া এবং চাতুর্মাস্যব্রতের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া—এই চারিটি দ্বিতীয়া "প্রে কো চৈ চা"—এই চারিটি আদ্য অক্ষরদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমা, এই চারিটি পূর্ণিমা "আ কা মা বৈ"—এই চারিটি আদ্য অক্ষরদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার লোকেও দেখা যায়, চিঠার তঃ পূঃ ইত্যাদি লিপি তাহার উদাহরণ।

পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অর্থের সাদৃশ্য অনুসারেও সংজ্ঞার প্রবৃত্তি হয়। এই মতে দর্শনশাস্ত্র সংজ্ঞাটি সাদৃশ্য লইয়া হইয়াছে, ইহা বলিলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। প্রত্যক্ষ ষড়্‌বিধ হইলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সমধিক পরিস্ফুট এবং অধিকাংশ স্থলে নিঃসংশয় হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্রে এরূপ দৃঢ়তর ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা পদার্থসকল প্রতিপাদিত হয় যে, তাহা চাক্ষুষজ্ঞানগোচর পদার্থের ন্যায় পরিস্ফুট ও নিঃসংশয়। সুতরাং যে শাস্ত্র চাক্ষুষজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞানের সাধন, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। লক্ষিত পদার্থ উপপন্ন হয় কি না, প্রমাণদ্বারা তাহার অবধারণ করা দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রধান বিষয়। দার্শনিকেরা বস্তুর উপলব্ধিমাত্রে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। বস্তুর তত্ত্ব-নিরূপণ এবং উপলব্ধির সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই

প্রক্রিয়া পরীক্ষাশব্দে অভিহিত হয়। পরি-উপসর্গ-পূর্ব্বক ঈক্ষ-ধাতু হইতে পরীক্ষাশব্দ ব্যুৎপাদিত। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঈক্ষধাতু ও দৃশ্‌ধাতু একার্থক। সুতরাং পরীক্ষাশব্দ ও দর্শনশব্দ তুল্যার্থক বলিলে অসঙ্গত হইবে না। অতএব পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দর্শননাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

আর এক কথা। শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারেই যে, সকল বস্তুর নাম হইবে, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ নহে। এ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতভেদ আছে। যাঁহারা ব্যুৎপত্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মতেও ব্যুৎপত্তি অনুসারে সর্ব্বস্থলে বস্তুর নামকরণ হয় না। ব্যুৎপত্তির যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ অনুসারেও নামকরণ হইয়া থাকে। এবং স্থলবিশেষে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হয়। ইহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

নৈয়ায়িক আচার্য্যদিগের মতে নাম চতুর্ব্বিধ:—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, ও যৌগিকরূঢ় বা রূঢ়যৌগিক। এতদ্ভিন্ন লক্ষক নামে আর এক প্রকার নাম আছে। যোগ কিনা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বা অবয়বার্থ অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থ অনুসারে যে নাম হয়, তাহাকে যৌগিক বলে। যেমন, পাচক প্রভৃতি। পচ্‌ধাতু ও ণ্যণ্, ণ্বুল্ বা অকণ্ প্রত্যয়ের যোগে পাচকশব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। পচ্‌ধাতুর অর্থ পাক, প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা। অতএব পাচকশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—পাককর্ত্তা। লোকেও পাক-কর্ত্তাকেই পাচক বলে। সুতরাং, যে পাক করে, তাহার পাচক নামটি যৌগিক। সঙ্কেতযুক্ত নামকে রূঢ় বলে। যে নাম প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুদায়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া সমুদায়ের অর্থ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে, তাহাকে সঙ্কেতযুক্ত ও রূঢ় বলে। যেমন, গো প্রভৃতি শব্দ। গম্‌ধাতু ও ডোস্ প্রত্যয়ের যোগে গোশব্দ সাধিত হইয়াছে। গম্‌ধাতুর অর্থ গতি বা গমন, ডোস্‌প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা। সুতরাং গোশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইল গমনকর্ত্তা। এই অর্থ অনুসারে গোশব্দের প্রয়োগ হয় না। কারণ, তাহা হইলে গমনকর্ত্তা মনুষ্যাদিতেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে এবং শয়ন ও উপবেশনের অবস্থায় গরুকে যে

অবস্থায় গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোপশুতেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

এই দুইটি দোষের যথাক্রমে দার্শনিক নাম অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিশব্দের অর্থ সম্বন্ধ। অতিব্যাপ্তি—অতিশয় সম্বন্ধ বা অতিরিক্ত সম্বন্ধ। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, অন্যের সহিত সম্বন্ধ হইলে অতিব্যাপ্তিদোষ হয়। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া বলাতে, এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সম্বন্ধযোগ্য স্থলে আদৌ সম্বন্ধ থাকিবে না। সম্বন্ধযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ থাকিয়াও সম্বন্ধের অযোগ্য স্থলেও যদি সম্বন্ধ হয়, তবেই অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটে। উক্ত স্থলে ব্যুৎপত্তি অনুসারে গমনশীল গোপশুতে গোশব্দের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা নাই, অথচ গমনশীল মনুষ্যাদিতেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। গমনশীল মনুষ্যাদি গোশব্দের সম্বন্ধের যোগ্যস্থল নহে। এই অযোগ্যস্থলে সম্বন্ধ হইতেছে বলিয়া, অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে। অব্যাপ্তি অসম্বন্ধ। কোন অর্থের সহিতই শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং যে স্থলে সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে স্থলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। যেমন শয়ান বা উপবিষ্ট গোপশুও গো বটে, তদবস্থাতেও তাহার সহিত গো-শব্দের সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিন্তু গোশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে শয়নাদি অবস্থায় গোপশুর সহিত গোশব্দের সম্বন্ধ থাকিতে পারিতেছে না। এইজন্য অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে। গোশব্দ যৌগিক বলিলে উক্তরূপ অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং গোশব্দ যৌগিক নহে, রূঢ়।

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যন্ত বুঝায় বটে, কিন্তু সকল প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যন্ত বুঝায় না। সাধারণতঃ ক্রিয়া-কর্ত্তাকেই বুঝাইয়া থাকে। এস্থলেও ডোস্‌প্রত্যয়ের অর্থ ক্রিয়াকর্ত্তা। সুতরাং অব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে। ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যন্তই ডোস্‌-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মানিয়া লইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন পাচক ব্যক্তি যে সময়ে পাক করে না, সে সময়েও তাহাকে পাচক বলা হয়। কেন না, তৎকালে পাক না করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা আছে। এইরূপ শয়ান বা উপবিষ্ট গোপশু তৎকালে গমন না করিলেও

গমন করিবার যোগ্যতা তাহার রহিয়াছে বলিয়া শয়নাদিকালেও গো-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সুতরাং গোশব্দ যৌগিক হইলেও অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তিদোষের পরিহার করিতে পারিলেও কিছুতেই অতিব্যাপ্তিদোষের পরিহার হইতে পারে না, সুতরাং গোশব্দ রূঢ়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গমনকর্ত্তা এই অবয়বার্থ (গম্‌ধাতু ও ডোস্‌প্রত্যয়ের অর্থ) গোশব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত মাত্র, প্রবৃত্তিনিমিত্ত নহে। গোশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত গোত্ব-জাতি। যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব্দ ব্যুৎপন্ন হয় বা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত, এবং যে অর্থ অবলম্বনে শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলে (১)। অতএব গোত্বজাতি বা গোত্বজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গোশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া ঐ অর্থে গোশব্দের সঙ্কেত অঙ্গীকার করিতে হইতেছে। ঐ সঙ্কেত গো—এই বর্ণাবলীগত গোশব্দের ঘটক গম্‌ধাতু বা ডোস্‌-প্রত্যয়গত নহে। পাচকশব্দ যৌগিক, রূঢ় নহে। কারণ, পাচক—এই বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই, অবয়বসঙ্কেত অর্থাৎ পচ্‌ধাতু ও বুণ্‌প্রত্যয়ের সঙ্কেতদ্বারাই পাককর্ত্তারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। সমুদায়ের সঙ্কেত স্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। এইজন্য পাচক-শব্দ রূঢ় নহে, যৌগিক।

সঙ্কেত দুইপ্রকার:—আজানিক ও আধুনিক। যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে—যাহা নিত্য, তাহা আজানিক এবং যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক। আজানিক সঙ্কেতের অপর নাম শক্তি, আধুনিক সঙ্কেতের অপর নাম পরিভাষা। গো-গবয়াদি পদের সঙ্কেত আজানিক এবং চৈত্র-মৈত্রাদি পদের সঙ্কেত আধুনিক। আজানিক সঙ্কেত বা শক্তি অনুসারে যে শব্দ

(১) শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত ও প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক অর্থে ব্যুৎপন্ন হইয়া অন্য অর্থে শব্দ প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যেরা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। ইহার শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে বিরত রহিলাম।

যে অর্থ প্রতিপাদন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা অনুসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল প্রয়োগ হয় না, হইতে পারে না। কেন না, আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরিভাষাসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পারিভাষিক অর্থবোধ একান্ত অসম্ভব। মনে করুন, একজন ব্যাকরণাচার্য্য শ্রদ্ধা, অগ্নি, নদী, বৃদ্ধি প্রভৃতি শব্দ, বিশেষ বিশেষ বর্ণের সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ পরিভাষা করিবার পর হইতে শ্রদ্ধাদিশব্দ বিশেষ বিশেষ বর্ণের বোধক হইতেছে বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কখনই তাহা হইত না। এবং পারিভাষিক শব্দ সাধারণে প্রযুক্ত হয় না। অতএব শ্রদ্ধাদিশব্দের বর্ণবিশেষে সঙ্কেত আজানিক নহে, আধুনিক।

রূঢ়শব্দের বিষয় আর অধিক না বলিয়া এখন সংক্ষেপে যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ় শব্দের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। যে শব্দের অবয়বার্থ ও সমুদায়ার্থ পরস্পর অন্বিত হয়, তাহার নাম যোগরূঢ়। যেমন পঙ্কজাদি শব্দ। যাহা পঙ্কে জন্মে, তাহা পঙ্কজশব্দের অবয়বার্থ। কুমুদাদিও পঙ্কজাত, অবয়বার্থ অনুসারে কুমুদাদিতেও পঙ্কজশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, সচরাচর কিন্তু পঙ্কজাত পদ্মেই পঙ্কজশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইজন্য পদ্ম পঙ্কজশব্দের সমুদায়ার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যোগরূঢ় স্থলে অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ পরস্পর অন্বিত হয় বলিয়াই কেবল অবয়বার্থ অবলম্বনে কুমুদাদিতে বা কেবল সমুদায়ার্থ অবলম্বনে স্থলপদ্মে পঙ্কজশব্দের প্রয়োগ হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ন্যায়াচার্য্যদিগের মত বিবৃত হইতেছে। মীমাংসাচার্য্যদিগের মতে অবয়বার্থ ও সমুদায়ার্থ পরস্পর অন্বিত হইলেও স্থলবিশেষে কেবল অবয়বার্থ অনুসারে কুমুদাদিতে এবং কেবল সমুদায়ার্থ অনুসারে স্থলপদ্মেও কখন-কখন পঙ্কজশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যুক্তির বৈলক্ষণ্য থাকিলেও কোন কোন ন্যায়াচার্য্য এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। অনাবশ্যকবোধে তাঁহাদের যুক্তি প্রদর্শিত হইল না।

যে শব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ কখন পরস্পর অন্বিত হয় না, পৃথক্ পৃথক্ রূপেই প্রতীত হয়, তাহার নাম যৌগিকরূঢ় বা রূঢ়যৌগিক।

যেমন মণ্ডপশব্দ। মণ্ডপশব্দ কোনস্থলে অবয়বশক্তি দ্বারা মণ্ডপানকর্তাকে, কোনস্থলে সমুদায়শক্তি দ্বারা গৃহবিশেষকে (মণ্ডপ—ঘর) বুঝায়। কোন-স্থলেই অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থের পরস্পর অন্বয় হয় না, হইতে পারে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়াচার্য্যদিগের মতে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে সমস্ত নাম হয় না। কেবল যৌগিক নামগুলি ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অনুসরণ করে, রূঢ়যৌগিক নাম কোন অর্থে ব্যুৎপত্তির অনুসরণ করে, কোন অর্থে করে না। যোগরূঢ় নাম ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ও সমুদায়ের অর্থ, উভয়েরই অনুসরণ করে। রূঢ় নাম একেবারেই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অনুসরণ করে না। সুতরাং দর্শনশব্দ যোগরূঢ় বা কেবল রূঢ় বলিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।

সমস্ত নাম ব্যুৎপন্ন অর্থাৎ ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে কি না, এ বিষয়েও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতভেদ আছে। বৈয়াকরণাচার্য্য শাকটায়ন এবং অধিকাংশ নিরুক্তাচার্য্যদিগের মতে সমস্ত নাম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নিরুক্তাচার্য্য গার্গ্য এবং কোন কোন বৈয়াকরণাচার্য্য-দিগের মতে যৌগিক নামগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত নাম রূঢ়শব্দ অর্থাৎ ধাতুর ন্যায় স্বতঃপ্রসিদ্ধ, প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে সম্ভূত নহে। সুতরাং তাঁহাদের মতে যৌগিকনাম ভিন্ন অপরাপর নামের অবয়বার্থ আদৌ নাই। ধাতুসকল ক্রিয়াবাচী। সমস্ত নাম ধাতুজ হইলে, সর্ব্বত্র ধাতুপ্রতিপাদ্যক্রিয়াযোগে বস্তু অভিহিত হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু একান্ত অসম্ভব। কারণ, বস্তুর নামসকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, প্রত্যক্ষক্রিয়, প্রকল্প্যক্রিয় ও অবিদ্যমানক্রিয়। যে স্থলে নাম-ঘটক প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থ অভিধেয়বস্তুতে সঙ্গত হয়, অর্থাৎ নামের অবয়বার্থ অনুসারে বস্তুর নামকরণ হইয়াছে; আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অভিধেয়বস্তুগত কোন ক্রিয়া অবলম্বনে যে নাম প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষক্রিয়। কারক, হারক প্রভৃতি নাম প্রত্যক্ষক্রিয়। কেন না, কারকাদিনামের অভিধেয়বস্তু—করিতেছে, হরিতেছে বা করণ ও হরণ ক্রিয়াযুক্ত, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং কারকাদি নাম প্রত্যক্ষ-ক্রিয়। গো-অশ্ব প্রভৃতি নাম প্রকল্প্যক্রিয়। কারণ, অবস্থাবিশেষে গবাদিতে ক্রিয়া প্রত্যক্ষ না হইলেও, ধাতুর অর্থ অনুসারে ক্রিয়া কল্পনা করা

যাইতে পারে। কিন্তু ডিথ-ডবিথ প্রভৃতি নামে ক্রিয়া কল্পনা করাও চলে না। কেন না, ডিথ-ডবিথ প্রভৃতি যদৃচ্ছাশব্দ, উহার মূলীভূত কোন ধাতু নাই যে, তদনুসারে ক্রিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। সুতরাং ডিথ-ডবিথাদি নাম অবিদ্যমানক্রিয়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রত্যক্ষক্রিয় নামগুলি ধাত্বর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত, সুতরাং ধাতুজাত। প্রকল্প্যক্রিয় নাম ধাত্বর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত নহে, সুতরাং ধাতুজাতও নহে। গবাদিশব্দ ধাতু-যোগে উৎপন্ন হইলেও, ধাতুর অর্থ অবলম্বনে অভিধেয়বস্তুর প্রতিপাদন করে না বলিয়া বস্তুর নামকরণ ধাতুজ নহে। অর্থাৎ গবাদিশব্দঘটক গমাদিধাতুপ্রতিপাদ্য গমনাদিক্রিয়া অনুসারে গবাদিবস্তুর গবাদিনাম হয় নাই, সুতরাং গবাদিনাম ধাতুর অর্থ অনুসরণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় না। এইজন্য গবাদিনাম ধাতুজ বলা যাইতে পারে না। কেন না, শব্দটি ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও, নামকরণবিষয়ে ধাতুর কিছুমাত্র আনুকূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই। প্রকল্প্যক্রিয় নামের সম্বন্ধে যাহাই হউক, অবিদ্যমান-ক্রিয় নামগুলি যে ধাতুজ নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচীন নিরুক্তাচার্য্য গার্গ্য কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া, সমস্ত নাম ধাতুজ, শাকটায়নাদির এই মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। গার্গ্য বলেন যে, নামঘটকধাতুবাচ্য ক্রিয়া অনুসারে অথবা অভিধেয়বস্তু-গত ক্রিয়া বা ধর্ম্মানুসারে বস্তুর নামকরণ হইলে দুইটি দোষ হয়। প্রথম, অনেক বস্তুতে এক ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া অনেক বস্তুর এক নাম হইতে পারে। দ্বিতীয়, এক বস্তুতে অনেক ক্রিয়া বা ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বলিয়া এক বস্তুর অনেক নাম হইতে পারে। অর্থাৎ নামঘটক-ধাতুবাচ্য যে ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে বস্তুর যে নাম হইয়াছে, সেই বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুতেও সেই ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকা হেতু ঐ অন্য বস্তুরও সেই নাম হইতে পারে, এবং অভিধেয়বস্তুতে কেবল একটিমাত্র ক্রিয়া বা ধর্ম্ম থাকে না, প্রত্যেক বস্তুতে অনেকগুলি ক্রিয়া বা ধর্ম্ম থাকে, তাহার মধ্যে একটি ক্রিয়া বা ধর্ম্ম লইয়া যেমন একটি নাম হইয়াছে, তেমনি অপরাপর ক্রিয়া বা ধর্ম্ম লইয়া অপরাপর নামও হইতে পারে।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়দুইটি বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা

যাউক। ঘোটকের একটি নাম অশ্ব। ব্যাপ্ত্যর্থ অশ্‌ধাতু হইতে অশ্বশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে অশ্‌ধাতুর পার্য্যন্তিক অর্থ হইতেছে অধ্বব্যাপ্তি অর্থাৎ পথের সহিত সম্বন্ধ। ঘোটকে অধ্বব্যাপ্তি আছে, এইজন্য ঘোটকের নাম অশ্ব। এখন দেখিতে হইবে যে, অধ্বব্যাপ্তি অশ্বনামের কারণ হইলে, ঘোটক ভিন্ন অপর যে যে বস্তুর অধ্বব্যাপ্তি আছে, ঘোটকের ন্যায় সেই সেই বস্তুরও অশ্বনাম হইতে পারে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একপ্রকার উদ্ভিদের একটি নাম তৃণ। হিংসার্থ তৃদ্‌ধাতু হইতে তৃণশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ উদ্ভিদ পশুগণ ভক্ষণ করে, সুতরাং হিংসিত হয়। এইজন্য উহার নাম তৃণ। হিংসিত হওয়া তৃণনামের কারণ হইলে, যে কেহ হিংসিত হয়, সে সকলেরই তৃণনাম হইতে পারে। ধাতুবাচ্য-ক্রিয়ানুসারে বস্তুর নামকরণ হইলে কিরূপে অনেক বস্তুর এক নাম হইতে পারে, তাহা দেখান হইল। এখন কিরূপে এক বস্তুর অনেক নাম হইতে পারে, তাহা দেখান যাইতেছে। স্তম্ভের বা থামের একটি নাম স্থূণা। অভিধেয়বস্তুগত ক্রিয়া বা ধর্ম্ম অনুসারে বস্তুর নামকরণ হইলে স্থূণাতে যতগুলি ক্রিয়া বা ধর্ম্ম আছে, সে সমস্ত ক্রিয়া বা ধর্ম্ম লইয়া স্থূণার অনেকগুলি নাম হইতে পারে। যেমন স্থূণা, দর বা গর্ত্তে শয়ন করে অর্থাৎ থাকে বলিয়া 'দরশয়া'শব্দও স্থূণার নাম হইতে পারে। এবং স্থূণাতে তিরশ্চীন বংশ বা পাড় সজ্জিত হয় বলিয়া 'সঞ্জনী'শব্দও স্থূণার নাম হইতে পারে। কেন না, বস্তুগত একটি ক্রিয়া বা ধর্ম্ম লইয়াই বস্তুর নাম হইবে, অপর ক্রিয়া বা ধর্ম্ম লইয়া হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই।

গার্গ্যের উদ্ভাবিত তৃতীয় আপত্তি এই যে, বস্তুগত ক্রিয়া অনুসারে বস্তুর নামকরণ হইলে যে যে শব্দ দ্বারা সেই ক্রিয়ার প্রতিপাদন হইতে পারে, তৎসমস্তই সেই বস্তুর নাম হইতে পারে। এস্থলেও উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতেছে। পুরে অর্থাৎ শরীরে শয়ন করেন অর্থাৎ শরীরের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ। পুরশব্দ ও শয়নার্থ শীধাতুর যোগে পুরুষশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুরশয়নপ্রতিপাদক পুরুষশব্দ যেমন আত্মার নাম, তেমনি 'পুরিশয়'শব্দও আত্মার নাম হইতে পারে। কেন না, 'পুরিশয়'শব্দও পুরশয়ন প্রতিপাদন করে। এইরূপ 'অষ্টা'শব্দ অশ্বের নাম হইতে পারে। কারণ, অষ্টাশব্দও ব্যাপ্ত্যর্থ অশ্‌ধাতু হইতে উৎপন্ন। এবং

তৃণশব্দের ন্যায় তর্দনশব্দও হিংসার্থ তৃদ্‌ধাতু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তৃণ-শব্দের মত তর্দনশব্দও তৃণসংজ্ঞক উদ্ভিদের নাম হইতে পারে। এক বস্তুতে অনেক ক্রিয়া থাকে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া অনুসারে এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইতে পারে, ইহা দ্বিতীয় আপত্তির বিষয়। এক ক্রিয়ার প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক বস্তুর নাম হইতে পারে, ইহাই তৃতীয় আপত্তি। অর্থাৎ অনেক ক্রিয়া অনুসারে অনেক নামের আপত্তি এবং এক ক্রিয়া অনুসারে অনেক নামের আপত্তি যথাক্রমে গার্গ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তি।

গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি এই—বস্তুর নিষ্পন্ন নাম লইয়া শাকটায়ন প্রভৃতি বিচার করেন যে, এই নামটি কোন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং নামের কি অর্থ হইতে পারে। গার্গ্য বলেন, এ বিচার অনর্থক। কারণ যে নাম নিষ্পন্ন বা প্রসিদ্ধ আছে, তাহার ধাতু-অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। যে বস্তুর যে নাম প্রসিদ্ধ আছে, সেই বস্তুই সেই নামের অর্থ, সুতরাং ধাতুর অর্থ অনুসারে নামের অর্থ করিবার চেষ্টাও বৃথাচেষ্টা বা পণ্ডপরিশ্রম মাত্র। উহা সঙ্গতও হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শাকটায়ন প্রভৃতি বলেন যে, প্রথনাৎ পৃথিবী। প্রথনের সম্বন্ধাধীন পৃথিবী। ভূমি প্রথিত অর্থাৎ বিস্তারিত বলিয়া ভূমির নাম পৃথিবী। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাকটায়নাদির মতে ভূমি স্বভাবতঃ প্রথিতা নহে। কোন সময়ে অপ্রথিতা ছিল, পরে প্রথিতা হইয়াছে। এস্থলে গার্গ্য উপহাসচ্ছলে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, কে ইহাকে প্রথিত করিয়াছে? অর্থাৎ কে অপৃথিবীকে পৃথিবী করিয়াছে? এবং প্রথনকর্ত্তা কোন্ আধারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রথনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন? প্রথনক্রিয়ার কর্ত্তা ও তাহার আধার উভয়ই অসম্ভব। সুতরাং প্রথনক্রিয়া অলীক। এইজন্য সমস্ত নাম ধাতুজ, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

গার্গ্যের উদ্ভাবিত পঞ্চম আপত্তি বা দোষ। সমস্ত নাম ধাতুজ, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শাকটায়ন বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। স্থলবিশেষে নামের ধাতুজত্ব রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া অতি অদ্ভুত ও উপহাসাস্পদ উপায়ের আবিষ্কার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার উদাহরণস্বরূপে সত্যশব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাকটায়ন অনন্যোপায় হইয়া 'সত্য'পদকে সৎ ও য—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পদ

হইতে বর্ণ বা অক্ষর গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ভাগদ্বয়ের সংস্কার করিয়া সত্যশব্দের ধাতুজত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যমানার্থ অস্‌ধাতু হইতে অস্তিপদ সম্পন্ন হয়। এই অস্তিপদ হইতে অকার, সকার ও তকার গ্রহণ করিয়াছেন। অস্তিপদে অকারের পর সকার আছে। কিন্তু শাকটায়ন বর্ণবিপর্য্যয়প্রণালী অনুসারে সকারের পরে অকার স্থাপন করিয়া সত্য-শব্দের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ সৎ এই অংশের সংস্কার করিয়াছেন। এবং জ্ঞানার্থ ইণ্‌ধাতুর কারিতান্ত অর্থাৎ ণ্যন্তরূপ আয়য়তি এই রূপ হইতে যকার গ্রহণ করিয়া সত্যশব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অর্থাৎ য এই অংশের সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছেন। এইরূপে সৎ+য এই দুই অর্দ্ধ সংস্কৃত হইলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সৎ এই তকার যকারের সহিত মিলিত হইয়া যকারের উপরিভাগে স্থিত হইবে। এই প্রক্রিয়া অনুসারে সত্যপদের সংস্কার সমাধান করা হইয়াছে। এই সংস্কার বা ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা বিদ্যমান অর্থের অর্থাৎ যথার্থ অর্থের জ্ঞান জন্মায়, তাহাই সত্য। একটি পদকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া উক্তরূপে ধাতুজত্ব রক্ষা করিতে কোন পূর্ব্বাচার্য্যই প্রয়াস করেন নাই। কিন্তু ঐরূপ না করিলে শাকটায়নের প্রতিজ্ঞারক্ষা হয় না। তাই শাকটায়ন ঐরূপ অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের সত্যপ্রতিজ্ঞত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গার্গ্যের ষষ্ঠ আপত্তি। অভিজ্ঞ আচার্য্যেরা বলেন যে, অগ্রে বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎপরে তাহার ক্রিয়া হইয়া থাকে। কেন না, ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত। আশ্রয় বা অবলম্বন ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং শাকটায়নের মতে উত্তরকালভাবী ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বোৎপন্ন বস্তুর নামকরণ হয়, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাহা কিন্তু হইতে পারে না। কারণ, বস্তুর নাম বস্তুর সহভূত। উত্তরকালভাবী ক্রিয়া অপেক্ষা না করিয়া নামের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেন না, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। শব্দ অর্থের এবং অর্থ শব্দের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়া থাকে না, থাকিতে পারে না। ঐরূপ থাকিতে পারিলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইতে পারে না—অনিত্য হইয়া উঠে। শাকটায়নের মতে কিন্তু তাহাই হইতেছে। কেন না, বস্তু উৎপন্ন হইলে পরে তাহার ক্রিয়া হইবে। ক্রিয়া

হইলে তবে ঐ ক্রিয়া অনুসারে বস্তুর নাম হইবে। সুতরাং বস্তুর ক্রিয়ার উৎপত্তির পরে বস্তুর সহিত নামের সম্বন্ধ হইতেছে। ক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্রিয়ানুসারী নামের সম্বন্ধ হওয়া একান্ত অসম্ভব। অর্থাৎ বস্তুগত ক্রিয়ার উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে উৎপন্ন বস্তুর কোনও নাম ছিল না— শাকটায়ন ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহা অতীব হাস্যাস্পদ। অতএব সমস্ত নাম ক্রিয়াসাপেক্ষ নহে, ক্রিয়ানিরপেক্ষ।

নিরুক্তাচার্য্য যাস্ক, আচার্য্য গার্গ্যের পূর্ব্বোক্ত আপত্তিগুলির যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহা একাদিক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। যাস্ক বলেন, বস্তুর ক্রিয়ানুসারে নামকরণ হইলে অনেক বস্তুর এক ক্রিয়া থাকায় অনেকের এক নাম হইতে পারে। গার্গ্যের এই প্রথম আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা তুল্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষেরই নামকরণ হইয়া থাকে, সকলের হয় না। গার্গ্যও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। যেমন তক্ষণ ও পরিব্রজন ক্রিয়া অনেকে করিলেও সূত্রধরের নাম তক্ষা এবং সন্ন্যাসী বা যতির নাম পরিব্রাজক। তক্ষা বা পরিব্রাজক নাম অপরের হয় না। কেন এরূপ হয়, এ প্রশ্ন শাকটায়নের নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করাই উচিত। কেন না, শাকটায়ন ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন নাই, উহা লোকপ্রসিদ্ধ। দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফললাভের জন্য অনেক লোক একজাতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া যথোচিত চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলের অভিলষিত ফললাভ হয় না। কাহারও ফললাভ হয়, কাহারও বা ফললাভ হয় না। সেইরূপ অনেকের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও সেই ক্রিয়া দ্বারা কাহারও নাম হয়, কাহারও নাম হয় না। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ। শব্দের স্বভাব এই যে, কোন ক্রিয়া দ্বারা কোন বস্তুর প্রতিপাদন করে, সকল বস্তুর প্রতিপাদন করে না। গার্গ্যেরও এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না, গার্গ্যের মতে যে সকল নাম ধাতুজ নহে, অর্থাৎ রূঢ়, সেই সকল নাম অর্থবিশেষেই রূঢ় হইল কেন, অর্থান্তরে রূঢ় হইল না কেন,—অশ্বশব্দ ঘোটকেরই নাম হইল, অপর বস্তুর নাম হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গার্গ্যকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে

যে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ বা শব্দের স্বভাব। সুতরাং শাকটায়নের পক্ষে ঐ কথা বলায়, কোনও দোষ হইতে পারে না। যে যে ব্যক্তি অতিশয়রূপে বা নিয়মতঃ তক্ষণ এবং পরিব্রজন করে, তাহাদের নাম তক্ষা ও পরিব্রাজক, ইহা শব্দের স্বভাবসিদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ।

এক বস্তুতে অনেক ক্রিয়ার যোগ থাকায় প্রত্যেক ক্রিয়া অনুসারে নামকরণ হইয়া এক বস্তুর অনেক নাম হইতে পারে,—গার্গ্যের এই দ্বিতীয় আপত্তিও উল্লিখিত প্রকারেই নিরাকৃত হইতেছে। কারণ, এক বস্তুতে অনেক ক্রিয়ার যোগ থাকিলেও কোন একটি ক্রিয়া অনুসারেই তাহার নাম হইয়া থাকে, ইহা শব্দের স্বভাব এবং লোকপ্রসিদ্ধ। তক্ষা ও পরিব্রাজক, তক্ষণ ও পরিব্রজনের ন্যায় অপরাপর ক্রিয়াও করিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল ক্রিয়া লইয়া তাহাদের নাম হয় না, তক্ষণ ও পরিব্রজন ক্রিয়া অনুসারেই নামকরণ হইয়াছে। কেন না, তক্ষা ও পরিব্রাজক শব্দের ন্যায় অপরাপর-ক্রিয়া-প্রতিপাদক শব্দের তাদৃশ স্বভাব ও প্রসিদ্ধি নাই।

গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তিও ইহা দ্বারাই খণ্ডিত হইল। যে ক্রিয়া অনুসারে বস্তুর নাম হয়, যে যে শব্দ দ্বারা সেই ক্রিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে, সে সমস্ত শব্দই সে বস্তুর নাম হউক, বা সে সমস্ত শব্দ দ্বারা সেই বস্তুর নির্দ্দেশ হউক, ইহাই গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি। ইহার উত্তরে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। শব্দের স্বভাব এবং লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে যে বস্তুর যে নাম আছে, পরীক্ষকেরা তাহার পরীক্ষা বা অন্বাখ্যান করেন মাত্র। পরীক্ষকেরা শব্দের প্রযোক্তা নহেন। তাঁহারা লোকপ্রযুক্ত শব্দের বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় পরীক্ষকদিগকে উপালম্ভ বা উপহাস না করিয়া প্রযোক্তাদিগের উপালম্ভ করাই গার্গ্যের উচিত হয়। অথবা, ক্ষমতা থাকিলে প্রযোক্তাদিগের ব্যবহার তিনি নিবারণ করিতে পারেন।

নিষ্পন্ন নাম অবলম্বনে পরীক্ষা বা বিচার করা অন্যায়, ইহা গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি। এই আপত্তিও অসঙ্গত। কারণ, নামের নিষ্পত্তি হইলেই তাহার যোগার্থের পরীক্ষা হইতে পারে। নাম নিষ্পন্ন না হইলে কাহার অর্থ পরীক্ষিত হইবে। বিচারের বিষয় ভিন্ন বিচারপ্রবৃত্তি, প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি আশা করিতে পারেন না। "প্রথনাৎ পৃথিবী" এই শাকটায়নের

মতের প্রতি প্রশ্নচ্ছলে যে কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কেন না, শাকটায়ন বলিতে পারেন, অন্য কেহ প্রথিত না করিলেও, ভূমি পৃথু অর্থাৎ বিপুলায়তন, অতএব তাহার নাম পৃথিবী। পৃথিবীর পৃথুত্ব প্রত্যক্ষদৃষ্ট। ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, শাকটায়নের অভিপ্রায় যথাবৎ অবধারণ করিতে না পারিয়াই গার্গ্য চতুর্থ আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন (১)।

শাকটায়ন পদবিভাগপূর্ব্বক দুইটি ধাতু দ্বারা সত্যশব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ইহা গার্গ্যের মতে দূষণীয়। ইহাই তাঁহার পঞ্চম আপত্তি। এই আপত্তিও সঙ্গত হয় নাই। শাকটায়নের অভিপ্রায়ের অপরিজ্ঞান-নিবন্ধন সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। কেন না, যদি ধাতুদ্বয়ের দ্বারা ব্যুৎপন্ন করিলেও সত্যশব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে শাকটায়ন নিন্দনীয় হইতেন, সন্দেহ নাই। তাহা ত হয় নাই। সত্যশব্দ-প্রতিপাদিত অর্থ, অনুগতার্থ ধাতুদ্বয়ের দ্বারাই শাকটায়ন সংস্কৃত করিয়াছেন। সুতরাং গার্গ্যের পঞ্চম আপত্তি, অশিক্ষিত পুরুষের আপত্তির ন্যায় নিজেরই নিন্দার কারণ হইতেছে। এমন অশিক্ষিত পুরুষ অনেক আছেন, যাঁহারা একধাতুজ নামের ধাতুজত্বও জানেন না। অনেকধাতুজ নামের ত কথাই নাই। যে নামের ক্রিয়া নিতান্ত অভিব্যক্ত, তথাবিধ পাচক, লাবক প্রভৃতি পদসকল কোন্ কোন্ ধাতু হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও জানেন না, ঈদৃশ লোকেরও অভাব নাই। যাহারা শব্দের অর্থ ধাতুদ্বারা অনুগত করিতে পারে না, তাহারাই গর্হণীয়। যাঁহারা এক ধাতু বা অনেক ধাতু দ্বারা শব্দের অর্থ অনুগত করিতে সক্ষম, তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। তাঁহারা কোনক্রমেই গর্হণীয় হইতে পারেন না। পাচক, লাবক প্রভৃতি কতকগুলি নাম প্রকটক্রিয়, অর্থাৎ কোন্ ক্রিয়া অনুসারে ঐ সকল নাম হইয়াছে, তাহা শিক্ষিতমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সত্য প্রভৃতি যে সকল নাম অপ্রতীতার্থ, অর্থাৎ যাহাদের ক্রিয়া সহসা প্রতীত হয় না, প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি বিভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রতীতার্থ করাই পরীক্ষকের কার্য্য। তদ্দ্বারাই ব্যুৎপাদয়িতার পাণ্ডিত্য বা শিক্ষার উৎকর্ষ

(১) স্বপ্রতিষ্ঠ কোনও মহাপুরুষ পৃথিবীকে প্রথিত করিয়াছিলেন, এ কথাও অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

প্রকটিত হয়। আরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, অনেক ধাতু দ্বারা এক পদের নির্বচন বেদানুসারী, উহা শাকটায়নের বুদ্ধিমাত্রোৎপ্রেক্ষিত নহে। সুতরাং অনেক ধাতু দ্বারা এক পদের ব্যুৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া শাকটায়নকে উপহাস করা গার্গ্যের উচিত হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে হৃ-ধাতু, দা-ধাতু ও ইণ্-ধাতু, এই তিনটি ধাতু দ্বারা হৃদয়শব্দ ব্যুৎপাদিত এবং প্রত্যেক অক্ষরের ব্যুৎপত্তিবেত্তার তদনুরূপ ফল কথিত আছে। শতপথব্রাহ্মণের মতে হৃ-ধাতুর হৃ, দা-ধাতুর দ এবং ইণ্‌ধাতুনিষ্পন্ন আয়য়তি-পদের য়—এইরূপে ধাতুত্রয় হইতে অক্ষরত্রয় গ্রহণ করিয়া হৃদয়শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে হৃদয়শব্দের অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরভাবিনী ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বজাত বস্তুর নামকরণ হইলে শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্বসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়—গার্গ্যের এই ষষ্ঠ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, পরভাবিনী ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বজাত বস্তুর ব্যপদেশ বা সংজ্ঞা অনেক-স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্থলে বিল্বাদ ও লম্বচূড়ক শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন না, পরকালীন বিল্বাদনক্রিয়া ও চূড়ালম্বনক্রিয়ার সহিত ভবিষ্যৎ যোগ বা সম্বন্ধ অবলম্বনে পূর্ব্বকালোৎপন্ন বস্তুর নামকরণ দৃষ্ট হইয়াছে। এস্থলে ক্রিয়ার উৎপত্তির পরে বস্তুর নাম হয় নাই। ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বেই তথাবিধ নাম হইয়াছে। "পুরোডাশকপালেন তুষানপনয়তি"—এই শ্রুতিতে ভবিষ্যৎ পুরোডাশের সম্বন্ধ অনুসারে কপালবিশেষ পুরোডাশকপালশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত। উল্লিখিতরূপে গার্গ্যের আপত্তিগুলি নিরাকৃত হওয়াতে, সমস্ত নাম ধাতুজ, শাকটায়নের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ এবং সমর্থিত হইল।

রূঢ়শব্দের ব্যুৎপত্তি অনাবশ্যক, ইহাও অসঙ্গত। কেন না, বেদে রূঢ়-শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘৃতের একটি নাম সর্পিঃ। সর্পিস্-শব্দ ঘৃতে রূঢ়। তথাপি বেদে গমনার্থ সৃপ্-ধাতু হইতে সর্পিস্‌শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। যেহেতু সর্পিত হয়, অতএব ঘৃতের নাম সর্পিঃ। কেন না, ঘৃত ক্ষরিত হইয়া অগ্নিতে হুত হইয়া থাকে। স্বভাবতও ঘৃত সর্পিত বা ক্ষরিত হয়। সুর ও অসুর শব্দ যথাক্রমে দেব ও দেবশত্রুতে

রূঢ়। কিন্তু বেদে উভয় শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। সু-শব্দ প্রশস্তবাচক, অসুশব্দ অপ্রশস্তবাচক। সু ও অসু শব্দের উত্তর মত্বর্থ র-প্রত্যয় হইয়া সুর ও অসুর শব্দ ব্যুৎপাদিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রজাপতির প্রশস্ত আত্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া দেবগণ সুরশব্দবাচ্য এবং প্রজাপতির অপ্রশস্ত আত্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া দেবশত্রুগণ অসুর-শব্দবাচ্য। ধাতুপ্রত্যয়যোগে রূঢ়শব্দব্যুৎপাদনের শত শত উদাহরণ বেদে রহিয়াছে। ব্যাকরণের উণাদিপ্রকরণে বিস্তর রূঢ়শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। অতএব সমস্ত নাম ধাতুজ—শাকটায়নের এই সিদ্ধান্ত বেদানুসারী এবং ব্যাকরণসম্মত ; সুতরাং অভ্রান্ত, সমীচীন ও আদরণীয়।

সমস্ত নামের ধাতুজত্ব উপপাদনের জন্য কিরূপ নির্বচনপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে, তাদ্বিষয়ে নিরুক্তাচার্য্য যাস্ক যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে। যাস্ক বলেন যে, যে সকল নাম ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়ানুসারে ব্যুৎপাদিত হইলে অনুগতার্থ হয় অর্থাৎ অভিধেয়বস্তুগত ক্রিয়াদি যথাযথ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়, ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসারেই তাহার ব্যুৎপাদন করিবে। কেন না, তাহা হইলেই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অবলম্বনে ঐ সকল নাম অনায়াসে অভিধেয়বস্তুর প্রতিপাদন করিতে পারিবে। যেখানে ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যুৎপন্ন নাম অনুগতার্থ হয় না, অর্থাৎ নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অভিধেয়বস্তুতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্গত হয় না, সেখানে অর্থের প্রতি অর্থাৎ যে বস্তুতে নামের প্রয়োগ হইতেছে, সেই বস্তুর প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের কোনরূপ সামান্য বা সাদৃশ্য অবলম্বনপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। অর্থাৎ সচরাচর যে অর্থে নামের প্রয়োগ হইয়া থাকে, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের সহিত সেই অর্থের কিরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহা নিরূপণ করিবে। সাদৃশ্য নিরূপিত হইলে ঐ সাদৃশ্য অবলম্বনে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের ভিন্ন অর্থেও নামের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিবে। বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও যেখানে কোনরূপ অর্থসামান্য লক্ষিত হয় না, সেখানে শব্দসামান্য অনুসারে নির্বচন করিতে হইবে। অমুক ধাতুতে এই বর্ণ দৃষ্ট হইয়াছে. এই নামেও সেই বর্ণ দেখা যাইতেছে, অতএব ঐ

ধাতু হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ স্থির করিবে অর্থাৎ যে ধাতুর সহিত নামগত বর্ণের সাদৃশ্য আছে, সেই ধাতু দ্বারা সেই নামের নির্বচন করিবে। সে স্থলে ব্যাকরণের নিয়মের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, পদ নিষ্পন্ন করিবার জন্য বৈয়াকরণেরা প্রকৃতিপ্রত্যয়ের বিস্তর বিকৃতি করিয়াছেন। নৈরুক্তেরাও তাহাই করিবেন। এইরূপে নাম ব্যুৎপাদিত করিয়া সেই ধাতুর অর্থ সেই নামে স্থাপন করিবে। ধাতুর অর্থ সহজে অভিধেয় বস্তুতে সঙ্গত না হইলে প্রয়োজনানুসারে ধাত্বর্থের বিস্তার ও সঙ্কোচাদি কল্পনা করিয়া নির্বচন সম্পন্ন করিবে। ব্যুৎপত্তির ঈদৃশপ্রণালী প্রাচীন বৈয়াকরণদিগেরও অনুমত। এইজন্য বৈয়াকরণ আচার্য্যেরা বলিয়াছেন—

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥

বর্ণের আগম, বর্ণের বিপর্য্যয়, বর্ণের বিকার, বর্ণের নাশ এবং ধাতুর অর্থের অতিশয়ের সহিত ধাতুর যোগ, নির্বচন এই পঞ্চপ্রকার। বর্ণাগমাদির উদাহরণও পূর্ব্বাচার্য্যেরা দেখাইয়াছেন। যথা—

বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।
ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাদ্বর্ণনাশঃ পৃষোদরে॥

গো+ইন্দ্র এই শব্দদ্বয়যোগে গবেন্দ্রশব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে গবেন্দ্র না হইয়া গবেন্দ্র হইতে পারে। এস্থলে গো শব্দের পরে একটি অকার যোগ করিয়া গবেন্দ্র হইল। হিংসার্থ হিন্স্ ধাতু হইতে সিংহশব্দ উৎপন্ন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সিংহ না হইয়া হিংস হইতে পারে। এস্থলে হকার ও সকারের বিপর্য্যয় করিয়া সিংহশব্দ সিদ্ধ হইল। ষষ্ ও দশ শব্দযোগে 'ষোড়শ'শব্দ হইয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ষড়্দশ হইতে পারে। কিন্তু ষষ্শব্দের শেষ ষকারস্থানে উকার এবং দশশব্দের দকারস্থানে ডকার—এইরূপ বর্ণবিকারপ্রণালী দ্বারা ষোড়শপদ সাধিত হইল। পৃষৎ+উদর এই দুইটি শব্দযোগে 'পৃষোদর'পদ হইয়াছে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পৃষদুদর হইতে পারে। কিন্তু পৃষৎশব্দের তকারের লোপ করিয়া 'পৃষোদর'পদ সিদ্ধ হইল

নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণদিগের মতে রূঢ়শব্দেরও ব্যুৎপত্তি করিতে

হইবে, ইহা স্থির হইল। মীমাংসাভাষ্যকার আচার্য্য শবরস্বামী রূঢ়শব্দের ব্যুৎপত্তির পক্ষপাতী নহেন। তিনি স্বকৃত মীমাংসাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, যে শব্দের যে অর্থে প্রসিদ্ধি আছে, সে শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, নিরুক্ত-ব্যাকরণাদি দ্বারা অর্থ কল্পনা করিতে হইবে না। কারণ, নিরুক্তাদি দ্বারা অর্থ কল্পনা করিলে অর্থ ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় না। কেন না, ব্যুৎপত্তি অনুসারে কল্পিত অর্থ, অভিমত বস্তুমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্যুৎপত্তি অনুসারে অভিমত বস্তুর ন্যায় অপর বস্তুও ঐ শব্দের অর্থ হইতে পারে। অতএব যে শব্দের যে অর্থে প্রসিদ্ধি আছে, সে শব্দের সেই অর্থই গ্রহণীয়। আর্য্যদিগের ব্যবহারে যে শব্দের কোন অর্থে প্রসিদ্ধি নাই, অথচ ম্লেচ্ছব্যবহারে অর্থবিশেষে প্রসিদ্ধি আছে, সে শব্দের ম্লেচ্ছব্যবহারপ্রসিদ্ধ অর্থও গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন পিক, নেম, তামরস, সত প্রভৃতি শব্দের আর্য্যব্যবহারপ্রসিদ্ধ অর্থ না থাকায়, ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধি অনুসারে পিকশব্দের অর্থ কোকিল, নেম-শব্দের অর্থ অর্দ্ধ, তামরসশব্দের অর্থ পদ্ম, সত-শব্দের অর্থ শতচ্ছিদ্র বর্ত্তুলাকার দারুময় পাত্র। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ ব্যবহারে যে সকল শব্দের প্রসিদ্ধ কোন অর্থ নাই, নিরুক্ত এবং ব্যাকরণানুসারে সেই সকল শব্দের অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। শবরস্বামীর এই সিদ্ধান্ত বস্তুগত্যা প্রস্তাবিত বিষয়ের বিরোধী নহে। কেন না, নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ আচার্য্যেরা রূঢ়-শব্দের ব্যুৎপাদন এবং ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, লোকপ্রসিদ্ধ অর্থে অর্থাৎ অভিধেয়বস্তুতে সঙ্গত করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও কৌশল প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও রূঢ়শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা রূঢ়শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্মরণ করিতে হইবে যে, শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শনই নিরুক্তাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই নিরুক্তাদি শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং নৈরুক্ত এবং বৈয়াকরণ রূঢ়শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য। মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। সন্দিগ্ধস্থলে অসদর্থ নিরাসপূর্ব্বক বেদের সদর্থব্যাখ্যা অর্থাৎ আলোচনমাত্রে বা আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়-মান বেদবাক্যসকলের মীমাংসা করিবার উদ্দেশে মীমাংসাদর্শন প্রণীত

হইয়াছে। এইজন্য মীমাংসাভাষ্যকার রূঢ়শব্দের ব্যুৎপাদনের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। কেন না, শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন তাঁহার কার্য্য নহে। সদর্থ ব্যবস্থাপন করাই তাঁহার কার্য্য। নৈরুক্ত প্রভৃতি আচার্য্যগণ এবং মীমাংসাভাষ্যকার, উভয়েই শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত আচার্য্যগণ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসাভাষ্যকার তাহা করেন নাই। পরস্পরের মধ্যে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য। ফলিতার্থে কোনও বিরোধ হইতেছে না।

পিকাদিশব্দের ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে করেন না যে, ঐ সকল শব্দ ম্লেচ্ছভাষা হইতে গৃহীত, সুতরাং তত্তৎশব্দঘটিত বেদবাক্যগুলি আধুনিক। কেন না, শব্দ যদি মনুষ্যনির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঐরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইত। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। মীমাংসাদর্শনের মতে শব্দরাশি কোন মনুষ্য বা অপর কাহারও নির্ম্মিত নহে। উহা নিত্য। মনুষ্য তাহা প্রকাশ করে ও ব্যবহার করে মাত্র। মহাভাষ্যকার এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া শব্দ মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য একটি কৌতুকাবহ হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শব্দ মনুষ্যনির্ম্মিত হইলে সংস্কৃতশব্দগুলি বৈয়াকরণ পণ্ডিতদিগের নির্ম্মিত, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ঘটশরাবাদির প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লোকে যেমন কুলাল বা কুম্ভকারের বাড়ী যাইয়া বলে যে, আমার এতগুলি ঘটশরাবের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি ব্যবহার করিব; সেইরূপ শব্দ মনুষ্যনির্ম্মিত হইলে লোকে বৈয়াকরণ পণ্ডিতদিগের গৃহে যাইয়া বলিত যে, আমার আবশ্যক হইয়াছে, আমার জন্য এতগুলি শব্দ প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি তাহা ব্যবহার বা প্রয়োগ করিব। তাহা কিন্তু কেহই করে না। অতএব শব্দ নিত্য, মনুষ্যনির্ম্মিত নহে। সে যাহা হউক, শব্দের নিত্যত্ব মীমাংসাদর্শনে সমীচীন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। শব্দ নিত্য হইলে ম্লেচ্ছভাষা হইতে শব্দগ্রহণের আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, নিত্য শব্দ জল ও অনলাদির ন্যায় সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি এবং যথেচ্ছ ব্যবহার্য্য। জাতিবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগের বিরলতা ও প্রাচুর্য্য জাতিবিশেষের অবস্থানুসারে ঘটিয়া থাকে। যে শব্দ যে অর্থে

যে জাতি প্রচুর ব্যবহার করে, সেই জাতির পক্ষে সেই শব্দের সেই অর্থ প্রসিদ্ধ, অপরের পক্ষে অপ্রসিদ্ধ, এইমাত্র প্রভেদ ব্যবহারের প্রাচুর্য্যই প্রসিদ্ধির কারণ। ব্যবহারের বিরলতা কালে সঙ্কেতবিস্মরণের হেতু হইয়া পড়ে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে যাহারা উক্ত-কারণে বেদবাক্যের আধুনিকত্ব বলিতে চাহেন, তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত যে, একত্রবাসী এক আদিমজাতি হইতে কালে দুই শাখা দুই বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া আর্য্য ও ম্লেচ্ছ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত। সুতরাং কথিত কারণে পিকাদি-শব্দঘটিত বেদবাক্যগুলির আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। দেশান্তরে উপনিবিষ্ট হইয়াও এক শাখা ঐ সকল শব্দ বহুলপরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সকল শব্দের অর্থ তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, অন্য শাখার ব্যবহার অল্প হইতে অল্পতর হওয়াতে অর্থ অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এক আদিম জাতিরই এক শাখা আর্য্যজাতি ও অপর শাখা ম্লেচ্ছজাতি নামে আখ্যাত, ইহা আমার অঙ্গীকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া যেন বিবেচিত হয় না। ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে আপত্তি হইলে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, ইহা প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য উক্ত বিষয়ে আমি কীদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এস্থলে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ধরিয়া লইতে পারেন যে, হয় ত ঐ বিষয়ে আমার কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই।

সে যাহা হউক, নিরুক্তাচার্য্য যাস্ক অর্থসামান্য অনুসারে নির্বচন করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার উদাহরণস্থলে প্রবীণ, উদার প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য। "প্রকৃষ্টো বীণায়াম্," অর্থাৎ বীণাবিষয়ে প্রকৃষ্ট, এই অর্থে প্রবীণশব্দ ব্যুৎপাদিত। অতএব গান্ধর্ব্ববিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তি প্রবীণ-শব্দের প্রকৃত অর্থ। অভ্যাসজনিত পটুতা না হইলে প্রকৃষ্ট বা দক্ষ হইতে পারা যায় না। সুতরাং গান্ধর্ব্ববিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তির অবশ্যই অভ্যাসপাটব আছে। এই অভ্যাসপাটবরূপ সামান্য অবলম্বন করিয়া অন্যত্রও প্রবীণ-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পরিশ্রমপূর্ব্বক কৌশললাভ করিয়াছে, তাহাকে সেই বিষয়ে প্রবীণ বলা হয়। যেমন,

ব্যাকরণে প্রবীণ, দর্শনে প্রবীণ ইত্যাদি। আরও দূরতর সাদৃশ্য লইয়া লোকে প্রবীণশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রবীণ ব্যক্তি কৌশলসম্পন্ন, সুতরাং তাহাতে মহত্ত্ব আছে। এই মহত্ত্ব অবশ্য গুণগত কিন্তু পরিমাণগত মহত্ত্ব লইয়া কখন-কখন লোকে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। যেমন, প্রবীণ বৃক্ষ, প্রবীণ মৎস্য ইত্যাদি। 'আর'শব্দের অর্থ কশার প্রান্তভাগ। সারথিকর্ত্তৃক কশা উত্তোলিত হইবামাত্র অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে কশার প্রান্তভাগ পাতিত করিবার পূর্ব্বেই যে অশ্ব বা বলীবর্দ সারথির অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিয়া থাকে, তাহার নাম উদার। কেন না, 'আর' অর্থাৎ কশার প্রান্তভাগ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্গত হইয়াছে, পৃষ্ঠদেশের সহিত আরের সম্বন্ধ হয় নাই। তথাবিধ অশ্বাদি 'উদার'শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ। কিন্তু অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করা, এই সামান্য বা সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া, যে দাতা প্রার্থীর অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাকেও উদার বলা হয়। বর্ণসামান্য অনুসারে নির্ব্বচনের প্রচুর উদাহরণ নিরুক্তগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

বৈদিক নামকরণপ্রণালীর আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। নিরুক্তগ্রন্থে তাহাই অনুসৃত, ব্যাখ্যাত ও পল্লবিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ অগ্নিশব্দের নির্ব্বচনপ্রণালী দেখান যাইতেছে। অর্থ কি পদার্থ, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। আত্মবাদীরা বলেন, এক আত্মাই বিভূতিযোগে নানারূপে অবস্থিত, অতএব সমস্ত শব্দই নানাভাবে অবস্থিত আত্মাকেই প্রতিপাদন করে। লোকবেদপ্রসিদ্ধ যজ্ঞাঙ্গ দেবতাবিশেষের নাম অগ্নি, ইহা যাজ্ঞিকদিগের মত। পৃথিবীস্থিত জ্যোতিঃপদার্থবিশেষ অগ্নি, ইহা নিরুক্তকারদের অভিমত। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্নিপদের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্রশব্দ ও নীধাতুর যোগে অগ্রণীশব্দ ব্যুৎপন্ন। অগ্রশব্দের অগ-অংশ এবং নীধাতুর দীর্ঘ ঈকার হ্রস্বরূপে বিকৃত করিয়া নীধাতুর নি লইয়া অগ্নিনাম সম্পন্ন করা হইয়াছে। যেহেতু, সকল বিষয়েই ইনি নিজেকে অগ্রে নয়ন করেন। অথবা ইনি দেবতাদের অগ্রণী অর্থাৎ সেনাপতি (১)। অথবা যজ্ঞকর্ম্মে প্রথম

(১) অগ্নি দেবতাদিগের সেনাপতি, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।

নীত অর্থাৎ প্রণীত বলিয়া ইহার নাম অগ্নি। অথবা কি লৌকিক, কি বৈদিক, যে কর্ম্মে ইনি সাধকরূপে উপস্থিত হন, তথায় নিজে প্রধান হইয়া অপর সমস্তকে নিজের অঙ্গতা-নয়ন অর্থাৎ গুণীভূত করেন, এই-জন্য ইহার নাম অগ্নি। "অঙ্গং নয়তি ইত্যগ্নিঃ"। অথবা তৃণ বা কাষ্ঠ যাহা-কিছু আশ্রয় করেন, তাহাকেই অঙ্গতা-নয়ন অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন বলিয়া ইহার নাম অগ্নি। স্থৌলাষ্ঠীবি আচার্য্যের মতে, অক্নোপন অর্থাৎ রুক্ষকারী বলিয়া ইহাকে অগ্নি বলা হয়। এ মতে 'অক্নোপন'শব্দের বর্ণ-লোপ ও বর্ণবিকার প্রক্রিয়া অনুসারে অগ্নিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শাকপূণি আচার্য্য তিনটি ধাতু দ্বারা অগ্নিশব্দের নির্বচন করিয়াছেন। বর্ণবিকারপ্রক্রিয়ানুসারে গত্যর্থ ইন্‌ধাতুর অকার, প্রকাশার্থ অঞ্জ্‌ধাতু বা দাহার্থ দহ্‌ধাতুর গকার এবং প্রাপণার্থ নীধাতুর নি, এইরূপে ধাতু-ত্রয় হইতে অক্ষরত্রয় গ্রহণ করিয়া অগ্নিশব্দ সাধিত বা সংস্কৃত হইয়াছে। কারণ, এই ধাতুত্রয়বাচ্য ক্রিয়াই অগ্নিতে আছে। অগ্নি গতিক্রিয়াযুক্ত, রূপের প্রকাশক বা পার্থিব বস্তুর দাহকারী এবং হবনীয় দ্রব্য দেবতা-দের উদ্দেশে নয়ন করেন। বাক্যের আদি ও অন্ত বর্ণ লইয়াও নির্বচন দেখিতে পাওয়া যায়। "বলাদতীতঃ"—এই বাক্যের আদি ও অন্ত অক্ষর লইয়া 'বত'শব্দ দুর্ব্বলে প্রযুক্ত হইয়াছে। লোকেও স্থল-বিশেষে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দেশবিশেষে পুষ্করিণীকে 'পুণী'শব্দে অভিহিত করা হয়। কুর্ব্বাণা—এই পদের উকার ও বকার লোপ করিয়া 'ক্রাণা'শব্দের নির্বচন করা হইয়াছে। স্মৃতিপুরাণাদিতেও নৈরুক্ত নির্বচনপ্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে—

জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীমিতি তাং বিদুঃ।

জয় ও পুণ্য করে বলিয়া তাহার নাম জয়ন্তী। এখানে "জয়ং পুণ্যং চ কুরুতে" এই বাক্যের "পুণ্যং চ কুরু" এই অংশ বর্ণলোপপ্রণালী অনুসারে লুপ্ত এবং বর্ণবিকারপ্রক্রিয়া দ্বারা 'তে' এই একার ঈকারে পরিণত করিয়া জয়ন্তীনাম নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। মনুসংহিতায় বক্ষ্য-মাণরূপ শরীরশব্দের ব্যুৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়—

যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥

যেহেতু দেহসকল সেই ব্রহ্মের মূর্ত্তির অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি সূক্ষ্ম অবয়বকে আশ্রয় করে, সেইহেতু দেহাকারে পরিণত তাঁহার মূর্ত্তিকে পণ্ডিতেরা শরীর বলেন। কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন,—"ষড়াশ্রয়ং শরীরম্," ছয়কে আশ্রয় করে বলিয়া শরীর। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ষষ্-শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র'প্রত্যয় করিয়া বর্ণবিকারপ্রক্রিয়ানুসারে শরীর-শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। এমন কি, কোন বস্তুর সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই বস্তুর নামে বস্তুবিশেষের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, দণ্ডের যোগ আছে বলিয়া দণ্ডশব্দ এবং মঞ্চে অবস্থান করে বলিয়া মঞ্চশব্দ পুরুষে প্রযুক্ত হয়। কখন-কখন বিক্রেয়বস্তুর নামে ফেরিওয়ালাকে ডাকা হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। দেশবাচক অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি শব্দ তত্তদ্দেশবাসীতে ভূরিপ্রমাণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিকদিগের মতে হিন্দুনাম ঐ মূল হইতে উদ্ভূত। সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশসকল সাধারণতঃ সিন্ধুস্থান অর্থাৎ সিন্ধুপ্রদেশ বলিয়া বিদেশীয়দিগের নিকট পরিচিত। পারস্তভাষায় উহা হিন্দুস্তান বলিয়া আখ্যাত। এই হিন্দুস্থানবাসীদের প্রকৃত নাম হইতে পারে হিন্দুস্থানী, কিন্তু সঙ্ক্ষেপতঃ হিন্দুনামে তাহারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে মুসলমানেরা ভারতীয়দিগকে হিন্দুনামে আখ্যাত করেন, সে সময়ে এ দেশে মুসলমানের বসবাস আদৌ ছিল না। হিন্দুনামের বীজভূত সিন্ধুনদ পারস্তভাষায় হিন্দু, গ্রীক্‌ভাষায় ইন্দুস্ বলিয়া কথিত হয়। তদনুসারে লাটিন্‌ভাষায় ভারতবর্ষের নাম ইণ্ডিয়া হইয়াছে। পারস্ত-ভাষায় কৃষ্ণবর্ণও হিন্দুশব্দের এক অর্থ। ঐ ভাষায় হিন্দুকোশপর্ব্বতের নাম হিন্দুকোহ্ অর্থাৎ কৃষ্ণপর্ব্বত। পারসীকদিগের মতে রমণীদিগের গণ্ডস্থলে কৃষ্ণবর্ণ তিল অতিশয় সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। বিখ্যাত পারস্তকবি হাফেজ বলিয়াছেন—

অগর আঁন্ তুর্ক শিরাজী বদস্তারদ্ দিলে মারা।
বখালে হিন্দোয়েস্ বক্‌যম্ সমরকন্দো বোখারা রা॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—শিরাজবাসিনী সে সুন্দরী যদি আমার অন্তঃ-করণকে হস্তগত করে অর্থাৎ আমাকে ভালবাসে, তবে তাহার কৃষ্ণবর্ণ তিলের পরিবর্ত্তে সমরকন্দ ও বোখারা উভয়ই প্রদান করিব। উক্ত পদ্যে

কৃষ্ণবর্ণ অর্থে হিন্দুশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশবাসিগণ অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মুসলমানেরা তাহাদিগের হিন্দু-আখ্যা দিয়াছেন কি না, তাহাও চিন্তাশীলদিগের বিবেচ্য। পূর্ব্বকালে মুসলমানেরা আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাসের আমদানী করিতেন। আফ্রিকাবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া হিন্দুশব্দে অভিহিত হইত। কালে দাসমাত্রই হিন্দুনামে আখ্যাত হইয়াছিল। বিজয়ী মুসলমানগণ ঘৃণাপূর্ব্বক সিন্ধুপ্রদেশবাসীদিগকে হিন্দুনামে আখ্যাত করিয়াছেন কি না, তাহাও চিন্তয়িতব্য বিষয় বটে। বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুনাম আমাদিগের নিজসম্পত্তি নহে, বাবুনামের ন্যায় উহা অন্যের প্রদত্ত। অনন্তরনির্দ্দিষ্ট কারণদ্বয়ের কোনও কারণে বা উভয় কারণে যদি হিন্দুনামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে হিন্দুনাম সিন্ধু-প্রদেশবাসীদিগের পক্ষে গ্লানিকর ভিন্ন গৌরবের বস্তু নহে। অথচ আমরা হিন্দুনামের কতই-না গৌরব করিয়া থাকি। সুতরাং ইহাকে বেদান্ত-মতসিদ্ধ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রভাবের যৎসামান্য আভাস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। মেরুতন্ত্রে হিন্দুশব্দের অন্যবিধ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

হীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট আচারব্যবহারকে দূষিত করে বলিয়া হিন্দুনামে অভি-হিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মেরুতন্ত্রে লণ্ডননগরের উল্লেখ আছে, অতএব উহা নিতান্ত আধুনিক। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, পুরাণাদিতে অনেক ভবিষ্যদুক্তি আছে। মেরুতন্ত্রেও ভবিষ্যদুক্তিস্থলেই লণ্ডননগরের উল্লেখ আছে। সুতরাং তদ্দ্বারা মেরুতন্ত্রের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উহা যে ভবিষ্যদুক্তি, তাহা দেখাইবার জন্য মেরুতন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

পশ্চিমাম্নায়মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্যভাষয়া।
অষ্টোত্তরশতাশীতির্যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
পঞ্চ খানাঃ সপ্ত মীরা নব সাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্মপ্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ।
হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ফিরিঙ্গভাষয়া মন্ত্রা যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নবষট্‌পঞ্চ লণ্ডুজাশ্চাপি ভাবিনঃ।

ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কিন্তু মেরুতন্ত্রের প্রামাণ্য সন্দেহ করিবার অন্য কারণ আছে। তাহা এই—পারস্যভাষা এবং ফিরিঙ্গভাষায় যে সকল মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তত্তদ্ভাষাভিজ্ঞেরা জানেন যে, বস্তুগত্যা উহাদের অস্তিত্ব নাই। কোন প্রামাণিক গ্রন্থকার মেরুতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করেন নাই। হিন্দুনাম চিরন্তন হইলে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি গ্রন্থে আর্য্যনামের ন্যায় হিন্দুনামের উল্লেখ থাকিত।

সে যাহা হউক, নামকরণের যে সকল প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে দর্শনশাস্ত্রের নামকরণবিষয়ে কোনও অনুপপত্তি থাকিতে পারে না। দর্শনশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ যাহাই হউক না কেন, শাস্ত্রবিশেষ যে তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। যে শাস্ত্রবিশেষে যুক্তিদ্বারা বক্তব্যবিষয় সমর্থিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে। এতাবতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, দর্শনশব্দ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বা তাহার সাদৃশ্য লইয়া শাস্ত্রবিশেষে প্রযুক্ত; অথবা শাস্ত্রবিশেষে রূঢ়।

কেহ দর্শনশব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চাক্ষুষজ্ঞান দৃশ্-ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও উহার অপর অর্থ, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে দৃশ্‌ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই দর্শনশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থরূপে প্রতীয়মান হয়। অন্তঃকরণাদি জ্ঞানের সাধন হইলেও তাহা শাস্ত্র নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞানের সাধন, অনাদি বেদ হইতে অদ্যতনীয় কাব্য পর্য্যন্ত সকলই অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞানের সাধন বলিয়া শাস্ত্রমাত্রই দর্শনশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে। এতদুত্তরে তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞানসামান্য ও জ্ঞানবিশেষ, এই উভয় অর্থেই জ্ঞানশব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরসিংহ বলিয়াছেন—

মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান। প্রকৃতস্থলে দৃশ্‌ধাতুর জ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক-জ্ঞানরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত আপত্তি নিরাকৃত হইতে পারে। কেন না, দর্শন-শাস্ত্র মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র জ্ঞানসামান্যের সাধন হইলেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদ্য বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া অধিকাংশ স্থলে দর্শনসকলের বিশেষ বিশেষ নাম হইয়াছে। দর্শনান্তরে অনালোচিত 'বিশেষ'নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হওয়াতে কণাদের দর্শন বৈশেষিকদর্শন বলিয়া আখ্যাত। ন্যায়পদার্থ বিশেষরূপে আলোচিত ও প্রযুক্ত হওয়ায় গোতমের দর্শনের নাম ন্যায়দর্শন। সাংখ্য-দিগের দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির দর্শনের নাম পাতঞ্জলদর্শন, এই দুইটি নাম যথাক্রমে সম্প্রদায় ও কর্ত্তার নামানুসারে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের অপর নাম যোগদর্শন। কেন না, তাহাতে যোগের বিস্তর ব্যাখ্যা আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সাধারণ নাম সাংখ্যপ্রবচন। কারণ, তত্ত্বসমাসনামক আদি বা সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী উক্ত উভয় দর্শনে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতে সাংখ্যশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়—

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যাঁহারা সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ করেন এবং প্রকৃতি ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলেন, তাঁহারা সাংখ্য। বেদবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আছে বলিয়া জৈমিনির দর্শনের নাম মীমাংসাদর্শন। 'শরীর'শব্দের উত্তর কুৎসার্থে কন্‌-প্রত্যয় করিয়া 'শরীরক'শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শারীরক'শব্দের অর্থ কুৎসিতশরীরবাসী জীবাত্মা (১)। কুৎসিত-শরীরবাসী জীবাত্মা উৎকৃষ্টরূপে বিচারিত হইয়াছে বলিয়া ব্যাসের দর্শনের

(১) শরীর স্বভাবতঃ কুৎসিত; কেন না, মূত্রপুরীষোপহত মাতার উদর তাহার উৎপত্তি ও অবস্থিতির স্থান, শুক্র-শোণিত তাহার উপাদান, শরীর স্বয়ং মূত্র-পুরীষ-মাংস-শোণিতাদি-যুক্ত।

নাম শারীরকমীমাংসা। বেদান্তবাক্যসকলের অর্থ বিচারিত হইয়াছে বলিয়া উহার অপর নাম বেদান্তদর্শন। জৈমিনি ও ব্যাসের দর্শন উভয়ই মীমাংসাশব্দেও অভিহিত হয়। মীমাংসাশব্দের অর্থ পূজিত বিচার বা বেদবিচার। দুই দর্শনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্যাসের দর্শন উত্তরমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা এবং জৈমিনির দর্শন পূর্ব্বমীমাংসা, কর্ম্ম-মীমাংসা ও অধ্বরমীমাংসা নামে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধদর্শন, আর্হতদর্শন প্রভৃতি কতগুলি দর্শন সম্প্রদায়নামে এবং পাণিনীয়দর্শন প্রভৃতি কর্ত্তৃ-নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কণাদ প্রভৃতি দর্শনকর্ত্তারা তাঁহাদের গ্রন্থে বৈশেষিকাদি বিশেষ বিশেষ নামগুলি ব্যবহার করেন নাই। ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ সকল নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দর্শনকার বা ভাষ্যকার কেহই দর্শননাম ব্যবহার করেন নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যে এবং উদয়নাচার্য্য তাঁহার ন্যায়কুসুমাঞ্জলি প্রকরণে দর্শনশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য তাহার বহুপূর্ব্বে দর্শনশব্দ ব্যবহৃত হইত। কারণ, ঐরূপ প্রসিদ্ধি না থাকিলে তাঁহারা উহা ব্যবহার করিতেন না। ফলতঃ দর্শননাম অধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ অধ্যেতারা দর্শননাম ব্যবহার করিয়াছেন। তদনুসারেই উহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেবল দর্শন বলিয়া নহে, কল্পসূত্র ও গৃহ্যসূত্রসকল বেদভেদে ও শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোন্ বেদের বা কোন্ শাখার কোন সূত্র, তাহা সূত্রগ্রন্থে কথিত হয় নাই। এমন কি, কোন্ মন্ত্র বা সংহিতা এবং কোন্ ব্রাহ্মণ কোন্ শাখার, তাহাও সংহিতা বা ব্রাহ্মণে নির্দ্দিষ্ট নাই। উহাও অধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ। এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার লোপ কেবল বিদ্যালোপের কারণ নহে। উহা রহিত হইলে কালে গ্রন্থের পরিচয় পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যাইতে পারে। অতএব পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন এবং ভাবিষ্যবংশীয়দিগের মঙ্গলের জন্য কৃতবিদ্যমণ্ডলী দর্শনশাস্ত্রাদির অনুশীলনবিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন, ভগবান্ তাঁহাদের সহায় হউন।

তৃতীয় লেক্‌চর।

দর্শনশাস্ত্র।

কি প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব, তাহার উপকারিতা ও আবশ্যকতাই বা কি, কেনই বা দর্শনশাস্ত্রের এত সমাদর? যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবেন, স্বভাবতই তাঁহাদের এই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে জানিবার অভিলাষ হইবে। প্রাণিমাত্রই কোন একটি প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, নিষ্প্রয়োজন প্রবৃত্তি আকাশকুসুমের মত অলীক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য অগ্রে প্রয়োজনের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। দর্শনশাস্ত্র যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যও অবশ্যই তদনুরূপ উচ্চ হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় দর্শনসকল আধ্যাত্মিক দর্শন। মহর্ষিগণ অধিকাংশ দর্শনের প্রণেতা। তাঁহারা অধ্যাত্মজগতে বিচরণশীল। তাঁহাদের প্রণীত দর্শন অধ্যাত্মবিদ্যাবিশেষ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনরূপ বিশিষ্টপ্রয়োজন-সম্পাদনার্থ প্রবৃত্ত—ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বস্তুগত্যা আধ্যাত্মিক-প্রয়োজন-সম্পাদনই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজনের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিই পরম-পুরুষার্থ, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। মহর্ষি কণাদ ও গোতম প্রভৃতি অধিকাংশ দর্শনপ্রণেতাগণ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিই তাঁহাদের দর্শনের প্রয়োজন, ইহা স্পষ্টভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির উপায়—এ বিষয়ে অধ্যাত্মবেত্তাদিগের মতভেদ নাই। কেন না, সংসার বা বন্ধন মিথ্যাজ্ঞানজন্য। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের অপনয় সাধন করিয়া মুক্তি সম্পাদন করিবে, ইহা অনায়াসবোধ্য। আত্মা বস্তুগত্যা দেহাদি-

ভিন্ন হইলেও দোষবশতঃ সাংসারিক মানবগণ দেহ বা ইন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া জানে। ইহাই হইল মিথ্যাজ্ঞান, ইহাই অনর্থের মূল। এই মিথ্যাজ্ঞান অপনীত না হইলে মুক্তি হইতে পারে না; এবং এই মিথ্যাজ্ঞানের অপনয় একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। এইজন্য আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উদ্দেশে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বেদে বিহিত হইয়াছে। স্মৃতিকার বেদবিহিত শ্রবণমননের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥

শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ ও উপপত্তি দ্বারা মনন করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করিবে। এই তিনটি আত্মদর্শনের বা আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু। উপপত্তি—যুক্তি বা অনুমান।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহা বেদবাক্য হইতে শ্রুত হইবে, তাহা অবশ্য যথার্থ, সুতরাং তদ্বিষয়ে মননাদি অনাবশ্যক। কিন্তু লোকের স্বভাব এই, আপ্তোপদেশ অর্থাৎ অভ্রান্তপুরুষের বিশ্বাস্যবাক্যে যাহা শ্রবণ করে, যুক্তি বা অনুমান দ্বারা তাহা বুঝিতে চায়, যাহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছুক হয়। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলে তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ জিজ্ঞাসা থাকে না। সুতরাং প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞান প্রত্যক্ষাবসান অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শন হইলে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা নিবৃত্ত হয়, ইহা স্বাভাবিক বা অনুভব-সিদ্ধ। ন্যায়ভাষ্যকারও এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান-মাত্রই মুক্তির কারণ নহে। সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মদর্শন শ্রবণমাত্রসাধ্য নহে। উহাতে মনন ও নিদিধ্যাসনেরও আবশ্যকতা আছে। শ্রবণ শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রসাধ্য, মনন অন্তঃকরণসাধ্য। একেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান অপেক্ষা একাধিক-ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান সমধিক বিশ্বসনীয়। দেহাদিতে আত্মভ্রম যেরূপ প্রত্যক্ষ, দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানও সেইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক হওয়া আবশ্যক। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান, প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞানের সমুচ্ছেদ-বিধানে সক্ষম হয় না। তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হইলে তবে প্রত্যক্ষাত্মক

মিথ্যাজ্ঞানের উন্মূলন করিতে পারে। এইজন্য শ্রুতি ও স্মৃতিতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দর্শনশাস্ত্র মননের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই কারণে দর্শনশাস্ত্রের অপর দুইটি নাম—মননশাস্ত্র ও বিচারশাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্রের এতাদৃশ সমুচ্চ লক্ষ্য বা প্রয়োজন আছে বলিয়াই দর্শনশাস্ত্রের এত আদর ও এত গৌরব। পাংশুলপাদুক কৃষীবল হইতে শাস্ত্রব্যবসায়ী বিদ্বান্ পর্য্যন্ত সকলেই "অহং স্থূলঃ, অহং কৃশঃ" অর্থাৎ 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' এইরূপে সংঘাত অর্থাৎ দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া জানে। দর্শনশাস্ত্র বুঝাইয়া দেয় যে, আত্মা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ। যে দর্শনশাস্ত্র সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ অনুভবের অসত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া আশাতীত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে, মোহান্ধ মানবের জ্ঞানচক্ষু সমুন্মীলিত করিয়াছে, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিয়া অপ্রতর্ক্য অচিন্তনীয় পরলোকের পথে মানবকে পরিচালিত করিয়াছে, গাঢ়তর অন্ধকারে পরিস্ফুট আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে, সংক্ষেপতঃ জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, সে দর্শনশাস্ত্রের গৌরব ও মহিমা অভিনিবেশসহকারে বুঝিবার যোগ্য, বাক্যদ্বারা বুঝাইবার যোগ্য নহে।

আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে ভিন্ন, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোকের স্বভাব এই যে, তাহারা উপদেশমাত্রে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না,—উপদিষ্ট বিষয় উপপত্তিসহকারে বুঝিবার জন্য ব্যগ্র হয়। দর্শনশাস্ত্র সেই উপপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেয় বা শাস্ত্রের উপদেশ উপপত্তিসহকারে বুঝাইয়া দেয়। এমন লোকও একান্ত বিরল নহে যে, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের তাদৃশ আস্থা নাই, বা সম্পূর্ণ অনাস্থাই রহিয়াছে, তথাপি দর্শনশাস্ত্র তাহাদিগের পক্ষেও আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম। কুতার্কিকদিগের তর্কজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া সমীচীন তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপথগামীকে সৎপথে আনয়ন করা, লক্ষ্যভ্রষ্টকে লক্ষ্যের অভিমুখ করা, দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন অপর কোনও শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে।

পরমকারুণিক শাস্ত্র পিতামাতার ন্যায় লোকের হিতকর উপদেশ

দিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি গর্ব্বিত পুত্র পিতামাতার উপদেশ গ্রাহ্য করে না। সে যতক্ষণ না তাড়িত হয়, ততক্ষণ কিছুতেই পিতা-মাতার উপদেশের অনুবর্ত্তন করিতে চাহে না। তাড়িত হইলে তাড়নার ভয়ে উপদেশের বশবর্ত্তী হইতে বাধ্য হয়। আমরাও তদ্রূপ শাস্ত্রের উপদেশের প্রতি অনাস্থা বা অনাদর প্রদর্শন করিলে, দর্শনশাস্ত্রের অকাট্য-তর্করূপ কশাঘাতে নিয়মিত হইয়া শাস্ত্রের উপদেশের প্রতি আস্থা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হই। মাণ্ডলিক রাজগণ যেমন সম্রাট্-কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়েন, অপরাপর শাস্ত্র সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। ফলতঃ দর্শনশাস্ত্র শাস্ত্রজগতে সম্রাট্, লোকের পক্ষে গুরুর ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুর ন্যায় হিতোপদেষ্টা, প্রিয়তমের ন্যায় প্রীতিপ্রদ। উৎকৃষ্ট শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য, মণিকাঞ্চনযোগ সম্পাদন করিয়াছে। বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও সূক্ষ্মগ্রাহিতা এবং তর্কশক্তির সমুন্মেষ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অবান্তর প্রয়োজন। অবান্তর প্রয়োজন-গুলি দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, শাস্ত্রান্তরের পক্ষে তাহাই অসামান্য ও পর্ব্বতপ্রমাণ বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেন না, অন্যান্য শাস্ত্র তত্বদূর অগ্রসর হইতেও সক্ষম নহে। বলা বাহুল্য যে, পৌরুষেয় শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বলা হইল। অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরীয় বেদশাস্ত্রের কথা স্বতন্ত্র। চিন্তাশীল সুধীগণ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমস্ত শাস্ত্রই বেদশাস্ত্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার দর্শনের মূলভিত্তি বেদ হইতে সমাহৃত মনে করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি নিজে বেদ না মানিলেও আস্তিকদিগের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার উদ্দেশে তাঁহার দর্শনেও বেদবাক্য প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, তাঁহারাও শাস্ত্র-বিশ্বাসীদিগকে ঠকাইবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন।

সত্য বটে, জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যাবলীর মীমাংসায় পর্য্যবসিত। মীমাংসাদর্শনের প্রয়োজন মুক্তি নহে, কর্ম্মের অববোধমাত্রই তাহার প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান-

সাধ্য হইলেও পরোক্ষভাবে কর্ম্মও মুক্তি সম্পাদন করে। কেন না, কর্ম্ম-দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। অতএব মুক্তি মীমাংসাদর্শনের সাক্ষাৎ প্রয়োজন না হইলেও পরম্পরা প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। কারণ চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ কর্ম্ম ও তাহাই মীমাংসাদর্শনের আলোচ্য বিষয়। আর এক কথা। অনেক বৈদান্তিক আচার্য্য, স্পষ্টাক্ষরে না হউক, প্রকারান্তরে জৈমিনির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন যে, জৈমিনির মতে মুক্তি আত্মস্বরূপ নহে, স্বর্গাদির ন্যায় লোকান্তর বা স্বর্গবিশেষ। "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম"—এই উক্তিদ্বারা ভগবান্‌ও মীমাংসকদিগের প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন কি না, তাহাও বিবেচ্য। সে যাহা হউক, বেদে আছে যে, সোমযাগ করিলে অমৃতত্বলাভ হয়। মুক্তি আর অমৃতত্ব এক কথা। মুক্তি আর অমৃতত্ব এক পদার্থ, ইহা সমস্ত দার্শনিকদিগের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত। অতএব বলা যাইতে পারে যে, জৈমিনির দর্শনেরও প্রয়োজন মুক্তি। তবে, জৈমিনি যাহাকে মুক্তি বলেন, অপর দার্শনিকেরা তাহাকে মুক্তি বলেন না। জৈমিনির সম্মত মুক্তি এবং অপরাপর দার্শনিকদিগের সম্মত মুক্তি ভিন্ন ভিন্ন, একরূপ নহে, এইমাত্র প্রভেদ। ইহাতে কিছু আসে-যায় না। প্রচুরপরিমাণে দার্শনিকদিগের পরস্পর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণ করিতে হইবে যে, দর্শনসকলের প্রস্থানভেদই ঐরূপ মতভেদের কারণ। রামানুজস্বামীর মতে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তরমীমাংসা, এই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে, উভয়ে মিলিয়া একটি দর্শন। একই দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ দর্শনের কর্ম্মকাণ্ডাংশ জৈমিনি এবং জ্ঞান-কাণ্ডাংশ বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। যেমন অষ্টাধ্যায়ীর একই কাশিকা বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বামন ও জয়াদিত্য রচনা করিলেও ঐ ঐ অংশ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ নহে, একই কাশিকা বৃত্তি, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ জৈমিনি এবং ব্যাসের রচিত হইলেও উহা ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে, উভয়ে মিলিয়া একই মীমাংসাদর্শন। এই মতে মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য যে মুক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে এ প্রস্তাবের অনেকস্থলে মীমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন ভিন্ন ভিন্ন দর্শনরূপে ব্যবহৃত হইবে।

সংক্ষেপে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইল। তদ্দ্বারাই দর্শন-শাস্ত্রের উপকারিতা ও আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আবশ্যকতা-সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন কি শাস্ত্রীয়, কি লৌকিক, কোন বিষয়েই একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শাস্ত্রার্থবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না, ইহা শাস্ত্রব্যবসায়িমাত্রেই অবগত আছেন। লৌকিক বিষয়েও এইটি কর্ত্তব্য, এইটি অকর্ত্তব্য, ইহা ভাল, ইহা মন্দ—এইরূপ নির্ণয় করিতে হইলে অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তি আবশ্যক হয়। যুক্তির আকর দর্শনশাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্রে যে যুক্তির অবতারণা দেখা যায়, তাহারও মূলভিত্তি দর্শনশাস্ত্র। একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে শরীরের উষ্ণতার মাত্রা অত্যন্ত অধিক হইলে তাহার প্রশমনের জন্য অনেকে স্নান করিয়া থাকেন। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ—ইহা পূর্ব্বে সমর্থিত হইয়াছে। স্নান আমার ইষ্টসাধন অর্থাৎ স্নান করিলে আমার অভিলষিত উষ্ণতার প্রশমন হইবে—স্নানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই লোকের ঈদৃশ জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহা না হইলে স্নানে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এখন কথা হইতেছে যে, স্নান করিবার পর উষ্ণতার প্রশমন তৎক্ষণাৎ অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু স্নান করিলে উষ্ণতা প্রশমিত হইবে, স্নান করিবার পূর্ব্বে এইরূপ ভবিষ্যৎ বিষয় জানিবার উপায় কি? এতদুত্তরে যদি বলা হয় যে, অনেকবার দেখা গিয়াছে যে, স্নান করিবার পূর্ব্বে যেরূপ উষ্ণতার অনুভব হয়, স্নান করিলে তাহা অনেক অংশে প্রশমিত হইয়া থাকে, অতএব বুঝা যাইতেছে যে, স্নান উষ্ণতাপ্রশমনের একটি উপায়। কর্ত্তব্য স্নানও স্নান বটে, সুতরাং তদ্দ্বারাও উষ্ণতা প্রশমিত হইবে। এইরূপে, স্নান করিলে উষ্ণতা প্রশমিত হইবে—এই ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান লোকের অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, এস্থলে লোকে অজ্ঞাতভাবে দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিতেছে। কারণ, স্নানের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ উষ্ণতাপ্রশমনের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কেন না, বিদ্যমান বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও অতীত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। স্নান করিবার পূর্ব্বে সেই স্নানজন্য

উষ্ণতাপ্রশমন বিদ্যমান নহে, অনাগত বা ভবিষ্যৎ। কারণ ঐ উষ্ণতার শান্তি তখনও হয় নাই। স্নান করিলে তবে উষ্ণতার শান্তি হইবে। সুতরাং অনাগত উষ্ণতাপ্রশমনের জ্ঞান অর্থাৎ স্নান করিলে উষ্ণতা প্রশমিত হইবে, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, উহা অনুমান। স্নান উষ্ণতা-প্রশমনের কারণ, উষ্ণতাপ্রশমন স্নানের কার্য্য। এখানে কারণের দ্বারা কার্য্যের অনুমান হইতেছে। কার্য্যকারণভাবনিশ্চয় দর্শনশাস্ত্রসাপেক্ষ। আপত্তি হইতে পারে যে, যাহারা দর্শনশাস্ত্র কখনও দেখে নাই, এমন কি, দর্শনশাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহারাও কার্য্যকারণভাব-নিশ্চয় এবং স্নানদ্বারা উষ্ণতানিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে দর্শনশাস্ত্রের কোনও সহায়তা নাই। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞাতভাবে দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করে। তাহারা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই বটে, কিন্তু পরম্পরাগত ঘটনা বা উপদেশের সাহায্যে প্রকারান্তরে দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াছে। এইজন্যই তাহারা কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় করিতে সক্ষম হয় এবং স্নানদ্বারা উষ্ণতানিবারণের আশা করিয়া থাকে। ফলতঃ কার্য্যকারণভাবনিশ্চয় এবং অনুমানের সাহায্য ভিন্ন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে উদাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

অসম্ভব নহে যে, প্রাণীদিগের বুদ্ধির বিকাশ বা কল্পনা অন্যতম মূল-ভিত্তি করিয়া কোন কোন দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও দর্শনশাস্ত্র ঐ কল্পনাসকলের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন ও পরিমার্জ্জন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, নিরবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ কল্পনাতে লোককে অভ্যস্ত করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব যাঁহারা সমীচীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা জ্ঞাতভাবে হউক, অজ্ঞাতভাবে হউক, দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা লাভ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কেন না, লোকের সমীচীন কল্পনা এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন বস্তুগত্যা ভিন্ন হইতেছে না। দর্শনশাস্ত্র নিজের উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বনস্বরূপ কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতেও

কুণ্ঠিত হয় নাই বলিয়া সাধারণভাষায় "গুরুমারা বিদ্যা" বলিয়া দর্শনশাস্ত্রের একটা অখ্যাতি আছে। যুক্তিপ্রধান দর্শনই অধিকপরিমাণে এই অখ্যাতির ভাজন। সে যাহা হউক, এখন লোকযাত্রানির্ব্বাহের মূলীভূত দর্শনশাস্ত্রের অবান্তরভেদ বা প্রকারভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

দর্শনশাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—নাস্তিকদর্শন ও আস্তিকদর্শন। চার্ব্বাকদর্শন প্রভৃতি নাস্তিকদর্শন, ন্যায়দর্শন প্রভৃতি আস্তিকদর্শন। এস্থলে নাস্তিক ও আস্তিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে অসঙ্গত হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারাই নাস্তিক। ইহা ঠিক নহে। কারণ, তাহা হইলে মীমাংসকাচার্য্য এবং সাংখ্যাচার্য্য নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। কেন না, তাঁহারা ঈশ্বর মানেন না। অধিকন্তু, ঈশ্বর নাই, ইহা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, গীতাতে ভগবান্ তাঁহাদিগকে 'আসুরসম্পদ্‌যুক্ত' বা 'আসুর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'নাস্তিক' বলেন নাই। মীমাংসকাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর মানেন না বটে, কিন্তু উভয়েই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা নিরতিশয় আস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকেরা মীমাংসা ও সাংখ্য উভয় দর্শনেরই যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জৈমিনি বেদের পারদর্শী, তাঁহার দর্শনের কোনও অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে। সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই। সাংখ্যজ্ঞান অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান, এ বিষয়ে সংশয় করা অনুচিত। এতদনুসারে বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহারা আস্তিক; যাঁহারা বেদ মানেন না, তাঁহারা নাস্তিক। আস্তিক ও নাস্তিকের এইরূপ লক্ষণ হইলে বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতিও নাস্তিকদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ, চার্ব্বাকদর্শনের ন্যায় বৌদ্ধাদি দর্শনেও বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই।

যে অর্থ অবলম্বন করিয়া আস্তিক ও নাস্তিক পদ ব্যুৎপাদিত বা নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, সেই অর্থের অনুসরণ করিলে আস্তিক এবং নাস্তিকের লক্ষণ অনায়াসবোধ্য হইতে পারে। যিনি পরলোক মানেন, তিনি আস্তিক, যিনি পরলোক মানেন না, তিনি নাস্তিক—ইহা আস্তিক-

নাস্তিকপদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। চার্ব্বাক পরলোক মানেন না, সুতরাং চার্ব্বাকের দর্শন নাস্তিকদর্শন। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন কি না, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। বৌদ্ধদর্শন কালে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত মত বিস্তৃতরূপে জানিবার উপায় নাই। যতদূর জানা যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয়, প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও তাঁহাদের মতে পরলোক থাকিতে পারে। কোন কোন নৈয়ায়িক কিন্তু বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর্হতেরা পরলোক মানেন। সুতরাং ব্যুৎপত্তি অনুসারে আর্হতদর্শন আস্তিকদর্শনশ্রেণীতে পরিগণিত হইবার যোগ্য। বৈশেষিকাদি দর্শন যে আস্তিকদর্শন, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৌদ্ধাদি দর্শন আস্তিকদর্শন বলিয়া গণ্য হইলে আস্তিকদর্শন অবৈদিক ও বৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। বৌদ্ধ-দর্শন ও আর্হতদর্শনে বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহা অবৈদিক। অন্যান্য সমস্ত আস্তিকদর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যুক্তিপ্রধান ও শ্রুতিপ্রধান। মীমাংসা ও বেদান্ত এই দুইটি দর্শন শ্রুতিপ্রধান। এই দর্শনদ্বয়ে শ্রুতিই প্রধান প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতিই উক্ত দর্শনদ্বয়ের মূলভিত্তি। উহাতে শ্রুত্যর্থ উপপাদন করিবার জন্যই সমস্ত যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল যুক্তিবলে কোন বিষয় অঙ্গীকৃত বা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তদ্ভিন্ন বৈশেষিকাদি অপরাপর দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান। তাহাতে যুক্তিবলেই স্বমত সংস্থাপন এবং পরমতের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। যুক্তিই তাঁহাদের মূলভিত্তি। এইজন্য বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শন ভিন্ন অপর সমস্ত দর্শনের সাধারণ নাম তর্কশাস্ত্র। ঐ সকল দার্শনিকেরা যুক্তিবলে স্বমতবিসংবাদী শ্রুতিসকলের অর্থান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ তাঁহারা দার্শনিক-বিষয়ে শ্রুতির বড়-একটা ধার ধারেন না বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। তর্কবলে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, শ্রুতিতে তাহার বিরুদ্ধ কথা থাকিলে গৌণী বা লক্ষণা বৃত্তির সাহায্যে এবং অন্য উপায়ে যেন-তেন-প্রকারে শ্রুতির অর্থান্তর করিয়া তাহাকে স্বসিদ্ধান্তের অনু-

কূল করিয়া লন। এইজন্যই বৈদান্তিকেরা শ্রুতিবিরুদ্ধ বা শ্রুতিবিপ্লাবক তর্কসকলকে শুষ্কতর্ক ও কুতর্ক আখ্যা প্রদান করিয়া তার্কিকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। কেবল তর্কবলে যে অতীন্দ্রিয় বিষয়সকল স্থিরীকৃত হইতে পারে না, তাহাও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এখন দর্শনশাস্ত্রের অন্যরূপ বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত, এই ছয়টি দর্শন ষড়্দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ষড়্দর্শন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অবান্তর মতবৈলক্ষণ্য থাকিলেও ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন একশ্রেণীর অন্তর্গত হইবার যোগ্য। উভয় দর্শনেই কেবল নিরবচ্ছিন্ন তর্কবলে বক্তব্যবিষয় সমর্থিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যেরা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোন অংশে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও ন্যায়-দর্শনের পদার্থসকল বৈশেষিকদিগের এবং বৈশেষিকদর্শনের পদার্থ-সকল নৈয়ায়িকদিগের অনুমত ও অঙ্গীকৃত। ইহা ন্যায়ভাষ্যকার মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কপিলের দর্শন এবং পতঞ্জলির দর্শন এক-শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে। উভয় দর্শনের সাধারণ নাম সাংখ্য-প্রবচন। কারণ, উভয় দর্শনেই সংক্ষিপ্তসাংখ্যদর্শনোক্ত বিষয়সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং উভয় দর্শন অনায়াসে একশ্রেণীস্থ হইতে পারে। কপিলের দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, প্রত্যুত যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত হইয়াছেন। পতঞ্জলির দর্শনে প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। এইজন্য দার্শনিক আচার্য্যগণ উক্ত দর্শনদ্বয়কে যথাক্রমে নিরীশ্বরসাংখ্যদর্শন ও সেশ্বরসাংখ্যদর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। জৈমিনির ও ব্যাসের দর্শনে বেদবাক্যসকল বিচারিত হইয়াছে। ঐ উভয় দর্শন যে একশ্রেণীস্থ বা এক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষড়্দর্শনের মধ্যে বৈশেষিকাদি দর্শনচতুষ্টয় প্রধানতঃ পদার্থবিচারে এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন শ্রুত্যর্থবিচারে পরিপূর্ণ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-গ্রন্থে মাধবাচার্য্য পঞ্চদশটি দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অন্য গ্রন্থে শাঙ্করদর্শনের বিবরণ দিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংগ্রহ করেন নাই। শাঙ্করদর্শন এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে

সংগৃহীত পঞ্চদশ দর্শন, ইহাদের সমষ্টিতে মাধবাচার্য্যের মতে দর্শনের সংখ্যা হইতেছে ষোড়শ। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের অতিরিক্ত দশখানি দর্শনের নাম দেওয়া যাইতেছে। চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, আর্হতদর্শন বা জৈন-দর্শন, রামানুজদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশপাশুপতদর্শন, শৈবদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বরদর্শন ও পাণিনিদর্শন। তন্মধ্যে রামানুজদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন এবং শৈবদর্শন বেদান্তদর্শনের প্রস্থানবিশেষ মাত্র। সুতরাং সাতখানিমাত্র দর্শন ষড়্‌দর্শনের অতিরিক্ত হইতেছে।

এখন দর্শনশাস্ত্রের রচনাপ্রণালীবিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের বিষয়সন্নিবেশপ্রণালী সমীচীন। এই দুইটি দর্শনে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিন প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ উদ্দেশ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির নাম কীর্ত্তন বা উল্লেখ করিয়া তাহাদের লক্ষণসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। লক্ষণপ্রদর্শনের পরে তাহাদের পরীক্ষা অর্থাৎ উপপত্তি ও প্রতিবাদীদিগের মতের খণ্ডনাদি লিখিত হইয়াছে। বিভাগ অর্থাৎ এক একটি বিষয় কত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, তাহাও দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভাগ উদ্দেশের প্রকার-ভেদ মাত্র। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন প্রথমাধিকারীর পক্ষে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, এইজন্য উহাতে এইরূপ শৃঙ্খলা অবলম্বিত হইয়াছে। অপরাপর দর্শন দ্বিতীয়াদি অধিকারীর পক্ষে অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত-বুদ্ধির পক্ষে, এইজন্য তাহাতে তথাবিধ শৃঙ্খলা অবলম্বন করা হয় নাই। অধ্যেতৃমণ্ডলী সহজে স্থূল বিষয়গুলি আয়ত্ত রাখিতে পারিবে, এই বিবে-চনায় অধিকাংশ দর্শন সূত্রাকারে রচিত হইয়াছে। কোন কোন দর্শন শ্লোকে রচিতও দেখা যায়।

সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ছন্দোনুরোধে অল্পকথায় বাক্যসমাপন করিতে হয় বলিয়া শ্লোকবদ্ধ বাক্যগুলিও সংক্ষিপ্তই হইয়া পড়ে। অতএব উভয়ই কঠিন ও অস্ফুটার্থ। সুতরাং ব্যাখ্যার আবশ্যকতা অনিবার্য্য। দর্শনশাস্ত্রের বিষয়গুলি সূক্ষ্ম ও জটিল। দর্শনকারগণ সরলভাবে অল্প-কথায় তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিলেও বিষয়ের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা নিবন্ধন তাহাতে বিস্তর আপত্তি বা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। সম্ভাবিত

আপত্তি বা আশঙ্কাগুলির নিরাসপূর্ব্বক দর্শনকারের মত সমর্থন করা ও পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া ব্যাখ্যাকারদিগের কার্য্য। এইজন্য মূল-দর্শনের অর্থাৎ সূত্র বা শ্লোকের উপর অনেকপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি নানা-শাখায় বিভক্ত। এস্থলে সূত্রাদির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। সূত্রের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ॥

লঘু অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদ যুক্ত, অনেক অর্থের সূচক ও সর্ব্বতোভাবে সারভূত বাক্যকে পণ্ডিতেরা সূত্র বলেন। এই সূত্র যে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যাখ্যার সাধারণ লক্ষণ এইরূপ—

পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।

পদচ্ছেদ অর্থাৎ সূত্রে কয়টি পদ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া। পদার্থোক্তি অর্থাৎ কোন্ পদের কি অর্থ, তাহার নির্দ্দেশ করা। বিগ্রহ অর্থাৎ সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করা। বাক্যযোজনা অর্থাৎ সমস্ত বাক্যটির বা সূত্রটির অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থ-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা। আক্ষেপের সমাধান অর্থাৎ সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন। ব্যাখ্যার এই পাঁচটি লক্ষণ। বেদেও পদচ্ছেদপ্রদর্শনের জন্য পদপাঠ বা পদগ্রন্থ এবং ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত পাঁচটি বিষয় থাকা উচিত। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে সর্ব্বস্থলে সমভাবে ঐ পাঁচটি বিষয় বর্ণিত হয় নাই। বাক্যযোজনাদ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। লাট্যায়নসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য অগ্নিস্বামী স্থানে স্থানে সূত্রের পদচ্ছেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনাচ্ছলেই পদের অর্থ বলা

হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারেরা আক্ষেপের সমাধানের জন্য স্থলবিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সে স্থলে সচরাচর শেষ কল্পটিই সমীচীন, পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তিযোগ্য। শেষ কল্পটির নির্দ্দেশ করিলেই যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীচীন পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পগুলির উপন্যাস অন্যায় বা অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতীয় আচার্য্যগণ ঐ রীতিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্য ও পরিচালনার জন্য বা কৌশলপ্রদর্শন-অভিপ্রায়ে নানা কল্পের অবতারণা করিয়া থাকেন। মূলদর্শনকর্ত্তারাও যে স্থলে একটি বিষয় সমর্থনের জন্য একাধিক হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে স্থলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হেতু প্রায় অসমীচীন বা আপত্তিযোগ্য। ফলতঃ শিষ্যবুদ্ধি ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য ভারতীয় আচার্য্যগণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর কল্পের অবতারণা করিয়া থাকেন। বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি, ব্যাখ্যাগ্রন্থেরই প্রকারভেদ। বৃত্তিগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং রচনায় গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—

সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারী পদের দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং নিজের প্রযুক্ত পদসকল অর্থাৎ বাক্যও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষ্য। ভাষ্যের রচনা প্রগাঢ়। ভাষ্যের অক্ষরার্থ সহজ, তাৎপর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ আয়াসগম্য। কোন কোন বৃত্তিও ভাষ্যাকারে এবং কোন কোন ভাষ্যও ব্যাখ্যার প্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ভাষ্যের লক্ষণ আদৌ নাই। উদাহরণস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বার্ত্তিকের লক্ষণ এইরূপ—

উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্।

যে গ্রন্থে উক্ত, অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয়, তাহার নাম বার্ত্তিক। অর্থাৎ মূলে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, মূলে যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা পরিব্যক্ত বা ব্যুৎপাদিত এবং মূলে যাহা দুরুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত বলা হইয়াছে, তাহার প্রদর্শন এবং তথাবিধ স্থলে সঙ্গত অর্থ

নির্দ্দেশ করা বার্ত্তিককারের কর্ত্তব্য। কাত্যায়নের বার্ত্তিক পাণিনীয় সূত্রের উপর, উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক বাৎস্যায়নের ভাষ্যের উপর, ভট্ট কুমারিলের তন্ত্রবার্ত্তিক জৈমিনির সূত্র এবং শবরস্বামীর ভাষ্যের উপর রচিত। ফলতঃ বার্ত্তিকগ্রন্থ সূত্র ও ভাষ্যের উপরেই রচিত হইয়া থাকে। বৃত্তি, ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ মূলগ্রন্থের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ ভাষ্যকার প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রন্থের মতানুসারে চলিতে হয়। কিন্তু বার্ত্তিককার সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাষ্যকার প্রভৃতির স্বাধীন চিন্তা হইতেই পারে না। কিন্তু বার্ত্তিকের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বার্ত্তিককারের স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ হইতে পারে।

বার্ত্তিককারের স্বাধীনতার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। মীমাংসাদর্শনে প্রথমতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। তৎপরে, বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রমাণ কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে দর্শনকার জৈমিনি বলিয়াছেন যে, "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্।" অবশ্য প্রশ্নটি জৈমিনির উত্থাপিত নহে, ভাষ্যকার ঐ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তরস্বরূপে জৈমিনির সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই—প্রত্যক্ষশ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতিবাক্য অন-পেক্ষণীয় অর্থাৎ স্মৃতিবাক্যের অপেক্ষা করিবে না, উহা অনাদৃত হইবে। প্রত্যক্ষশ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে স্মৃতিবাক্য দ্বারা শ্রুতির অনুমান করা সঙ্গত। অপৌরুষেয় শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ। স্মৃতি পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষের বাক্য, সুতরাং স্মৃতির প্রামাণ্য মূলপ্রমাণসাপেক্ষ। পুরুষের বাক্য স্বতঃপ্রমাণ নহে, পুরুষবাক্যের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে। কেন না, পুরুষ যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাই অন্যকে জানাইবার জন্য শব্দপ্রয়োগ বা বাক্যরচনা করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ জ্ঞানমূলে শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানটি যথার্থ অর্থাৎ ঠিক হইয়া থাকিলে তন্মূলক বাক্যও ঠিক অর্থাৎ প্রমাণ হইবে। বাক্যপ্রয়োগের মূলীভূত জ্ঞান অযথার্থ অর্থাৎ ভ্রমাত্মক হইয়া থাকিলে তদনুবলে প্রযুক্ত বাক্যও অপ্রমাণ হইবে। স্মৃতিকর্ত্তারা আপ্ত। তাঁহাদের মাহাত্ম্য বেদে কীর্ত্তিত আছে। তাঁহারা লোককে

প্রতারিত করিবার জন্য কোন কথা বলিবেন, ইহা অসম্ভব। এইজন্য তাঁহাদের স্মৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অনুমিত হয়। তাঁহারা বেদবাক্যের অর্থ স্মরণ করিয়া বাক্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম স্মৃতি। স্মৃতিবর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশ অলৌকিক অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বদ্ধ। পূর্ব্বানুভব স্মরণের কারণ। অননুভূত পদার্থের স্মরণ হইতে পারে না। মুনিগণ যাহা স্মরণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে তাঁহাদের অনুভূত হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। বেদ ভিন্ন অন্য উপায়ে অলৌকিক বিষয়ের অনুভব একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং স্মৃতিদ্বারা শ্রুতির অনুমান হওয়া সঙ্গত। স্মৃতিকারেরা যাহা স্মরণ করিয়াছেন, তাহা যে বেদমূলক, বেদ পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অষ্টকাকর্ম্ম স্মার্ত্ত, কিন্তু বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জলাশয়ের খানন ও প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মগুলির আভাসও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের মতে জলাশয়-খানন, প্রপাপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মগুলি দৃষ্টার্থ। কেন না, তদ্দ্বারা লোকের উপকার হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং জলাশয়াদিখানন ধর্ম্মার্থ নহে, লোকোপকারার্থ। লোকোপকার অবশ্য ধর্ম্মার্থ হইবে। স্মৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমূলকতা যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন যে সকল স্মৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহাও অনুমিত হওয়া সর্ব্বথা সমীচীন। অন্নপাক করিবার সময় তণ্ডুলগুলি ফুটিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য পাকস্থালী হইতে দুই-একটি তণ্ডুল তুলিয়া টিপিয়া দেখা হয়। হস্তমর্দ্দিত তণ্ডুল ফুটিয়া থাকিলে অনুমান করা হয় যে, সমস্ত তণ্ডুলগুলিই ফুটিয়াছে। কেন না, সমস্ত তণ্ডুলেই সমানকালে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি ফুটিলে অপরটি না ফুটিবার কোনও কারণ নাই। এই যুক্তির শাস্ত্রীয়নাম স্থালীপুলাকন্যায়। প্রকৃতস্থলেও অনেকগুলি স্মৃতি বেদমূলক—ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থালীপুলাকন্যায় অনুসারে সমস্ত স্মৃতির বেদমূলকতা অনুমিত হইতে পারে। অনেক বেদশাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দার্শনিকেরা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অবশ্যই তাহা পূর্ব্বে ছিল। সুতরাং ঐ বিলুপ্ত বেদবাক্য-মূলক

যে সকল স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মূলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল স্মৃতি অপ্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু যে সকল স্মৃতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ, ভাষ্যকার বলেন তাহা অপ্রমাণ হইবে। কেন না, বেদমূলক বলিয়াই স্মৃতি প্রমাণ। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি বেদমূলক হইতে পারে না, বরং বেদের বিপরীত হইতেছে, সুতরাং অপ্রমাণ। প্রকৃতস্থলে স্মৃতির মূলরূপে শ্রুতির অনুমানও করা যাইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান হইতে পারে না। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির কতিপয় উদাহরণ ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন। একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। জ্যোতিষ্টোমযাগে সদোনামক মণ্ডপের মধ্যে একটি উদুম্বরবৃক্ষের শাখা নিখাত বা প্রোথিত করিতে হয়। ঐ উদুম্বরশাখা স্পর্শ করিয়া উদ্গাতানামক ঋত্বিক সামগান করিবেন, এইরূপ শ্রুতি আছে। সমস্ত উদুম্বরশাখা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে, এইরূপ একটি স্মৃতি আছে। এই স্মৃতি উক্তবেদবিরুদ্ধ। কেন না, সমস্ত উদুম্বরশাখা বস্ত্রবেষ্টিত হইলে উদুম্বরশাখার উপস্পর্শ অর্থাৎ উদুম্বরশাখাসংযুক্ত বস্ত্রের স্পর্শ হইতে পারে বটে, কিন্তু উদুম্বর-শাখার স্পর্শ হইতে পারে না। উদুম্বরশাখার স্পর্শ করিতে হইলে সমস্ত উদুম্বরশাখার বেষ্টন হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্ববেষ্টনস্মৃতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ, অতএব অপ্রমাণ। আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বানুভব না থাকিলে স্মৃতি বা স্মরণ হইতে পারে না; সর্ব্ববেষ্টন বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্ববেষ্টনবিষয়ে পূর্ব্বানুভব হইবার কোনও কারণ নাই। অথচ পূর্ব্বানুভব ভিন্ন স্মরণ অসম্ভব। ভাষ্যকার ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, কোনও ঋত্বিক্ লোভবশতঃ বস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত উদুম্বরশাখা বস্ত্রবেষ্টিত করিয়াছিল। স্মৃতিকর্ত্তা তাহা দেখিয়া, সর্ব্ববেষ্টন বেদমূলক, এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া সর্ব্ববেষ্টনস্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

বার্ত্তিকগ্রন্থে ভাষ্যগ্রন্থ ব্যাখ্যাত এবং সমর্থিত হইলেও বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, স্মৃতিসকল বেদমূলক, ইহা দৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কোনও একটি স্মৃতিবাক্য প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ

হইলেও উহা বেদমূলক নহে, লোভাদিমূলক, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বেদবাক্যসকল নানাশাখাবিপ্রকীর্ণ। এক পুরুষের সমস্ত বেদশাখার অধ্যয়ন একান্ত অসম্ভব। কোন ব্যক্তি কতিপয় শাখা, অপরাপর ব্যক্তিগণ অপরাপর কতিপয় শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইহাও চিন্তয়িতব্য যে, সমস্ত বেদবাক্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে পঠিত হয় নাই। তদ্রূপে পঠিত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে তাহার সুপ্রচার থাকিতে পারিত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রচরদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী বেদবাক্যগুলি ধার্ম্মিকদিগকে অবশ্য অধ্যয়ন করিতে হয়। তদতিরিক্ত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে অপরিপঠিত বেদবাক্যগুলির বিরলপ্রচার দেখিয়া কালে তাহা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় পরমকারুণিক স্মৃতিকারগণ বেদবাক্যগত আখ্যানাদি অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদবাক্যের অর্থসঙ্কলন করিয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

উপাধ্যায় স্বয়ং কোন বেদবাক্য উচ্চারণ না করিয়াও যদি বলেন যে, এই অর্থ বা বিষয় অমুক শাখায় বা অমুক স্থানে পঠিত আছে। তাহা হইলে আপ্ত অর্থাৎ সজ্জন এবং হিতোপদেষ্টা উপাধ্যায়ের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস আছে বলিয়া শিষ্য তাহা যথাযথ বলিয়াই বিবেচনা করেন। সেইরূপ স্মৃতিবাক্যদ্বারাও তদনুরূপ বেদবাক্যের অস্তিত্ব বিবেচিত হওয়া সঙ্গত। মীমাংসকমতে বেদরাশি নিত্য, কাহারও নির্ম্মিত নহে। অধ্যাপকপরম্পরার উচ্চারণ বা পাঠদ্বারা অর্থাৎ কণ্ঠতালু প্রভৃতি প্রদেশে আভ্যন্তরীণ বায়ুর অভিঘাতে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, ঐ ধ্বনি দ্বারা নিত্য বেদের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। যেমন ন্যায়মতে চক্ষুরাদির সন্নিকর্ষবিশেষ অর্থাৎ সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা নিত্য গোত্বাদিজাতির অভিব্যক্তি হয়, আলোকাদি দ্বারা ঘটাদির অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ মীমাংসকমতে কণ্ঠতালু প্রভৃতি প্রদেশে সমুৎপন্ন ধ্বনিবিশেষের দ্বারা নিত্য বেদের অভিব্যক্তি হওয়া অসঙ্গত হইতে পারে না। অধ্যাপকের বা অধ্যেতার ধ্বনিবিশেষের দ্বারা যেমন বেদের অভিব্যক্তি হয়, স্মৃতিকর্ত্তাদিগের স্মরণ দ্বারা সেইরূপ বেদের অভিব্যক্তি হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইবার কারণ নাই। স্মৃতিকর্ত্তারাও একসময় শিষ্যদিগের অধ্যাপনা করিতেন। তখন তাঁহাদের উচ্চারণে বেদের অভিব্যক্তি

হইত, সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে তাঁহাদের স্মরণ কি অপরাধ করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা বেদবাক্যের অভিব্যক্তি হইবে না? সুতরাং ধ্বনিবিশেষের দ্বারা অভিব্যক্ত বেদ এবং স্মৃতিকর্ত্তাদিগের স্মরণদ্বারা অভিব্যক্ত বেদ, উভয়ই সম্পূর্ণরূপে তুল্য, ইহাদের পরস্পর কোনও তারতম্য বা বলাবলভাব হইতে পারে না। স্মৃতার্থ শ্রুতি অর্থাৎ যে শ্রুতির অর্থ মুনিগণকর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াছে, সেই শ্রুতি এবং পঠিত শ্রুতি, এই উভয় শ্রুতিই তুল্যবল। ইহাদের মধ্যে একে অপরের বাধা করিতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে কোন একখানি স্মৃতি যদি আদ্যোপান্ত সমস্তই অবৈদিক হইত, তবে ঐ স্মৃতিখানি কখনও শিষ্টদিগের ব্যবহৃত হইত না। তদ্ভিন্ন অপরাপর বৈদিক স্মৃতিমাত্রই ব্যবহৃত হইত। অবৈদিক স্মৃতিখানি পরিত্যক্ত হইত। বস্তুতঃ কোন স্মৃতিই অবৈদিক নহে। সমস্ত স্মৃতিই কঠ ও মৈত্রায়ণীয় প্রভৃতি শাখাপরিপঠিত-শ্রুতি-মূলক—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বার্ত্তিককার বলেন যে, যখন দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র বেদমূলক, তখন তন্মধ্যপাতী একটি বাক্য—যাহার মূলীভূত বেদবাক্য অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা বেদমূলক নহে, অন্যমূলক অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক বা লোভমূলক—আমাদেব জিহ্বার ত এ কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে নৈয়ায়িকম্মন্য প্রত্যক্ষ অর্থাৎ তাঁহার পরিজ্ঞাত শ্রুতির বিরুদ্ধ হইলেই কোন স্মৃতিবাক্যকে অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করেন, কালান্তরে তাঁহার উপেক্ষিত স্মৃতিবাক্যের মূলীভূত শাখান্তরপঠিত শ্রুতি যখন তাঁহার শ্রবণগোচর বা জ্ঞানগোচর হইবে, তখন তাঁহার মুখকান্তি কিরূপ হইবে? তখন তিনি অবশ্যই লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে। যিনি নিজের জ্ঞানকেই পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করেন অর্থাৎ নিজেকে একরূপ সর্ব্বজ্ঞ ভাবেন, তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার বাধাবাধ-ব্যবস্থাও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ, তিনি নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতির বিরুদ্ধ বলিয়া এক সময়ে যে স্মৃতিবাক্য অপ্রমাণ বা বাধিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, পূর্ব্বে তাঁহার অপরিজ্ঞাত ঐ স্মৃতিবাক্যের মূলীভূত শাখান্তর-পঠিত শ্রুতি সময়ান্তরে জানিতে পারিলে, ঐ স্মৃতিবাক্যকেই আবার প্রমাণ বা অবাধিত বলিয়া তাঁহাকেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বার্ত্তিককার আরও বলেন যে, ভাষ্যকার যে উদুম্বরশাখার সর্ব্ববেষ্টন-স্মৃতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না। শাট্যায়নি-ব্রাহ্মণে প্রত্যক্ষপঠিত শ্রুতিই তাহার মূল। ঔদুম্বরীর উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, এইরূপ প্রত্যক্ষশ্রুতি শাট্যায়নি-ব্রাহ্মণে রহিয়াছে। বার্ত্তিককার এতাবন্মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ঔদুম্বরীবেষ্টনস্মৃতি যদি শ্রুতিমূল হইল, তবে তাহা কোনমতেই স্পর্শশ্রুতিদ্বারা বাধিত হইতে পারে না। কেন না, উভয়ই যখন শ্রুতি, সুতরাং তুল্যবল, তখন কে কাহার বাধা জন্মাইতে পারে? প্রমাণদ্বয় তুল্যকক্ষ বলিয়া বরং বিকল্প হইতে পারে। দর্শপৌর্ণমাস যাগে যবদ্বারা হোম করিবে, ব্রীহিদ্বারা হোম করিবে—এইরূপ দুইটি শ্রুতি আছে। এস্থলে যব ও ব্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষশ্রুতিবোধিত বলিয়া যব-ব্রীহির বিকল্প, ইহা সর্ব্বসম্মত। ইচ্ছানুসারে যব বা ব্রীহি ইহার কোন একটি দ্বারা হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন হইবে। তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও, ঔদুম্বরী বেষ্টন করিবে এবং ঔদুম্বরী স্পর্শ করিবে, এই দুইটি বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও যব-ব্রীহির ন্যায় উভয়ের বিকল্প—এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাষ্যকারের উচিত ছিল। বেষ্টনস্মৃতিকে বাধিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। বেদে যদি আদৌ বিকল্প না থাকিত, তবে স্পষ্ট শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বেষ্টনস্মৃতি অনাদরণীয় হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু বেদে শতশত স্থলে বিকল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বিকল্পস্থলে কল্পদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, ইহা বলাই অধিক। সুতরাং নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেষ্টনস্মৃতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। বস্তুগত্যা কিন্তু প্রকৃতস্থলে বিরোধও হয় না। কেন না, বেষ্টনমাত্র ত স্পর্শশ্রুতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্পর্শনযোগ্য দুইতিন-অঙ্গুলী-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঔদুম্বরীর উত্তরভাগ বেষ্টন করিলে কোনও বিরোধ হইতে পারে না। কেন না, ঔদুম্বরীর উত্তরভাগের স্পর্শ করাই বিধি। 'সর্ব্বা ঔদুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা'—সূত্রকার এরূপ বলেন নাই। 'ঔদুম্বরী পরিবেষ্টয়িতব্যা'—ইহাই সূত্রকারের বাক্য। এখানে 'পরি'শব্দের অর্থ সর্ব্বভাগ অর্থাৎ উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ। ঐ উভয় ভাগ বেষ্টন করাই

সূত্রকারের বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্বস্থান বেষ্টন করা উহার অর্থ নহে। যাজ্ঞিকেরাও ঔদুম্বরীর উভয় ভাগ বেষ্টন করেন বটে, কিন্তু কর্ণমূলপ্রদেশ বেষ্টন করেন না।

বার্ত্তিককার বলেন,—সর্ব্ববেষ্টনবাক্য লোভমূলক, ভাষ্যকারের এ কল্পনাও সমীচীন হয় নাই। কেন না, সমস্ত বেষ্টন না করিয়া মূল ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীদিগের ন্যায় একখানি পরিধানীয় বস্ত্র এবং একখানি উত্তরীয় বস্ত্র এই দুইখানি বস্ত্র দ্বারা ঔদুম্বরীর মূলভাগ ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে, লোভের চরিতার্থতার কি অবশিষ্ট থাকে, যাহার জন্য সর্ব্ববেষ্টন করিবার আবশ্যকতা হইতে পারে। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ঔদুম্বরীর সাক্ষাৎ স্পর্শ কোনরূপেই সম্ভব হয় না। কারণ, প্রথমতঃ কুশদ্বারা ঔদুম্বরীর বেষ্টন করিবার বিধি। পরে কুশবেষ্টিত ঔদুম্বরীকে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। যাজ্ঞিকেরাও তাহাই করিয়া থাকেন। বস্ত্রবেষ্টনই যেন লোভমূলক বলিয়া অপ্রমাণ হইল, কুশবেষ্টন ত আর লোভমূলক বলিবার উপায় নাই। তড়াগ-প্রপাদির উপদেশ দৃষ্টার্থ, ধর্ম্মার্থ নহে, ভাষ্যকারের এরূপ সিদ্ধান্ত করাও ভাল হয় নাই। কেন না, যাহা বেদে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম, ইহা জৈমিনির উক্তি। ভাষ্যকারও তাহা অস্বীকার করেন না। দৃষ্টার্থ হইলেই যে ধর্ম্ম হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। প্রত্যুত তণ্ডুলনিষ্পত্তির জন্য ব্রীহ্যাদির অবহনন, চূর্ণের জন্য তণ্ডুলের পেষণ প্রভৃতি সহস্র সহস্র দৃষ্টার্থ কর্ম্ম বেদবিহিত বলিয়া ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। চার্ব্বাক প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীরা বেদবিহিত অদৃষ্টার্থ কর্ম্মেও দৃষ্টার্থতা কল্পনা করিতে প্রয়াস পায়। অতএব দৃষ্টার্থই হউক আর অদৃষ্টার্থই হউক, বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম—ইহা মীমাংসকেরা অস্বীকার করিতে পারেন না। বার্ত্তিক-কার এবম্প্রকার অনেক হেতু প্রদর্শন করিয়া ভাষ্যকারের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যকারের মত খণ্ডন করিয়া জৈমিনিসূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, যখন স্থির হইল যে, শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ নাই; বিরোধ থাকিলে উহা শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধরূপেই পর্য্যবসিত হয়;

শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধস্থলে বিকল্প হয়, অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন-শ্রুতি প্রতিপাদিত ভিন্ন ভিন্ন কল্পের মধ্যে ইচ্ছানুসারে কোন একটি কল্পের অনুষ্ঠান করিলেই অনুষ্ঠাতা চরিতার্থ হন; তখন যেস্থলে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে ভিন্নভিন্নরূপে কর্ত্তব্য আদিষ্ট হয়, সেস্থলেও অবশ্য যে-কোন-একটিই অনুষ্ঠেয় হইবে। তদবস্থায় প্রয়োগ বা অনুষ্ঠানের নিয়মের জন্য অনুষ্ঠাতাদিগের অত্যন্ত হিতৈষিরূপে জৈমিনি সুহৃদ্ভাবে বলিতেছেন যে, শ্রৌত-স্মার্ত্ত পদার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে শ্রৌতপদার্থের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রৌতপদার্থের সহিত বিরোধ না থাকিলে স্মার্ত্তপদার্থ শ্রৌতপদার্থের ন্যায় অনুষ্ঠেয়। স্মৃতিকার জাবালও ইহাই বলিয়াছেন—

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥

শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই গুরুতরা। অর্থাৎ সে স্থলে শ্রৌত-পদার্থই অনুষ্ঠেয়। অবিরোধস্থলে স্মার্ত্তপদার্থ বৈদিক পদার্থের ন্যায় সাধুগণের অনুষ্ঠেয়। এরূপ ব্যবস্থার হেতু এই যে, সকলেই পরপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা স্বপ্রত্যক্ষের প্রতি সমধিক আস্থাবান্ হইয়া থাকে। স্মৃতির মূলীভূত শাখান্তরবিপ্রকীর্ণ শ্রুতি পরপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুষ্ঠাতা স্বপ্রত্যক্ষ শ্রুতির প্রতি অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য। যব ও ব্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত, সুতরাং বিকল্পিত। কোন অনুষ্ঠাতা যদি উহার একটি অর্থাৎ কেবল যব বা কেবল ব্রীহি অবলম্বনেই চিরজীবন যাগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে যেমন কোনও দোষ হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও শ্রৌত বা স্মার্ত্ত এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটির অনুষ্ঠান শাস্ত্রানুমত হইলেও, কেবল শ্রৌতপদার্থের অনুষ্ঠান করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত জৈমিনিসূত্রের অন্যবিধ ব্যাখ্যান্তর করিয়া বার্ত্তিককার ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই সূত্রদ্বারা শাক্যাদি স্মৃতির ধর্ম্মে প্রামাণ্য নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে।

বার্ত্তিককার অপরাপর অনেক স্থলেও ভাষ্যকারের মত প্রত্যাখ্যাত এবং জৈমিনিসূত্রের অর্থান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সকল স্থলে সূত্রকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন

স্থলে সূত্রকারকে খণ্ডন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্যোতকর মিশ্রও এইরূপ স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, অপরাপর বার্ত্তিকেও অল্পবিস্তর স্বাধীনচিন্তার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈদৃশ স্বাধীনচিন্তার প্রসর যে প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয়, তাহা মনীষিগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। সূত্র, বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী ভিন্ন আর-এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, তাহার নাম প্রকরণ। প্রকরণের লক্ষণ এইরূপ কথিত আছে—

শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥

শাস্ত্রের একদেশের সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য কোন-একটি বিষয় অবলম্বনে প্রণীত, অথচ শাস্ত্রের উদ্দেশ্যসম্পাদনবিষয়ে অবস্থিত, এতাদৃশ গ্রন্থবিশেষের নাম প্রকরণ। উদয়নাচার্য্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ত্ববিবেক, গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি, চিৎসুখস্বামীর তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ। ইংরাজীভাষায় মনোগ্রাফ্‌ও প্রকরণগ্রন্থবিশেষ।

দার্শনিক টীকাকারগণ, বিশেষতঃ নব্যন্যায়ের টীকাকারগণ কিরূপ বুদ্ধিপরিচালনা করিয়াছেন, কিরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিরূপ পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। অনেকেই জানেন যে, ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমিতি হয়, বহ্নি-দর্শনে ধূমের অনুমিতি হয় না। অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অবশ্য অপেক্ষিত। ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান এবং তদ্দ্বারা যে অপর বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞান অনুমিতি বলিয়া কথিত। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে—এইরূপ ব্যাপ্তি-জ্ঞান অনুমান। উত্তরকালে ধূমদর্শনে বহ্নিবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান অনুমিতি। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে অনুমিতি হয় না। ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমিতি হয়, ঘটের অনুমিতি হয় না। কারণ, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, ঘটের ব্যাপ্তি নাই। ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিশেষরূপে আপ্তি কিনা সম্বন্ধ। সম্বন্ধের বিশেষত্ব অব্যভিচার। ব্যভিচার কিনা তদ্ব্যতিরেকে অবস্থিতি। অব্যভিচরিত সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। যাহার সম্বন্ধ, তাহাকে সম্বন্ধের প্রতিযোগী বলে। যাহাতে ঐ সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে সম্বন্ধের অনুযোগী

বলে। এই প্রতিযোগি-অনুযোগি-ভাব অনুভবসিদ্ধ। ‘যোগ’শব্দের অর্থ সম্বন্ধ, যোগী কিনা সম্বন্ধী। ‘প্রতি’শব্দের অর্থ প্রতিকূল, ‘অনু’শব্দের অর্থ অনুকূল। প্রতিযোগী কিনা প্রতিকূল সম্বন্ধী, অনুযোগী কিনা অনুকূল সম্বন্ধী। ঘটত্ব ও ঘটের সম্বন্ধ সমবায়। এই সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘটত্ব, অনুযোগী ঘট। কেন না, ঘটত্বের সমবায় ঘটত্বে থাকে না, ঘটে থাকে। সুতরাং ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী বটে, কিন্তু প্রতিকূল সম্বন্ধী। কেন না, ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়াও তাহার আশ্রয় হয় না, তাহাকে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। এইজন্য ঘটত্ব সমবায়ের প্রতিযোগী। ঘট কিন্তু সমবায়ের অনুকূল সম্বন্ধী। কেন না, সমবায় ঘটাশ্রিত। এইজন্য ঘট সমবায়ের অনুযোগী।

মনুষ্য আসনে উপবেশন করে, সুতরাং মনুষ্য এবং আসনের সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী মনুষ্য, অনুযোগী আসন। এইজন্য মনুষ্য আসনে আছে, এইরূপ অনুভব হয়, আসন মনুষ্যে আছে, এরূপ অনুভব হয় না। বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ধূমে আছে, এইজন্য বহ্নি ও ধূম যথাক্রমে ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগী। ব্যাপ্তির প্রতিযোগীর অপর নাম ব্যাপক এবং ব্যাপ্তির অনুযোগীর অপর নাম ব্যাপ্য। বহ্নি ধূমের ব্যাপক, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমিতি হইয়া থাকে। কেন'না, ব্যাপ্যের সত্তাতে ব্যাপকের সত্তা অবশ্যম্ভাবিনী। ধূমের সত্তাতে বহ্নির সত্তা অবশ্যই থাকিবে, কেন না, বহ্নি কারণ, ধূম কার্য্য। কারণ ভিন্ন কার্য্য হওয়া একান্ত অসম্ভব। এইজন্য ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমিতি হয়। কিন্তু ব্যাপকের সত্তাতে ব্যাপ্যের সত্তা অবশ্যম্ভাবিনী নহে। অয়োগোলকে অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নির সত্তা আছে। কেন না, তৎসংযোগে দাহ্যবস্তু দগ্ধ হইয়া যায়। অয়োগোলকে বহ্নির সত্তা আছে বটে, কিন্তু ধূমের সত্তা নাই—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বস্তুতঃ বহ্নি সর্ব্বকালে ধূম উৎপাদন করে না, কালবিশেষে অবস্থাবিশেষে করিয়া থাকে, সুতরাং বহ্নির সত্তাতে ধূম অবশ্যই থাকিবে, ইহা হইতে পারে না। ধূমের সত্তাতে কিন্তু বহ্নির সত্তা না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহ্নির অনুমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক বহ্নি ব্যাপ্য ধূমের অনুমিতির কারণ নহে। অয়োগোলকে দৃষ্ট হইয়াছে

যে, বহ্নি আছে অথচ ধূম নাই। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির অনেকগুলি লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার প্রথম লক্ষণটি এইরূপ—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।" ইহার মোটামুটি তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেই হেতুসাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি হয়, তাহার নাম সাধ্য। যদ্দর্শনে অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এখানে বহ্নি সাধ্য, ধূম হেতু। বহ্নির অভাব জলহ্রদাদিতে আছে, তথায় ধূম থাকে না। সুতরাং ধূম বহ্নিব্যাপ্য। অর্থাৎ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে। "ধূমবান্ বহ্নেঃ"—এখানে সাধ্য ধূম। অয়োগোলকে ধূমের অভাব আছে, অথচ তথায় বহ্নি আছে। অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নহে, বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই।

লক্ষণটি দার্শনিক প্রণালীতে বুঝিতে হইলে, এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। সম্বন্ধের যেরূপ প্রতিযোগী অনুযোগী আছে, অভাবেরও সেইরূপ প্রতিযোগী অনুযোগী আছে। যাহার অভাব, সে অভাবের প্রতিযোগী। যাহাতে অভাব থাকে, সে অভাবের অনুযোগী বা অধিকরণ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা, অনুযোগীর ভাব বা ধর্ম্ম অনুযোগিতা। প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীতে থাকে, অতএব প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিনিষ্ঠ বলা যায়। কেন না, নিপূর্ব্ব স্থিত্যর্থ স্থাধাতু হইতে 'নিষ্ঠ'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা, অভাবের। অতএব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা অভাব-নিরূপ্য বা অভাব-নিরূপিত। এবং অভাব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার নিরূপক। নিরূপ্য-নিরূপক-ভাব অনুভবসিদ্ধ। ভূতলে ঘটের অভাব। এস্থলে অভাবের প্রতিযোগী ঘট ও অনুযোগী ভূতল। অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটনিষ্ঠ, অনুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ। অভাব ঘটনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার নিরূপক। যাহা কোন আধারে স্থিত হয়, তাহাকে বৃত্তি বলে। বৃত্তির ভাব বা ধর্ম্ম বৃত্তিত্ব। বৃত্তিত্ব অর্থেও বৃত্তিশব্দ ব্যবহৃত হয়। বৃত্তিত্ব আধেয়ত্ব। যে আধার বা অধিকরণে আধেয়পদার্থ থাকে, আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব সেই আধার বা অধিকরণ দ্বারা নিয়মিত,

সুতরাং উহা অর্থাৎ বৃত্তিত্ব সেই-অধিকরণ-নিরূপিত। অতএব 'সাধ্যাভাব'-শব্দের অর্থ হইল—সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব এই অভাবের অধিকরণ হইল সাধ্যাভাববান্। 'অবৃত্তিত্ব'শব্দের অর্থ বৃত্তিত্বের অভাব। বৃত্তিত্ব অবশ্যই সাধ্যাভাবের অধিকরণ-নিরূপিত হইবে তাহা হইলে "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"—এই লক্ষণের অর্থ হইতেছে যে, সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপক যে অভাব, সেই অভাবের অধিকরণ নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব, সেই বৃত্তিত্বের অভাব, ব্যাপ্তি। "বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এস্থলে সাধ্য বহ্নি। সুতরাং বহ্নিনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব হইল বহ্নির অভাব। এই অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি। তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই—ধূমে তাদৃশ বৃত্তিত্বের অভাব আছে। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে। ইহা স্থির হইল।

টীকাকারেরা এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার সমাধান করিয়াছেন। একটিমাত্র আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে। ন্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধের নাম সমবায়, তদ্ভিন্ন দ্রব্যদ্বয়ের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। বহ্নি ও বহ্নির অবয়বের সম্বন্ধ সমবায়। বহ্নি ও পর্ব্বতাদির সম্বন্ধ সংযোগ। বহ্নি সমবায়সম্বন্ধে কেবলমাত্র স্বাবয়বে, এবং সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতাদিতে বর্ত্তমান থাকে। বহ্নি সমবায়সম্বন্ধে পর্ব্বতাদিতে কখনও থাকে না, থাকিতে পারে না। সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি নাই—ইহা ধ্রুবসত্য। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে না, সেখানে অবশ্যই সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর অভাব থাকে। অতএব সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে, অথচ তথায় ধূমও আছে। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না। কেন না, সমবায়সম্বন্ধে যে বহ্নির অভাব, পর্ব্বতও তাহার অধিকরণ বটে। কিন্তু পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব ধূমে নাই। পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বই ধূমে রহিয়াছে। আরও এক কথা। সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে আছে বলিয়া সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই সত্য, কিন্তু পার্ব্বতীয় বহ্নিই সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে। মহানসে অর্থাৎ পাকশালায় যে বহ্নি আছে, সে বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে পর্ব্বতে নাই। কেন না, মহানসীয় বহ্নির সংযোগ মহানসেই আছে,

মহানসীয় বহ্নির সংযোগ কোনক্রমেই পর্ব্বতে থাকিতে পারে না। সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে মহানসীয় বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে, তাহার আর ভুল নাই। মহানসীয় বহ্নিও বহ্নি। পর্ব্বতও ঐ অভাবের অধিকরণ, অথচ পর্ব্বতে ধূম রহিয়াছে। এতাবতাও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না।

এই আপত্তির এইরূপ সমাধান করা হইয়াছে—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এস্থলে পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্য, ধূম হেতু। এখানে সমবায়সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, সংযোগসম্বন্ধেই বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্নির সংযোগ বা সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি আছে, ধূমদর্শনে ইহাই অনুমিত হয়। কেন না, কেবলমাত্র বহ্নির অবয়বেই সমবায়সম্বন্ধে বহ্নি থাকে। অবয়ব ভিন্ন আর সমস্ত স্থলেই সংযোগসম্বন্ধেই বহ্নি থাকে, সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, সেখানে সেই সম্বন্ধে সেই বস্তু সাধ্য হইবে, ইহা সহজবোধ্য। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, সেখানে সে সম্বন্ধে সে বস্তু সাধ্য হইতেই পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যের অভাব বলিতে যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব বহ্নির অবয়বে এবং যে প্রদেশে বহ্নি নাই, সেই প্রদেশে আছে। বহ্নির অবয়ব বা বহ্নিশূন্য প্রদেশে ধূমও থাকে না। সুতরাং সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, তন্নিরূপিত-বৃত্তিত্ব ধূমে নাই। অতএব সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে থাকা সত্ত্বেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকার কোন বাধা হইতে পারে না। 'বহ্নিমান্'—এস্থলে শুদ্ধ-বহ্নিত্বরূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়-বহ্নিত্বরূপে বহ্নি সাধ্য হয় নাই। কেন না, 'বহ্নিমান্'—এস্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্বেরই প্রতীতি হয়, মহানসীয়-বহ্নিত্বের প্রতীতি হয় না। 'পর্ব্বতে মহানসীয়বহ্নির্নাস্তি'—অর্থাৎ পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নি নাই—এইরূপ প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু 'পর্ব্বতে বহ্নির্নাস্তি'—অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্নি নাই—এইরূপ প্রতীতি হয় না। তাহা হইলে পর্ব্বতে মহানসীয়-বহ্নির অভাব থাকিলেও, 'বহ্নির অভাব নাই', ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মহানসীয়-বহ্নিত্বরূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে

আছে, কিন্তু শুদ্ধ-বহ্নিত্বরূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। শুদ্ধ-বহ্নিত্বরূপেই কিন্তু পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়-বহ্নিত্বরূপে সাধ্য হয় নাই। যেরূপে সাধ্য হয়, সেইরূপে সাধ্যের অভাব ব্যাপ্তিলক্ষণস্থ 'সাধ্যাভাব'-শব্দের অর্থ। সুতরাং পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকিলেও, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিবার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না।

'সাধ্যাভাব'শব্দের অর্থ নব্যন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ বলিতে হয়—সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবই 'সাধ্যাভাব'শব্দের অর্থ। সাধ্যের ধর্ম্ম সাধ্যতা। সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। সাধ্য অংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। কেন না, ঐ সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ কিনা পরিচয় বা নিয়মন করিতেছে। সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ বহ্নিগত সাধ্যতা এবং ঘটগত সাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কেন না, বহ্নিগত সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব, ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক ধর্ম্ম ঘটত্ব। অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহাকে অবচ্ছিন্ন কহে। সাধ্যতার যেমন অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম আছে, প্রতিযোগিতারও সেইরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগসম্বন্ধ, তদবচ্ছিন্ন নহে। মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয়বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে শুদ্ধবহ্নিত্ব, তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দ্বিবিধ অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোনও ক্ষতি হইতে পারে না। কেন না, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা মহানসীয়বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে থাকিলেও সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং শুদ্ধবহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে নাই।

যে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদর্শিত হইল, তাহাতেই মনীষিগণ বুঝিতে পারিবেন যে, নব্য নৈয়ায়িকগণ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতা ও অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রে এক অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন,—দর্শনশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ন্যায়ের সহিত নব্য ন্যায়ের তুলনা করিলে ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

চতুর্থ লেক্‌চর।

বৈশেষিকদর্শন।

সংক্ষেপে দর্শনসকলের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে প্রথমতঃ বৈশেষিকদর্শনের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই দর্শন কণাদ-মহর্ষি-প্রণীত। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কর্ত্তন করিয়া লইলে শস্যক্ষেত্রে যে ধান্যগুলিকাগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা এক একটি করিয়া তুলিয়া লইতেন এবং তাহাই আহার করিতেন বলিয়া, জীবিকার কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা 'কণাদ'নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইজন্য কোন কোন দার্শনিক কণভক্ষ বলিয়া তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহা করুন, কিন্তু ঐরূপ কষ্টকর জীবিকা ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। ঐরূপ জীবিকা উৎকৃষ্ট তপস্যা বলিয়া প্রশংসিত। বুঝা যাইতেছে যে, বৈশেষিক-দর্শনকর্ত্তার 'কণাদ'নামটি প্রকৃত নাম নহে। জীবিকানুসারে তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম উলুক। এইজন্য তাঁহার নামানুসারে বৈশেষিকদর্শনের অপর দুইটি নাম কাণাদদর্শন ও ঔলুক্য-দর্শন। কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান্ কণাদ মহেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে বৈশেষিকদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যও এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ইদানীং দুইএকখানি নূতন ভাষ্য রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈশেষিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য এখন দুষ্প্রাপ্য। লঙ্কেশ্বর রাবণ এই দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকার, ইহা বেদান্তের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। বেদান্ত-দর্শনে বৈশেষিকমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য রাবণভাষ্যের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকের মতে প্রশস্তপাদাচার্য্যের পদার্থ-ধর্ম্মসংগ্রহ বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্য, কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। পদার্থ-

ধর্ম্মসংগ্রহে সূত্র ব্যাখ্যাত হয় নাই। সূত্রের তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। প্রশস্তপাদাচার্য্য ও তাঁহার গ্রন্থ সংগ্রহনামেই অভিহিত করিয়াছেন, ভাষ্যনামে অভিহিত করেন নাই। পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের প্রামাণিক টীকাকার উদয়নাচার্য্য স্বকৃত টীকায় বলিয়াছেন যে, সূত্র অত্যন্ত কঠিন, ভাষ্য অত্যন্ত বিস্তৃত, এইজন্য সরলতা ও সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে পদার্থধর্ম্ম-সংগ্রহ বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ যে ভাষ্য নহে, উদয়নাচার্য্যের মতে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে সমস্ত বৈশেষিকদর্শনের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে ও যোগ্যতার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকন্তু মূলদর্শনে অনুক্ত জগতের সৃষ্টিসংহারপ্রণালী সমীচীনভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী এবং শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। বৈশেষিকদর্শনের যে সকল গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রশস্তপাদাচার্য্যের পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রামাণিক। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ উহাকে আকর-গ্রন্থ অর্থাৎ একপ্রকার মূলগ্রন্থ বলিয়া উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থসকলের মধ্যে বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের কিরণাবলীপ্রকাশ, লীলাবতী-প্রকাশ এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের কিরণাবলীরহস্য, লীলাবতীরহস্য প্রশংসিত টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার নাতিপ্রাচীন হইলেও সমীচীন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কণাদসূত্রবিবৃতি নামে বৈশেষিকদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার শেষভাগে তিনি ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রীতি অনুসারে বৈশেষিকদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে সারসংগ্রহ যোজনা করিয়াছেন, তাহা পাঠার্থীদিগের পক্ষে উপাদেয়। উপস্কারগ্রন্থে বৃত্তিকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্তিগ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত বৈশেষিকবার্ত্তিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্ত বিরলপ্রচার। নব্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব এবং প্রসরবৃদ্ধিতে প্রাচীন সমীচীন গ্রন্থাবলী বিলুপ্ত এবং অন্যান্য দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সঙ্কোচ হইয়া পড়িয়াছে, উহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। নব্যন্যায়ের যথেষ্ট উপকারিতা থাকিলেও তন্নিবন্ধন

যে পূর্ব্বোক্ত অপকার হইয়াছে, তাহার ভুল নাই এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহা অমার্জ্জনীয়।

মহর্ষি কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী কি সপ্তপদার্থবাদী, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। তিনি উদ্দেশসূত্রে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রটি এই—

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্‌দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।

ধর্ম্মবিশেষ অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্মোপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যরূপে অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্ম কোন্ কোন্ পদার্থের সমান ধর্ম্ম, কোন্ ধর্ম্মই বা কোন্ কোন্ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তদ্রূপে, তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি হয়। কণাদ উদ্দেশসূত্রে অভাবের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু স্থলান্তরে অভাবের সম্বন্ধে আলোচনাদি করিয়াছেন। ইহাই মতভেদের কারণ। উদ্দেশসূত্রে ষট্‌পদার্থের কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা করেন, কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী; আবার স্থলান্তরে অভাবসম্বন্ধে আলোচনাদি করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনি সপ্তপদার্থবাদী। ন্যায়ভাষ্যকারও কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন বোধ হয়। প্রমেয়সূত্রের অর্থাৎ ন্যায়মতের প্রমেয় পদার্থগুলি গোতমের যে সূত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে—

অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ম্।

সূত্রনির্দ্দিষ্টের অতিরিক্তও দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় প্রমেয় আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে ন্যায়ভাষ্যকার ষট্ প্রমেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের একটি সূত্র এই—

ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ।

বৈশেষিকাদির ন্যায় আমরা ষট্‌পদার্থবাদী নহি। সাংখ্যসূত্রকারের মতে বৈশেষিক যে ষট্‌পদার্থবাদী, তাহা তাঁহার উক্তিদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। একটি প্রামাণিক লোকগাথা প্রচলিত আছে। তাহা এই—

ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতু কামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্গমনোপমম্॥

ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ষট্‌পদার্থবর্ণনা, সাগরগমনেচ্ছু ব্যক্তির হিমালয়গমনের ন্যায় উপহাসাস্পদ। এই গাথাদ্বারা যে কণাদের প্রতিই কটাক্ষ করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন না, কণাদ—

অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ—

এখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব, প্রথম সূত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে ষট্‌পদার্থের বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল কণাদ বলিয়া নহেন, সাংখ্য ও মীমাংসাদি দর্শনকারদের মতেও 'অভাব'নামে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই, অথচ তাঁহাদের দর্শনে অভাবের বিস্তর উল্লেখ আছে। অভাব-নামক কোন পদার্থ না থাকিলে অভাবের উল্লেখ কিরূপে থাকিতে পারে, এ রহস্যের উদ্ভেদ প্রায় কেহই করেন নাই। কিন্তু মীমাংসাচার্য্য ভট্ট এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন—

ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।

কোনরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থই অপর ভাবপদার্থের অভাবরূপে ব্যবহৃত হয়। অভাব আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকও নহে, পদার্থান্তরও নহে। একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যে সময়ে ভূতলে ঘট থাকে, সে সময়ে ভূতলে ঘটাভাবের ব্যবহার হয় না; ভূতলে ঘট আছে, এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ঘটটি স্থানান্তরিত করিলে ভূতলে ঘট নাই, বা ঘটাভাব আছে—এইরূপ অনুভব বা ব্যবহার হইয়া থাকে। মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, ভূতলে ঘট থাকিলে ঘটের ব্যবহার হয়, আর কেবলমাত্র ভূতলের বিদ্যমানতাকালে ঘটাভাবের ব্যবহার হয়। অতএব ঘটের অভাব কেবলমাত্র ভূতল বা ভূতলের কৈবল্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, অভাব পদার্থ বটে, কিন্তু 'অভাব'নামে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নাই। একবিধ ভাবপদার্থই অন্যবিধ ভাব-পদার্থের অভাবরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে সকল আচার্য্যেরা কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী মনে করিয়াছেন,

তাঁহাদের মত প্রদর্শিত হইল। যাঁহারা তাঁহাকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মত প্রদর্শিত হইতেছে। প্রশস্ত-পাদাচার্য্যই এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রশস্তপাদাচার্য্যের গ্রন্থেই প্রথমতঃ প্রকারান্তরে কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন—"দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানামভাব-সপ্তমানাম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এইগুলি পদার্থ এবং অভাব সপ্তম পদার্থ। এই সাতটি পদার্থ— ইহা এককালে না বলিয়া, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থ, অভাব সপ্তম পদার্থ, এইরূপ বাক্যভঙ্গীর তাৎপর্য্য এই যে, কণাদ ষট্‌পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উদ্দিষ্ট ষট্‌পদার্থ প্রথমতঃ পৃথক্‌রূপে কথিত হইয়াছে। কণাদের দর্শনের পর্য্যালোচনা করিলে অভাবপদার্থও মানিতে হয় বলিয়া অভাবপদার্থ সপ্তমপদার্থরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বল্লভাচার্য্য কণাদের উদ্দেশসূত্রে ষট্‌পদার্থের কীর্ত্তনের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে—

অভাবশ্চ বক্তব্যো নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বাৎ ভাবপ্রপঞ্চবৎ। কারণাভাবেন কার্য্যাভাবস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাদুপযোগিত্বসিদ্ধেঃ।

নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির জন্যই ষট্‌পদার্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাবপ্রপঞ্চ অর্থাৎ দ্রব্যাদির ন্যায় অভাবও নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, অতএব ভাব-প্রপঞ্চের ন্যায় অভাবও বলিতে হইবে বা বলা উচিত। কারণের অভাব হইলে কার্য্যেরও অভাব হয়, ইহা সর্ব্বসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অভাব, সুবর্ণের অভাবে কুণ্ডলের অভাব ইত্যাদি, সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে দুঃখের অভাব সম্পন্ন হয়। দুঃখের অভাব মুক্তি, মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে, সুতরাং দুঃখের অভাব হইবে। এইরূপে অভাব নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির উপযোগী। সুতরাং ভাবপ্রপঞ্চের ন্যায় অভাবও বক্তব্য। "অভাবশ্চ বক্তব্যঃ"—এই লিপিভঙ্গী দ্বারা যেন জোর করিয়া কণাদের মুখ হইতে অভাবেরও কথা বাহির করাইয়া লওয়া হইয়াছে— ইহা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞেরা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। অর্থাৎ কণাদ

অভাবপদার্থ বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে অভাবপদার্থও বলিতে হইবে, এতদ্দ্বারা বল্লভাচার্য্য প্রকারান্তরে যে কণাদের ন্যূনতা-প্রদর্শন ও তাহার সংশোধন অথবা বিনয়ের সহিত অত্যন্ত গূঢ়ভাবে কণাদকে একটুকু উপহাস করিয়াছেন, মনোযোগপূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যের লিপিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পদার্থ-ধর্ম্মসংগ্রহের টীকাকার উদয়নাচার্য্য কিরণাবলীনামক টীকায় অভাবের সপ্তমপদার্থত্ব সমর্থন করিয়া উদ্দেশসূত্রে ষট্‌পদার্থমাত্রকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন—

এতে চ পদার্থাঃ প্রধানতয়োদ্দিষ্টাঃ। অভাবস্তু স্বরূপবানপি নোদ্দিষ্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বান্ন তু তুচ্ছত্বাৎ।

এই ষট্‌পদার্থ প্রধানরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অভাবপদার্থ বস্তুসত্ত্যা বিদ্যমান হইলেও, এস্থলে তাহার উদ্দেশ করা হয় নাই। কারণ, দ্রব্যাদির ন্যায় স্বরূপতঃ অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না। প্রতিযোগিনিরূপণ দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হয়। ঘটের অভাব, পটের অভাব ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগিভেদেই অভাবের ভেদ হইয়া থাকে। এইজন্য অভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ ষট্‌পদার্থের উদ্দেশ করা হইয়াছে। অভাবের নিরূপণ প্রতিযোগিনিরূপণের অধীন অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ ষট্‌পদার্থ নিরূপিত হইলে অনায়াসে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে বলিয়া অভাবের উদ্দেশ করা হয় নাই। অভাব তুচ্ছ অর্থাৎ অভাবনামে কোনও পদার্থ নাই বলিয়া অভাবের উদ্দেশ করা হয় নাই—ইহা প্রকৃত কথা নহে। পরবর্ত্তী সমস্ত গ্রন্থে বৈশেষিকমতে অভাবের সপ্তমপদার্থত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালে এই মতের একাধিপত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব বর্ত্তমান প্রস্তাবে অভাব সপ্তম পদার্থ, এই মতেরই অনুসরণ করা হইবে।

মুক্তির জন্য আত্মার শ্রবণ ও মননাদি বিহিত। মনন অনুমানসাধ্য বা অনুমানরূপ। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীন। ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থতত্ত্বজ্ঞান-সাপেক্ষ। সুতরাং পদার্থতত্ত্বজ্ঞান, সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরা নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কারণ। বৈশেষিকদর্শনে ৩৭০টি সূত্র আছে। সূত্রগুলি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি দুইটি করিয়া আহ্নিক

আছে। আহ্নিক একপ্রকার পরিচ্ছেদ। দর্শনকার এক এক দিনে যে সূত্রগুলি রচিয়াছেন, তাহাই এক এক আহ্নিক নামে অভিহিত হইয়াছে। "অহ্না নির্বৃত্তো গ্রন্থ আহ্নিকঃ।" বুঝা যাইতেছে যে, মহর্ষি কণাদ কুড়িদিনে বৈশেষিকদর্শন রচনা করিয়াছেন। যাহা রচনা করিতে কুড়িদিন সময় লাগিয়াছিল, দুই-এক দিনে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা হইতে পারে না, তাহা অনায়াসবোধ্য। সে যাহা হউক, প্রথমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিমান্ অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, দ্বিতীয়াহ্নিকে সামান্য বা জাতি এবং বিশেষ পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে 'ভূত'পদার্থ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, দ্বিতীয়াহ্নিকে কাল ও দিক্; তৃতীয়াধ্যায়ের আহ্নিকদ্বয়েই আত্মার নিরূপণ, অধিকন্তু দ্বিতীয়াহ্নিকে মনেরও নিরূপণ করা হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে জগতের মূলকারণ ও কতিপয় প্রত্যক্ষের কারণ, দ্বিতীয়াহ্নিকে শরীর বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে শারীরিক কর্ম্ম, দ্বিতীয়াহ্নিকে মানসিক কর্ম্ম; ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে দান ও প্রতিগ্রহ, দ্বিতীয়াহ্নিকে আশ্রমচতুষ্টয়ের উপযোগী ধর্ম্ম; সপ্তমাধ্যায়ের আহ্নিকদ্বয়েই রূপাদি গুণ এবং দ্বিতীয়াহ্নিকে সমবায়েরও নিরূপণ করা হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রত্যক্ষজ্ঞান, দ্বিতীয়াহ্নিকে জ্ঞানসাপেক্ষ জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়; নবমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে অভাব এবং কতিপয় প্রত্যক্ষ-কারণ, দ্বিতীয়াহ্নিকে লৈঙ্গিক বা অনুমান ও স্মৃতি প্রভৃতি; দশমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে সুখদুঃখ ও দ্বিতীয়াহ্নিকে সমবায়িপ্রভৃতি কারণত্রয় বিবেচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আরও অনেক বিষয় স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে।

যে সপ্তপদার্থের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সূত্রোদ্দিষ্ট ষট্‌পদার্থ অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, ভাবপদার্থ এবং অনুদ্দিষ্ট সপ্তমপদার্থ অভাবপদার্থ বলিয়া অভিহিত। যে পদার্থে কোন-না-কোন একটি গুণ অবশ্যই থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না, তাহার নাম দ্রব্যপদার্থ। অথবা যে পদার্থে দ্রব্যত্বজাতি থাকে, তাহার নাম দ্রব্য। যে সামান্য বা জাতি গুণবৃত্তি নহে, অথচ গগনবৃত্তি, সেই সামান্য বা জাতিই দ্রব্যত্ব। সত্তানামে একটি সামান্য বা

জাতি আছে। ঐ সামান্য গগনবৃত্তি বটে, কিন্তু গুণবৃত্তি বলিয়া তাহা দ্রব্যত্ব নহে। দ্রব্যপদার্থ নয়প্রকার—ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। ক্ষিতি বা পৃথিবী, অপ্ বা জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ, এই পাঁচটি দ্রব্যকে পঞ্চভূত বলে, অর্থাৎ এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞা 'ভূত'। যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশেষ গুণ থাকে, তাহাকেই ভূত বলা যায়। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ বিশেষ বিশেষ গুণ। অথচ ঐ সকল গুণ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সুতরাং পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এগুলি ভূত বলিয়া কথিত। জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ বটে, কিন্তু জ্ঞান মনোগ্রাহ্য, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারাই জ্ঞান জানিতে পারা যায়, কোন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান জানিতে পারা যায় না, এইজন্য আত্মাকে ভূত বলা যায় না।

যাহাতে গন্ধ আছে, অর্থাৎ যাহাতে গন্ধের অত্যন্তাভাব নাই, অথবা যাহাতে পৃথিবীত্বজাতি আছে, তাহাই পৃথিবী। করকাতে অসমবেত, ঘটাদিতে সমবেত জাতির নাম পৃথিবীত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব জাতি করকাতেও সমবেত, করকাতে অসমবেত নহে, গুণত্বাদি জাতি করকাতে অসমবেত হইলেও ঘটাদিতে সমবেত নহে। এইজন্য সত্তা, দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদি জাতিকে পৃথিবীত্ব বলা যাইতে পারে না।

ফলপুষ্পাদি সমস্তই পার্থিব পদার্থ। পৃথিবী ভিন্ন অপর কোন দ্রব্যের গন্ধ নাই। সময়ে সময়ে জল ও বায়ুতে যে গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, ঐ গন্ধও জলগত ও বায়ুকর্তৃক আনীত পার্থিবাংশের, জলের বা বায়ুর নহে। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্গন্ধ জল যন্ত্রযোগে পরিস্কৃত হইলে, তাহাতে কোনও গন্ধ অনুভূত হয় না। কেন না, গন্ধের উপাদান পার্থিবাংশ যন্ত্রযোগে অপসারিত হইয়া যায়। এইজন্য সমস্ত জল ও সমস্ত বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি হয় না। সত্য বটে, পাষাণে কোনও গন্ধ উপলব্ধ হয় না, কিন্তু পাষাণেও গন্ধ আছে। তাহা উদ্ভূত বা উৎকট নহে বলিয়া আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না। পাষাণে অনুদ্ভূত বা সূক্ষ্মরূপে গন্ধ আছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পাষাণের ভস্মে স্পষ্টরূপে গন্ধের উপলব্ধি হয়। পাষাণের ভস্ম অবশ্য পাষাণের উপাদানে

উৎপন্ন। অর্থাৎ যে পরমাণু হইতে পাষাণের উৎপত্তি, সেই পরমাণু হইতেই পাষাণভস্মেরও উৎপত্তি। পাষাণের আরম্ভক বা উপাদান পরমাণুই পাষাণভস্মেরও আরম্ভক বা উপাদান। পাষাণের আরম্ভক পরমাণুতে গন্ধ না থাকিলে পাষাণভস্মে গন্ধ থাকিতে পারে না। পাষাণ-ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি হইতেছে, সুতরাং পাষাণের আরম্ভক পরমাণুতেও গন্ধ আছে। অতএব পাষাণেও অবশ্য গন্ধ আছে। ঐ গন্ধ উৎকট নহে বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, এইমাত্র বিশেষ।

পৃথিবীপদার্থ দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণু নিত্য পৃথিবী, অর্থাৎ পরমাণুর উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, উহা স্বতঃসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন সমস্ত পৃথিবীই অনিত্য। অর্থাৎ পরমাণু ভিন্ন সমস্ত পৃথিবীরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অনুমেয়। অনুমানের প্রণালী এইরূপ ঘটাদি সমস্ত বস্তুই সাবয়ব। উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই সাবয়ব, নিরবয়ব হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, অবয়বের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশক্রমে ঘটাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্য সাবয়ব। সাবয়ব-দ্রব্যের অবয়ব-ধারা বা অবয়ব-পরম্পরার অবশ্য বিশ্রাম আছে। অর্থাৎ ঘটের অবয়ববিভাগ করিতে গেলে ক্রমে সূক্ষ্ম অবয়বে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইবার পর ঈদৃশ অবয়ব উপস্থিত হয়, যাহার বিভাগ করা একান্ত অসম্ভব। যাহার বিভাগ হইতে পারে না, যাহা অভেদ্য, তাহাই পরম সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। পরমাণুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, অবয়বসংযোগেই দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমাণুর উৎপত্তি হইলে অবশ্য তাহার অবয়ব থাকিবে। তাহা হইলে যাহা পরমাণুর অবয়বরূপে কল্পিত হইবে, তাহাই পরমাণু। নিরবয়ব দ্রব্য স্বীকার না করিলে সকল বস্তুর অবয়ব-ধারা অনন্ত হইবে। কেন না, নিরবয়ব বস্তু স্বীকার না করিলে বিভজ্যমান অবয়ব যত কেন সূক্ষ্ম হউক না, তাহারও অবয়ব আছে, ঐ অবয়বেরও অবয়ব আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে সমস্ত বস্তুই অনন্তাবয়ব হইয়া পড়ে। সমস্ত বস্তুর অবয়ব অনন্ত হইলে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগ অনুপপন্ন হয়—সুমেরু ও সর্ষপের

তুল্য-পরিমাণের আপত্তি হয়। কেন না, সুমেরু ও সর্ষপ উভয়ই অনন্তাবয়ব হইলে পরিমাণের বৈলক্ষণ্য হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। অতএব সর্ব্বসূক্ষ্মতম অবয়বের অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব নাই, উহা নিরবয়ব, ইহা অবশ্যই স্বীকার হইতে হইবে। নিরবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তি নাই। যে দ্রব্যের উৎপত্তি নাই, তাহার বিনাশ নাই। কেন না, অবয়ববিভাগক্রমেই দ্রব্যের বিনাশ হইয়া থাকে। যাহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, তাহা নিত্য। অতএব সর্ব্বসূক্ষ্মতম অবয়ব বা পরমাণু নিত্য।

ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণু ভিন্ন অপরাপর অবয়ব বা অংশ এবং অবয়বী বা অংশী, এ সমস্তই সাবয়ব। দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাবয়বী বা অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ ঘটপটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সাবয়ব, সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু, ইত্যাদি ক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। অবয়বসংযোগে যাহাদের উৎপত্তি, অবয়ববিভাগে তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক মলিকিউল্ (Molecule) দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বীর অবয়ব পর্য্যন্ত অবয়বসকলের সাধারণ নাম। কেন না, অন্ত্যাবয়বী বডি (Body) মলিকিউল্ নহে, এবং মলিকিউল্ অন্ততঃ ভাগদ্বয়ে বিভাজ্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে পরমাণু বা এটম্ (Atom) স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক এটম্ মানেন না। আমাদের কোন কোন নৈয়ায়িকও দ্ব্যণুক ও পরমাণু মানেন না। তাঁহারা ত্রসরেণুতেই অবয়বধারার বিশ্রাম স্বীকার করেন।

সে যাহা হউক, অনিত্য পৃথিবী তিনপ্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীর ভোগায়তন। অর্থাৎ শরীরসংযোগেই আত্মার ভোগ হয় বলিয়া শরীর ভোগায়তন। ইন্দ্রিয় ভোগকরণ। কেন না, ইন্দ্রিয়দ্বারাই বিষয়ের উপলব্ধি হয়। বিষয়ের উপলব্ধিই ভোগ। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভোগ-সাধন পৃথিবীমাত্রই বিষয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভোগসাধন বলিয়া বিষয়ের অন্তর্গত হইতে পারিলেও, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ অসাধারণ ধর্ম্মের অনুরোধে পূর্ব্বাচার্য্যেরা পৃথক্‌রূপে তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শরীর দুইপ্রকার—যোনিজ ও অযোনিজ। শুক্র-শোণিত সংযোগ জন্য

শরীর যোনিজ, তদ্ভিন্ন অযোনিজ। যোনিজ শরীর দ্বিবিধ—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মনুষ্যাদির শরীর জরায়ুজ, পক্ষী ও সর্পাদির শরীর অণ্ডজ। অযোনিজ শরীরও দ্বিবিধ—স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মশকাদির শরীর স্বেদজ এবং বৃক্ষাদির শরীর উদ্ভিজ্জ। বৃক্ষাদিতেও জীবাত্মা আছে। তাহার প্রমাণ শাস্ত্র। পাপকর্ম্মবিশেষের ফলস্বরূপ জীব স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা শাস্ত্রের অনুশাসন। বৃক্ষাদিতেও জীব আছে, এ বিষয়ে দার্শনিকগণ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বৃক্ষাদির কোন স্থান ভগ্ন বা কোন স্থানে ক্ষত হইলে কালে তাহা জোড়া লাগে, এবং ক্ষত শুষ্ক হয়। ইহার দার্শনিক নাম ভগ্ন-ক্ষত-সংরোহণ। আধ্যাত্মিক-বায়ুর সম্বন্ধ না থাকিলে ভগ্নক্ষতসংরোহণ হয় না। বৃক্ষাদি পুষ্টির উপকরণ রসাদির আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। এতদ্দ্বারাও তাহাদের জীবসম্বন্ধ অনুমান করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন দেবর্ষিদিগের ও নারকীদিগের শরীরও অযোনিজ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব। কেন না, তদ্দ্বারা গন্ধের অনুভব হয়। গন্ধের অনুভব বা উপলব্ধি ক্রিয়াবিশেষ। ছেদনাদি ক্রিয়ার ন্যায় উহাও করণ-জন্য। উহা গন্ধের ব্যঞ্জক বলিয়া পার্থিব। ঘৃতাদি কুঙ্কুম গন্ধের অভিব্যঞ্জক, অথচ পার্থিব। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও গন্ধের অভিব্যঞ্জক, অতএব উহাও পার্থিব। ইন্দ্রিয়মাত্রই স্ব-প্রকৃতি দ্রব্যের অসাধারণ গুণের অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে। ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও স্বীকার করেন (১)। ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। পরিদৃশ্যমান নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান। অন্যান্য পৃথিবীর গন্ধের অভিব্যক্তি করিবার শক্তি থাকিলেও ভূতান্তরযোগে সেই শক্তি অভিভূত হয় বলিয়া সমস্ত পার্থিবপদার্থ গন্ধের অভিব্যক্তি করিতে পারে না। শ্লেষ্মাদিদ্বারা অভিভূত হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও গন্ধের অভিব্যক্তি করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিষ্কৃত পার্থিবাংশ-বিশেষ মাত্র।

(১) "Each sense is suited to a particular class of influences; Touch to solid pressure; Hearing to aerial pressure; Taste to liquid or dissolved matters having certain properties of a chemical nature; sight to the rays of the Sun or other luminous bodies." Bain's Mind and Body. P. 22. (1892).

স্নেহনামক গুণ যে দ্রব্যে আছে, তাহার নাম অপ্ বা জল। যে গুণপ্রভাবে গুণ্ডিকার পিণ্ডাকার অবস্থা সম্পাদিত হয়, তাদৃশ গুণ-বিশেষের নাম স্নেহ। স্নেহগুণ 'স্নিগ্ধং জলম্' এই অনুভবসিদ্ধ। জল ভিন্ন আর কোনও দ্রব্যের স্নেহগুণ নাই। তৈলাদিতে যে স্নেহগুণ আছে, তাহাও জলীয়, অর্থাৎ তৈলাদির অভ্যন্তরস্থ জলভাগের। তৈলাদির স্নেহ উৎকৃষ্ট, এইজন্য তাহা দহনের বা অগ্নির অনুকূল। সাধারণ-জলের স্নেহ অপকৃষ্ট, এইজন্য তাহা দহনের প্রতিকূল। অথবা যে দ্রব্যে জলত্বজাতি আছে, তাহার নাম জল। পৃথিবী-বৃত্তি নহে, অথচ হিমকরকাদি-বৃত্তি জাতিবিশেষের নাম জলত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব জাতি পৃথিবীবৃত্তি, তেজস্ব প্রভৃতি জাতি হিমকরকাদি-বৃত্তি নহে, এই-জন্য তাহাদিগকে জলত্ব বলা যায় না। জল দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য। তদ্ভিন্ন সমস্ত জল অনিত্য। অনিত্য জল ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বরুণলোকস্থ জীবদিগের শরীর জলীয়। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। দার্শনিকেরা বক্ষ্যমাণরূপে জলীয় শরীরের অনুমান করিয়াছেন। পার্থিব পরমাণু ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক, অথচ শরীরের আরম্ভক। জলপরমাণুও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক, অতএব তাহাও শরীরের আরম্ভক। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা। রসনেন্দ্রিয় রসের অভি-ব্যঞ্জক। অতএব শক্তুরসের অভিব্যঞ্জক জলের ন্যায় উহাও জলীয়। জলে কোনও রস নাই, ইহা অনুভববিরুদ্ধ। ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়াদির ন্যায় উৎকট মাধুর্য্য জলে নাই বটে, কিন্তু জলে যে অন্যবিধ মাধুর্য্য আছে, তাহা অপলাপ করিতে পারা যায় না। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত জলের সাধারণ নাম বিষয়।

যে দ্রব্যে রস নাই, অথচ রূপ আছে, তাহার নাম তেজ। পৃথিবী ও জলে রূপ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে রসও আছে, বায়ু প্রভৃতিতে রূপ নাই, এইজন্য উহারা তেজ নহে। অথবা যে দ্রব্যে তেজস্বজাতি আছে, তাহার নাম তেজ। করকাদিতে অবৃত্তি অথচ বিদ্যুদাদি-বৃত্তি জাতিবিশেষের নাম তেজস্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব করকাদিতেও আছে, করকাদিতে অবৃত্তি নহে, পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি জাতি বিদ্যুদাদি-বৃত্তি নহে, এইজন্য উহাদিগকে তেজস্ব বলা যাইতে পারে না।

তেজ দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত তেজ অনিত্য। অনিত্য তেজ তিনপ্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। সূর্য্য-লোকস্থিত প্রাণীদিগের শরীর তৈজস। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস। রূপমাত্রের অভিব্যঞ্জক আলোক তৈজস, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও রূপমাত্রের অভিব্যঞ্জক অতএব উহাও তৈজস। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত তেজ 'বিষয়' বলিয়া কথিত।

যে দ্রব্যে রূপ নাই, স্পর্শ আছে, তাহার নাম বায়ু। পৃথিবী, জল ও তেজোদ্রব্যে রূপ আছে, আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই, এইজন্য উহারা বায়ু নহে। বায়ু দুইপ্রকার—নিত্য ও অনিত্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্য, তদ্ভিন্ন বায়ু অনিত্য। অনিত্য বায়ু তিনপ্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়ুলোকস্থ জীবদিগের শরীর বায়বীয়। ব্যজনবায়ু অঙ্গসঙ্গি-জলের শীতল-স্পর্শের অভিব্যক্তি করে, ত্বগিন্দ্রিয়ও স্পর্শমাত্রের অভিব্যঞ্জক, অতএব উহা বায়বীয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত বায়ুর সাধারণ নাম বিষয়। জন্যদ্রব্যমাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের অল্পাধিক পরিমাণে সম্বন্ধ আছে, এবং এই ভূতচতুষ্টয় জন্য-দ্রব্যের আরম্ভক বা সমবায়িকারণ।

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের অবশ্যই একটি অধি-করণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির জন্য বায়ুর অপেক্ষা থাকিলেও বায়ু শব্দের আশ্রয় নহে। কারণ, বায়ুর একটি বিশেষগুণ স্পর্শ। তাহা যাবদ্দ্রব্যভাবী, অর্থাৎ বায়ু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার স্পর্শগুণও থাকে। শব্দ কিন্তু তেমন নহে। বায়ু থাকিতেও শব্দ নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুর বিশেষগুণ স্পর্শের সহিত এই-রূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষগুণ নহে। শব্দ বায়ুর বিশেষ-গুণ হইলে স্পর্শের ন্যায় উহাও যাবদ্দ্রব্যভাবী হইত। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে নির্বাতপ্রদেশেও শব্দ হইতে পারে। সুতরাং শব্দ বায়ুর গুণ নহে। সমস্ত শব্দ আকাশে বিলীন হয়—ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমত। দার্শনিকেরা বলেন—যে পদার্থ যাহাতে লীন হয়, তাহাতেই সেই পদার্থের উৎপত্তি হয়। উপাদান বা সমবায়িকারণ ভিন্ন অন্যত্র পদার্থের লয় হয় না। শব্দগ্রহণের হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশরূপ। কর্ণচ্ছিদ্রপ্রদেশবিশিষ্ট আকাশের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়।

যে দ্রব্যদ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার-নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম কাল। পূর্ব্বকালজাত ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ও পরকালজাত ব্যক্তি কনিষ্ঠ। দূরত্ব ও অন্তিকত্ব বা নৈকট্য ব্যবহারের এবং পূর্ব্বপশ্চিমাদিব্যবহারের কারণ-দ্রব্যবিশেষের নাম দিক্। আকাশ, কাল ও দিক্ প্রত্যক্ষ নহে, কার্য্যের দ্বারা অনুমেয়। উহারা প্রত্যেকে এক, অনেক নহে। এক হইলেও উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি আকাশের ঔপাধিক ভেদ। কাল ক্ষণ-দিন-মাসাদি-ভেদে অনেকপ্রকার। ক্রিয়ারূপ উপাধিভেদে ঐরূপ ভেদপ্রতীতি হয়। বস্তুগত্যা কাল এক। দিকও উপাধিভেদে পূর্ব্বপশ্চিমাদি-ভেদভিন্ন-রূপে ব্যবহৃত। যে দিকে প্রথম আদিত্যসংযোগ হয়, তাহার নাম প্রাচী বা পূর্ব্ব। তাহার বিপরীত দিক্ প্রতীচী বা পশ্চিম। পূর্ব্বাভিমুখে আদিত্যের পরিভ্রমণ হয়, সুতরাং আদিত্যের দক্ষিণস্থ দিক্ অবাচী বা দক্ষিণ। তাহার বিপরীত দিক্ উদীচী বা উত্তর ইত্যাদি।

জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুইপ্রকার—পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। ক্ষিতি ও অঙ্কুরাদির কর্ত্তারূপে ঈশ্বর অনুমেয়। জীবাত্মা 'অহং জানামি' ইত্যাদি মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। কোন একটি বিশেষ গুণের সহকারে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। যেমন 'অহং জানামি, অহং সুখী' অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি, আমি সুখী' ইত্যাদিরূপে জ্ঞান ও সুখাদি বিশেষগুণযোগে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ হয়। জীবাত্মা এক নহে, প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জীবাত্মার এই চতুর্দ্দশটি গুণ।

জীবাত্মা এবং সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণের নাম মন। রূপাদির উপলব্ধি 'ক্রিয়া' বলিয়া যেমন চক্ষুরাদিরূপ-করণ-সাধ্য, তদ্রূপ সুখাদির উপলব্ধি 'ক্রিয়া' বলিয়া তাহাও করণ-সাধ্য। যাহা সুখাদি-উপলব্ধির করণ, তাহাই মন। মন অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি বাহ্যকরণ বা বহিরিন্দ্রিয়। রূপাদি বহির্বিষয়ের উপলব্ধির জন্য যেরূপ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষিত, সুখাদি অন্তর্বিষয়ের উপলব্ধির জন্যও সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় অপেক্ষিত। আরও এক কথা। চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপের,

রসনেন্দ্রিয় রসের, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধের, শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের এবং ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শের উপলব্ধির সাধন। রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে তত্তদ্বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এক সময়ে রূপাদি পঞ্চবিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও, এককালে পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত চাক্ষুষাদি পাঁচপ্রকার জ্ঞান হয় না, উহার কোন একটি জ্ঞান হইয়া থাকে। কেন এমন হয়? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জ্ঞানের সাধন। যখন পাঁচটি জ্ঞান হইবার কারণ রহিয়াছে, তখন কেন পাঁচটি জ্ঞান এককালে হয় না? এতদুত্তরে অবশ্য বলিতে হইবে যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের অতিরিক্তও কোন সহকারিকারণ আছে, যাহার সন্নিধি হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহার সন্নিধান না হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয়, সেই ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানটিই জন্মিয়া থাকে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয় না, বিষয়-সন্নিকর্ষ থাকিলেও সে ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান হয় না। এইজন্যও মন স্বীকার করিতে হয়। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, 'মনোযোগ করি নাই বলিয়া শুনিতে পাই নাই বা দেখিতে পাই নাই' ইত্যাদি। মনোযোগ আর কিছুই নহে—অভিমত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগমাত্র। জ্ঞানের যৌগপদ্য এবং ক্রিয়ার যৌগপদ্য অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞান ও একাধিক ক্রিয়া হয় না বলিয়া যদি মনের স্বীকার আবশ্যক হইল, তবে মন অবশ্য অণুপরিমাণ অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম হইবে। কেন না, মন বিভু অর্থাৎ মহৎ-পরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে; সুতরাং এককালে একাধিক জ্ঞানও হইতে পারে। অতএব যে কারণে মন স্বীকার করিতে হইতেছে, সেই কারণেই মনের অণুত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্বও সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং মনের মহৎ-পরিমাণত্ব স্বীকার করিবার উপায় নাই। দার্শনিকেরা ইহাকেই ধর্ম্মি-গ্রাহক-প্রমাণ-বিরোধ বা ধর্ম্মি-গ্রাহক-প্রমাণ-বাধ বলিয়া থাকেন। যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহা ধর্ম্মী, অর্থাৎ বিশেষ্য। মনের ধর্ম্ম অণুত্ব, সুতরাং মন ধর্ম্মী। তাহার গ্রাহক কিনা জ্ঞাপক অর্থাৎ যে প্রমাণবলে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহার নাম ধর্ম্মি-গ্রাহক প্রমাণ। যে প্রমাণবলে মন

সিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রমাণবলে মনের অণুত্বও সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনের মহত্ত্বকল্পনা হইতে পারে না। মনের মহত্ত্বকল্পনা করিতে গেলেই ধর্ম্মি-গ্রাহক প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

আপত্তি হইতে পারে যে, দীর্ঘ-শষ্কুলী-ভক্ষণ-স্থলে এককালে একাধিক জ্ঞান হইতেছে। কেন না, শষ্কুলী হস্তদ্বারা ধৃত হয় বলিয়া তাহার স্পার্শিন জ্ঞান, চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হয় বলিয়া চাক্ষুষ জ্ঞান, শষ্কুলীর গন্ধ পাওয়া যায় বলিয়া তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, শষ্কুলীর রসাস্বাদন হয় বলিয়া তদীয় রসের রাসন জ্ঞান, শষ্কুলীর চর্ব্বণশব্দ শ্রুত হয় বলিয়া তাহার শ্রাবণ জ্ঞান, এককালে হইতেছে। এইরূপ নর্ত্তকী নৃত্য করিবার সময় দর্শকদিগের দর্শন, গেয়পদের স্মরণ, বাদ্যশব্দের শ্রবণ, বস্ত্রাঞ্চলের স্পর্শন এবং পাদন্যাস, হস্তচালন, শিরশ্চালন প্রভৃতি এককালে করিয়া থাকে। মন অণুপরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতেই পারে না, সুতরাং এককালে একাধিক জ্ঞান বা ক্রিয়াও হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মন আশুসঞ্চারী অর্থাৎ মন অতি শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চরণশীল। অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় বলিয়া যৌগপদ্যভ্রম হয়, অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞান ও একাধিক ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ ক্রমেই জ্ঞান ও ক্রিয়াপরম্পরা হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ত আছেই। সুতরাং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ামাত্রই জ্ঞান হয়। মন অত্যন্ত আশুসঞ্চারী, সুতরাং এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরক্ষণেই আর এক ইন্দ্রিয়ের সহিত, তৎপরক্ষণেই আবার অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। মনঃসংযোগ ক্রমে হয় বলিয়া তজ্জন্য জ্ঞানও ক্রমেই হয়। কারণের ক্রম থাকিলে কার্য্যের ক্রম অনিবার্য্য। সুতরাং তাহার অর্থাৎ জ্ঞানপরম্পরার যৌগপদ্য হইতেই পারে না। কিন্তু মন আশুসঞ্চারী বলিয়া তাহার সংযোগক্রম এবং তজ্জন্য জ্ঞানক্রম এত দুর্লক্ষ্য যে, তাহা বোধগম্যই হয় না। এইজন্য এককালে একাধিক জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয়। এ বিবেচনা ভ্রমাত্মক। শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞান হয় বলিয়া ক্রমিক জ্ঞানের যৌগপদ্যভ্রম অন্যত্রও হইয়া থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বক্তার বাক্য সরল হইলে

ঐ বাক্যটি শুনিবামাত্র তাহার অর্থবোধ হয়, ইহা সকলেই বিবেচনা করিয়া থাকেন। বস্তুগত্যা কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, বাক্য শুনিবার সময় প্রথমতঃ এক একটি বর্ণের, তৎপরে ঐ বর্ণঘটিত পদের তার পর পদঘটিত বাক্যের জ্ঞান হয়। এইরূপে বাক্যজ্ঞান হইলে, পরে বাক্যঘটক পদাবলীর সঙ্কেত স্মরণ হয়। সঙ্কেত স্মরণ হইয়া পদাবলীর অর্থজ্ঞান হয়। পরে অর্থসকল পরস্পর অন্বিত হইবার কোনও বাধা নাই—এইরূপ বোধ হইলে, তবে বাক্যের অর্থবোধ হয়। কিন্তু অভ্যস্ত বিষয় বলিয়া উহা এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয় যে, শ্রোতারা বিবেচনা করেন যে, বাক্যটি শুনিবামাত্রই তাহার অর্থবোধ হইয়াছে। যে বিষয়টি অভ্যস্ত নহে, সে বিষয় শুনিলে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তবে বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়।

উৎপল-শতপত্র-ব্যতিভেদ ও অলাতচক্র-দর্শনও ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। কতকগুলি উৎপলপত্র বা পদ্মপত্র উপর্য্যুপরিভাবে রাখিয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে, সমস্ত পত্রগুলিই এককালে বিদ্ধ হইয়াছে। তাহা কিন্তু হয় নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বোপরিস্থিত পত্রটি, তৎপরে তন্নিম্নস্থিত, তৎপরে তন্নিম্নস্থিত ইত্যাদিক্রমে পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বেধক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয় বলিয়া ক্রম লক্ষ্য করা যায় না, এইজন্য বেধক্রিয়ার যৌগপদ্যভ্রম হয়। একটি অলাত বা জ্বলদঙ্গার গোলাকারে দ্রুত ভ্রমণ করাইলে চক্রাকার অগ্নিরেখা বা অগ্নির চক্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু অলাতের বা জ্বলদঙ্গারের পরিভ্রমণ অবশ্য ক্রমে হইয়াছে। বৃহৎ-পরিমাণ সমস্ত বৃত্তপথে কোনমতেই ক্ষুদ্র অলাতের এককালে সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অলাতের পরিভ্রমণক্রিয়ার ক্রম অবশ্যই আছে। ক্রম থাকিলেও তাহা দুর্লক্ষ্য বলিয়া দর্শকদিগের চক্রভ্রম হইয়া থাকে।

বৈশেষিকমতে চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চদ্রব্য নিত্য। তদ্ভিন্ন দ্ব্যণুক অবধি মহাভূতচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু অনিত্য। অনিত্য দ্রব্যসকলের সৃষ্টি ও সংহারের বা প্রলয়ের ক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্মার দেহবিসর্জ্জনকালে সকল ভুবনের অধিপতি মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহারেচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। তৎকালে সমস্ত জীবাত্মার অদৃষ্টসকলের বৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ প্রলয়হেতু অদৃষ্টদ্বারা সৃষ্টি-ও-স্থিতি-

হেতু অদৃষ্টের কার্য্য প্রতিবদ্ধ হয়। প্রাণীদিগের ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি। ভোগপ্রযোজক বা ভোগহেতু অদৃষ্ট প্রলয়প্রযোজক বা প্রলয়হেতু অদৃষ্টদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট আর ভোগসম্পাদন করিতে পারে না। তৎকালে প্রলয়হেতু-অদৃষ্টযুক্ত আত্মার অর্থাৎ প্রাণিবর্গের সংযোগে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক পরমাণু-সকলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ঐ কর্ম্মবশতঃ আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া তদারম্ভক পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ, পৃথিব্যারম্ভক পরমাণুতে কর্ম্ম হইয়া আরম্ভক-সংযোগ-নিবৃত্তি-ক্রমে মহাপৃথিবী নষ্ট হয়। এই প্রণালীতে পৃথিবীর পর জল, জলের পর তেজ, তেজের পর বায়ু নষ্ট হয়। তখন চতুর্বিধ মহা-ভূতের চতুর্বিধ পরমাণুমাত্র বিভক্তরূপে অবস্থিতি করে। এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্যসংস্কারযুক্ত আত্মাসকল ও আকাশাদি নিত্য পদার্থগুলি মাত্র অবস্থিত থাকে। প্রলয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগের জন্য মহেশ্বরের সিসৃক্ষা অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রলয়হেতু অদৃষ্টের কার্য্য হইয়াছে বলিয়া উহা আর ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টের বৃত্তি-নিরোধ করিতে পারে না। সুতরাং ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট বৃত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ ফলোন্মুখ হয়। ঐ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমতঃ পবনপরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পবনপরমাণুসকলের পরস্পর সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন এবং অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তির্য্যগ্গমন বায়ুর স্বভাব। তৎকালে অপর কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই,—যাহার দ্বারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে পারে। সুতরাং বায়ু অনবরত কম্পমান হইয়াই অবস্থিত থাকে। বায়ুসৃষ্টির পরে ঐরূপে আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ সলিলরাশি উৎপন্ন এবং বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। তদনন্তর উক্ত ক্রমে পার্থিবপরমাণুসংযোগে নিবিড়াবয়ব মহাপৃথিবী উৎপন্ন হইয়া ঐ জল-রাশিতে অবস্থিতি করে। তৎপরে ঐরূপে দীপ্যমান মহান্ তেজোরাশি সমুৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। তৎপরে মহেশ্বরের সঙ্কল্প-মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা অতিশয় জ্ঞান-বৈরাগ্য ও

ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াই উৎপন্ন হন। তিনি মহেশ্বরকর্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রাণীদিগের কর্ম্মানুসারে ক্রমে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন।

প্রাণিগণ যেমন সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে বিশ্রামলাভ করে, সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে পুনঃপুনঃ দুঃখাদিভোগে পরিক্লিষ্ট প্রাণীদিগের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য অর্থাৎ দুঃখাদিভোগের উপশমনের জন্য মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অনুসারে প্রলয়ের আবির্ভাব হয়। এইজন্য পুরাণাদিতে সৃষ্টি ও প্রলয় দিন ও রাত্রিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘটাদি পার্থিব বস্তু চূর্ণীকৃত হয়, পর্ব্বতসকলও পার্থিব, অতএব তাহারাও একসময় চূর্ণীকৃত হইবে। জলাশয়সকল শুষ্ক হয়, সমুদ্রও জলাশয়বিশেষ, অতএব সমুদ্রও শুষ্ক হইবে। প্রদীপ তৈজস, উহা নিবিয়া যায়, সূর্য্যও তৈজস, অতএব সূর্য্যও নিবিয়া যাইবে—ইত্যাদিরূপে উদয়নাচার্য্য, এবং প্রকারান্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রলয়ের সাধক বহু-প্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন।

কণাদের অভিমত দ্রব্যপদার্থসম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ জড়পদার্থ বা ভূতসকল প্রায় সত্তর প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। কণাদ ও গোতমের মতে ভূতপদার্থ পাঁচটিমাত্র। সুতরাং পঞ্চভূতের কথা শুনিয়া অনেকে হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না অনেকে কণাদ ও গোতমের পঞ্চভূত ভূতের গল্প বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা বিবেচনা করা উচিত। রসায়নপ্রক্রিয়া অনুসারে যে সকল পদার্থের বিশ্লেষণ হয় না, রাসায়নিক পণ্ডিতেরা সেই সকল পদার্থকে মূলপদার্থ বা ভূত সংজ্ঞা দিয়া তাহাদিগকেই সত্তর প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। উহা রাসায়নিক-ভূত-রূপে পরিগণিত হউক্, তদ্বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই। কণাদ ও গোতম জগন্নির্ম্মাণের এবং জাগতিক ব্যবহারের উপযোগী জড়পদার্থসকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের ভূতসংজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাতে বিরোধের বা উপহাসের কোন কথাই হইতে পারে না। রসায়নশাস্ত্রে ভূতশব্দের অর্থ অবিশ্লেষণীয়, কিন্তু কণাদ ও গোতমের মতে ভূতশব্দের অর্থ অন্যরূপ। তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কণাদ ও গোতমের বিভাগ প্রাকৃতিক ও ব্যাবহারিক। গ্রন্থকর্ত্তাদের ইচ্ছানুসারে বিভাগের প্রকারভেদ বিচিত্র নহে। প্রাসাদ

কি উপাদানে নির্ম্মিত হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে রাসায়নিক পদার্থগুলির উল্লেখ করিলে চলিবে না। ইট, চূন, শুরকী ইত্যাদির উল্লেখ করিতে হইবে। সুতরাং পদার্থের প্রাকৃতিক ও ব্যাবহারিক বিভাগ আবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অক্সিজন্ (Oxygen) ও হাইড্রোজনের (Hydrogen) রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত করিতে পারা যায় বলিয়া জলের বস্তুত্বে সন্দেহ হইতে পারে না। প্রদীপের আলোক ত্রিকোণ কাচযন্ত্রবিশেষে পরিচালিত করিলে নানা বর্ণ বা রঙ দৃষ্ট হয়, উহা প্রদীপালোকের মৌলিক রঙ্ হইতে পারে, তাই বলিয়া প্রদীপ কোন পদার্থ নহে, এ কথা বলা যায় না। মৃদঙ্গারদ্বারা কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত হয় বলিয়া হীরককে মৃদঙ্গার বলা সঙ্গত হইবে না।

সত্য বটে, জাগতিক বস্তুমাত্রই ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের কার্য্য, কণাদ ও গোতমের মতে আকাশ কোন দ্রব্যের আরম্ভক নহে। কিন্তু আকাশ বিভু বা সর্ব্বগত। জাগতিক কোন পদার্থই আকাশসম্পর্কশূন্য নহে, আকাশের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। সুতরাং জাগতিক পদার্থ নির্ব্বচন করিবার সময় আকাশ উপেক্ষিত হইতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে যে, কণাদাদিমতে আকাশ শব্দের আশ্রয়। আকাশ ভিন্ন শব্দ হইতে পারে না, সুতরাং জগতে আকাশের উপযোগিতা অবর্ণনীয়। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের অতিরিক্ত জড়পদার্থ কেহ প্রদর্শন করিতে পারিবেন কি না, বলিতে পারি না। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা রসায়নপ্রক্রিয়া অনুসারে অবিশ্লেষণীয় যে সপ্ততিপ্রকার ভূতের উল্লেখ করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে, ইদানীন্তন সংখ্যাবৃদ্ধির ন্যায় কালে সংখ্যাহ্রাস হইয়া তাহা পঞ্চভূতে পর্য্যবসিত হইবে না। তাহা না হইলেও রসায়নশাস্ত্রে ভূত বা অবিভাজ্য পদার্থ যতপ্রকার হউক না কেন, উহারা কণাদ ও গোতমের অভিপ্রেত পঞ্চভূতেরই অনুগত, পঞ্চভূত অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। রসায়নশাস্ত্রের মতে রঙ্গ, রজত, সুবর্ণ, তাম্র ও কাংস্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভূত। কিন্তু কণাদমতে উহারা পঞ্চভূতের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। ব্যাখ্যাকর্ত্তাদের মতভেদে তৎসমুদায় ক্ষিতি বা তেজ পদার্থের অন্তর্গত। রাঙ্, সীসা, লৌহ, রজত, সুবর্ণকে কণাদ এক শ্রেণীর

অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অক্সিজন্ ও হাইড্রোজন্ রসায়নশাস্ত্রের মতে পৃথক্ পৃথক্ ভূত হইলেও কণাদমতে উভয়ই বায়ুপদার্থের অন্তর্গত। বৈশেষিকাদিমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়েরই জ্ঞান বা চেতনা আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক জ্ঞানবত্ত্বরূপ উভয়সাধারণ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উভয়কে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ফলতঃ পদার্থগুলির সত্যাসত্যতাবিষয়েই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পদার্থের বিভাগ বা শ্রেণীভেদ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেই-রূপ বিভাগ করিতে পারেন, তাহাতে কিছুই বলিবার নাই। অতএব সংখ্যাবৈষম্য শুনিয়াই উপহাস করা সঙ্গত নহে। তত্ত্বপর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই প্রেক্ষা-পূর্ব্বকারীর কর্ত্তব্য।

আর এক কথা। যে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি, যাহা দেশ ও মহাদেশে বিভক্ত, তাহাই পৃথিবী বা ক্ষিতি শব্দের অর্থ; আমাদের স্নানপানাদির সাধনভূত কূপ, তড়াগ ও নদী-নদাদি-গত জলই অপ্‌শব্দের অর্থ এবং আলোক ও পাকাদির সম্পাদক সূর্য্য ও অগ্নিই তেজঃশব্দের অর্থ, এইরূপ বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। কণাদ ক্ষিত্যাদির যে লক্ষণ দিয়াছেন, তদনুসারে ক্ষিত্যাদিশব্দের অর্থ বুঝাইলে কোনও বিরোধ বা অনুপপত্তি থাকে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা জড়বর্গকে অবস্থানুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—সলিড্ (Solid), লিকুইড্ (Liquid) ও গ্যাস্ (Gas)। এতদ্ভিন্ন ইথর্-(Ether)-নামেও এক শ্রেণীর পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এনর্জির (Energy) অস্তিত্ব অবিসংবাদিত। তাহা হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতেও প্রকারা-ন্তরে পদার্থসকল পাঁচ শ্রেণীতেই বিভক্ত হইতেছে। কণাদের পঞ্চভূতের সহিত তাহার কতদূর সামঞ্জস্য বা বিরোধ আছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা মন্দ নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ‘সলিড্’পদার্থের মোটামুটি লক্ষণ এই যে, উহা নিরেট্, কঠিন, ঘন, দৃঢ় ও সংহত। কণাদের ক্ষিতি ও বিজ্ঞানের সলিড্ এক পদার্থ হইতেছে না কি? কঠিন স্পর্শ ক্ষিতি ভিন্ন অপর পদার্থের ধর্ম্ম নহে। ইহা বৈশেষিকদিগের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত।

অধিকন্তু, পুষ্পাদিরূপ কোন কোন ক্ষিতির সুকুমার স্পর্শও তাঁহারা স্বীকার করেন। সাধারণতঃ ক্ষিতিপদার্থ ঘন হইলেও কোন কোন পার্থিব-পদার্থ অগ্নিসংযোগে সাময়িক তরলতা বা দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক লিকুইড্ চলনশীল, তরল ও দ্রব। কণাদের অপ্‌পদার্থও ঐরূপ। বৈজ্ঞানিক এনার্জির অন্যতম ধর্ম্ম প্রকাশ ও তাপ। কণাদের তেজঃপদার্থের ধর্ম্মও প্রকাশ ও উষ্মস্পর্শ বা তাপ। বৈজ্ঞানিক গ্যাস্ কণাদের বায়ু ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ, গ্যাস্ ও বায়ু উভয়ই তির্য্যগ্-গমনশীল। বৈজ্ঞানিক ইথর্‌শব্দের আভিধানিক অর্থ আকাশ, শূন্য, স্পন্দনশীল, নীরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। ইথর্ একমাত্র। কণাদের আকাশও নীরূপ, সর্ব্বব্যাপী ও একমাত্র। বৈজ্ঞানিক ইথর্ কণাদের আকাশপদার্থ কি না, তাহাও বিবেচ্য। সত্য বটে যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে ইথর্ শব্দের অধিকরণ নহে, পৃথিব্যাদিই শব্দের অধিকরণ। মন্বাদিসংহিতা এবং বেদান্তাদিদর্শনে শব্দ পঞ্চভূতের ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইলেও, আকাশই শব্দের আকর, তাহাতে মতভেদ নাই। কণাদ বলেন, শব্দ একটি বিশেষ গুণ, পৃথিব্যাদি যে সকল দ্রব্যের স্পর্শগুণ আছে, তাহার বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে। যেমন, তন্তুতে যে রূপ থাকে, পটেরও সেই রূপ হয়। ঘটের রূপ ঠিক কপালের রূপের মত। কিন্তু বেণু বীণা-মৃদঙ্গাদির শব্দ তাহাদের অবয়বের শব্দের মত নহে, অন্যরূপ। শব্দ বেণু-বীণাদির ধর্ম্ম হইলে, রূপের ন্যায় তাহাও কারণ-গুণ-পূর্ব্বক, সুতরাং অবয়বশব্দের অনুরূপ হইত। তাহা হয় না, এইজন্য শব্দের অধিকরণ মৃদঙ্গাদি নহে। মৃদঙ্গাদিতে অভিঘাত করিলে তৎ-প্রদেশস্থ আকাশে শব্দের উৎপত্তি হয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী। কঠিন কাষ্ঠের এক দিকে অভিঘাত করিলে অপর দিকে শব্দ শুনা যায়। শব্দের পরিচালনবিষয়ে কাষ্ঠপরমাণুর সহায়তা থাকিতে পারে, কিন্তু তথায়ও আকাশের অসদ্ভাব নাই। সুতরাং শব্দ কাষ্ঠাদির ধর্ম্ম, আকাশের ধর্ম্ম নহে, এ কথা ঠিক কি না, তাহা বলা যাইতে পারে না। ইথর্ ও আকাশে আরও একটু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

বৈজ্ঞানিকমতে ইথরের স্পন্দন আছে। বৈশেষিকমতে আকাশে কোনও ক্রিয়া নাই। কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মত ছাড়িয়া দিলে

সূত্রকারের মতে আকাশে গতিক্রিয়া না থাকিলেও স্পন্দনমাত্র থাকিতে পারে কি না, তাহা মনীষীদিগের চিন্তয়িতব্য বিষয় বটে। কেন না, সূত্রকার দ্রব্যপদার্থের মধ্যে আকাশের পরিগণনা করিয়াছেন, অথচ দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ ক্রিয়া, ইহা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। পঞ্চভূতের অতিরিক্ত কাল ও দিক্, এই দুইটি জড়পদার্থও কণাদ স্বীকার করিয়াছেন। ইদানীন্তনীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রেও তাহার যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় (১)। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ইহা অবিসংবাদী সত্য। কে বলিতে পারে যে, কালে শব্দের আকাশধর্ম্মত্ব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না? বিজ্ঞানশাস্ত্রের কার্য্যক্ষেত্র ব্যাবহারিক ও পরিদৃশ্যমান বস্তুসকলে সীমাবদ্ধ। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিজ্ঞানশাস্ত্র অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্মত নহে বলিয়া কোনও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আপত্তি করা সঙ্গত হয় না।

আরও একটি কথা, চিরন্তন-সিদ্ধান্ত-রূপে না হউক্, সুধীগণের বিবেচনার জন্য বলা যাইতে পারে। ব্যাখ্যাকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে কাল ও দিক্ পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কণাদ কাল ও দিক্ পদার্থ মানিয়াছেন, তাহা কেন মানিতে হইবে, তাহার কারণও প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কাল ও দিক্ পদার্থ প্রকৃতপক্ষে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বলিয়া কণাদের অভিপ্রেত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কণাদ প্রথমতঃ পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ুর লক্ষণ নির্দ্দেশ ও অপ্রত্যক্ষ বায়ুপদার্থের সাধন এবং তাহার নানাত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক শব্দগুণের অধিকরণরূপে আকাশের সাধন বা অনুমান করিয়াছেন। এবং আকাশ

(১) Properties of Matter.—By Prof. P. G. Tait, chap. IV., pp. 48 to 82 (3rd Edition.)

The Metaphysic of Experience.—By Dr. Shadworth. H. Hodgson. Vol. I. Book I. (1898).

Clerk Maxbell's Matter and Motion, pp. 19—20. নিউটন্ (Newton) এই উভয়কেই সর্ব্বজনবিদিত (omniius notissim.) বলিয়াছেন।

এক, নানা নহে, ইহা উপপাদন করিয়াছেন। বায়ুর লক্ষণ স্পর্শবিশেষ বায়ুসাধনপ্রসঙ্গেই পরীক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর পৃথিবী, অপ্ ও তেজের লক্ষণ গন্ধাদির পরীক্ষা করিয়া কাল ও তাহার একত্ব এবং দিক্ ও তাহার একত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক এক পদার্থেরও কার্য্য-ভেদে ঔপাধিক ভেদ হইয়া থাকে, ইহা বলিয়া, দিক্পদার্থ এক হইলেও উপাধিভেদে পূর্ব্বদক্ষিণাদি-ব্যবহার-ভেদ সমর্থন করিয়া, আকাশের বিশেষগুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপরে আত্মা ও মনের পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে, দিক্পদার্থের ন্যায় কালপদার্থেরও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাদি ভেদে ঔপাধিক নানাত্ব-ব্যবহার প্রচুরপরিমাণে আছে, সূত্রকারও ভূতভবিষ্যদাদির ব্যবহার করিয়াছেন। আকাশেরও ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে ঔপাধিক ভেদের অভাব নাই। এমত অবস্থায় সূত্রকার কেবল দিক্পদার্থেরই ঔপাধিক ভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন, কাল ও আকাশের ঔপাধিক ভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন না—এই প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। কেবল তাহাই নহে, কাল ও আকাশের ঔপাধিক ভেদ প্রদর্শন না করাতে সূত্রকারের ন্যূনতাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, সূত্রকারের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে আকাশ, কাল ও দিক্ এক পদার্থ, কার্য্যভেদে নামভেদ মাত্র। যেমন একই ব্যক্তি প্রতি-যোগিভেদে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আচার্য্য প্রভৃতি নানা আখ্যায় আখ্যাত হয়, সেইরূপ একই পদার্থ কার্য্যভেদে আকাশ, কাল ও দিক্ নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কাল ও দিক্—আকাশ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। সূত্রকার আকাশের অনুমান করিয়া পৃথিব্যাদির লক্ষণের বা বিশেষ বিশেষ গুণের পরীক্ষা করিয়া, "তদাকাশে ন বিদ্যন্তে" এই সূত্র-দ্বারা দেখাইলেন যে, উহারা আকাশগত নহে। পৃথিব্যাদির লক্ষণ আকাশে নাই, অর্থাৎ আকাশ পৃথিব্যাদির অন্তর্গত হইতে পারে না, উহা পৃথিব্যাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। পরে আকাশের প্রভেদ-স্বরূপ কাল ও দিক্ পদার্থ এবং তাহাদের একত্ব নিরূপণ করিয়া আকাশ-নিরূপণের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক কার্য্যভেদে এক পদার্থের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়া উদাহরণস্বরূপ দিক্পদার্থের কার্য্যভেদে নানাত্ব দেখাইয়াছেন।

এইরূপে আকাশপদার্থের বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিয়া আকাশের বিশেষগুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। কেন না, ধর্ম্মি-নিরূপণের পরেই ধর্ম্ম-নিরূপণ সর্ব্বথা সমীচীন। সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় না হইলে পঞ্চভূতনিরূপণের পর পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের গুণের পরীক্ষার অনন্তর কাল ও দিক্ পদার্থের নিরূপণ করিয়া আকাশগুণ শব্দের পরীক্ষা করা অসম্বদ্ধ এবং অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের গুণপরীক্ষার মধ্যে কাল ও দিক্ পদার্থের নিরূপণ কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

সূত্রকারের উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা না করিলে প্রকারান্তরে সূত্রকারের অসম্বদ্ধভাষিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা কতদূর সঙ্গত, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। কাল ও দিক্ যে বস্তুগত্যা আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে—সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা করিবার আরও বিশিষ্ট হেতু আছে। তাহা এই। শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয়রূপে আকাশের অনুমান করা হইয়াছে। তাহার প্রণালী এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। "কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ। কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ।" এই দুইটি সূত্র দ্বারা শব্দ—পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ুর গুণ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। কেন না, কার্য্যভূত-পৃথিব্যাদির গুণ তাহার কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহা দেখা গিয়াছে। বীণা বেণু ও মৃদঙ্গাদির শব্দ কারণ-গুণ-পূর্ব্বক নহে। কেন না, বীণাদির কারণের শব্দ ও বীণাদির শব্দ একরূপ হয় না। বীণাদির শব্দ কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইলে রূপাদির ন্যায় তার মন্দ-ভাবও তাহাতে হইতে পারে না। এই দুই সূত্র দ্বারা শব্দ পৃথিব্যাদির গুণ নহে, ইহা স্থির করিয়া, "পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ" এই সূত্রদ্বারা শব্দ আত্মা বা মনের গুণ নহে, ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। কেন না, আত্মার গুণ জ্ঞানসুখাদি আত্মসমবেত, শব্দ আত্মসমবেত নহে। সুতরাং শব্দ আত্মার গুণ হইতে পারে না। শব্দ আত্মসমবেত হইলে 'অহং জানামি, অহং সুখী' অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি, আমি সুখী' ইত্যাদির ন্যায় 'অহং শব্দবান্' অর্থাৎ 'আমি শব্দযুক্ত—আমাতে শব্দ হইতেছে', এইরূপ প্রতীতি হইত। তাহা হয় না। অতএব শব্দ আত্মার গুণ নয়। শব্দ মনেরও গুণ নয়। কারণ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। মনের গুণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কেন না,

মন অণু। এই সূত্রত্রয়ের দ্বারা শব্দ—পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াই সূত্রকার বলিতেছেন যে, "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য।" অর্থাৎ শব্দ যখন পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের গুণ হইতে পারিতেছে না, তখন পারিশেষ্যপ্রযুক্তই উহা আকাশের গুণ হইতেছে। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, কাল ও দিক্ আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে শব্দ কেন কাল ও দিকের গুণ হইতে পারে না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সূত্রকারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য"—এ কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত এবং বালোন্মত্তাদি-বাক্যের ন্যায় অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। কাল ও দিক্ আকাশের অতিরিক্ত নহে, ইহা কল্পনামাত্র বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতেও কাল ও দিক্ আকাশের অতিরিক্ত নহে। "দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ"—এই সাংখ্যসূত্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কোন অসাধারণ নৈয়ায়িক আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন, আকাশও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে। সে যাহা হউক, আত্মা ও মন পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ কি না, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

পঞ্চম লেক্‌চর।

বৈশেষিকদর্শন।

যে পদার্থে গুণত্বজাতি আছে, তাহার নাম গুণ। সংযোগ ও বিভাগ এতদুভয়ে সমবেত সত্তা-ভিন্ন জাতির নাম গুণত্ব। দ্রব্যত্ব-কর্ম্মত্ব-পৃথিবীত্বাদি জাতি সংযোগ বিভাগে সমবেত নহে। সংযোগত্ব ও বিভাগত্ব যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগে সমবেত হইলেও, সংযোগ-বিভাগ এতদুভয়ে সমবেত নহে। সত্তা-জাতি, সংযোগ-বিভাগ উভয়ে সমবেত হইলেও, সত্তা-ভিন্ন নহে। এইজন্য উহাদিগকে গুণত্ব বলা যাইতে পারে না। গুণ চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। রূপ শুক্ল-নীল-পীতাদি-ভেদে অনেকপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার রূপ আছে। জলে ও তেজে কিন্তু কেবল শুক্ল রূপ। জলের রূপ ভাস্বর অর্থাৎ পরপ্রকাশক নহে। তেজের রূপ ভাস্বর অর্থাৎ পরপ্রকাশক। কালিন্দীজলের নীলতা, বহ্নির লৌহিত্য আশ্রয়োপাধিক। কালিন্দীজল নীলবর্ণ দেখায় বটে, কিন্তু ঐ জল উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ধবলতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। রস মধুর-অম্ল-তিক্তাদিভেদে অনেকপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার রস আছে। জলে কেবল মধুর রস। জম্বীররসাদির অম্লতা, নিম্বরসাদির তিক্ততা আশ্রয়োপাধিক। গন্ধ সুরভি-অসুরভি-ভেদে দুইপ্রকার। গন্ধ কেবল পৃথিবীবৃত্তি। স্পর্শ তিনপ্রকার—উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। তেজঃ-পদার্থের স্বাভাবিক স্পর্শ উষ্ণ। জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল। বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। চন্দ্র সূর্য্যতেজে তেজস্বী। চন্দ্রমণ্ডল জলবহুল, সুতরাং জলের শীতস্পর্শদ্বারা তেজঃস্পর্শের উষ্ণতা অভিভূত হয় বলিয়া চন্দ্ররশ্মির উষ্ণতা অনুভূত হয় না। অগ্নি ও সূর্য কিরণসম্পর্কে জলস্পর্শের

উষ্ণতা এবং ঐরূপে বায়ুস্পর্শের উষ্ণতা ও হিমানীসম্পর্কে শীতলতা অনুভূত হইলেও, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল ও বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমার ভেদে দ্বিবিধ। কঠিন বা দৃঢ় বস্তুর স্পর্শের নাম কঠিন স্পর্শ, কোমলবস্তুর স্পর্শের নাম সুকুমার স্পর্শ। এতদ্ভিন্ন পাকজ স্পর্শও পৃথিবীর আছে। অগ্নিপক্ক হইবার পূর্ব্বে ঘটশরাবাদির যাদৃশ স্পর্শ থাকে, অগ্নিপক্ক হইবার পরে তাদৃশ স্পর্শ থাকে না, অন্যরূপ স্পর্শ হয়। ইহারই নাম পাকজ স্পর্শ। শব্দ দুইপ্রকার— ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি-শব্দের নাম ধ্বনি। কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি প্রদেশে আভ্যন্তরীণ বায়ুর অভিঘাতে যে শব্দ হয়, তাহার নাম বর্ণ। একত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা অনেকপ্রকার। তন্মধ্যে দ্বিত্বাদি-সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলেই দ্বিত্বাদির বিনাশ হয়। অনেক-একত্ব বিষয়ক বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। পরিমাণ চারিপ্রকার— অণু, মহৎ, হ্রস্ব, দীর্ঘ। শঙ্করমিশ্রের মতে প্রত্যেক বস্তুতে দ্বিবিধ পরিমাণ আছে। যাহাতে অণুত্বপরিমাণ আছে, তাহাতে হ্রস্বপরিমাণও আছে। এইরূপ মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব সমদেশবর্ত্তী। পরমাণু ও মনঃপদার্থে পরম অণুত্ব অর্থাৎ অণুপরিমাণের চরম উৎকর্ষ, এবং আকাশ কাল, দিক্ ও আত্মাতে মহত্ত্বের চরমোৎকর্ষ বা পরম মহত্ত্ব আছে। যে গুণ অনুসারে ঘট হইতে পট পৃথক্, পৃথিবী হইতে জল পৃথক্ ইত্যাদি প্রতীতি হয়, তাহার নাম পৃথক্ত্ব। একাধিক যে সকল বস্তু পরস্পর-সম্বন্ধ শূন্য হইয়াও থাকে, তাহাদের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। কার্য্য কারণসম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকে না, এইজন্য কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, উহা সমবায়। সংযোগ তিনপ্রকার—অন্যতর-কর্ম্ম-জন্য, উভয়-কর্ম্ম-জন্য, ও সংযোগজন্য। যে দুই বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে একমাত্রের ক্রিয়াজন্য যে সংযোগ, তাহাই অন্যতর-কর্ম্ম-জন্য। পর্ব্বতে কোন পক্ষী বসিলে পর্ব্বত ও পক্ষীর যে সংযোগ হইল, তাহা কেবল পক্ষীর ক্রিয়া-জন্য। যুদ্ধকালে মল্লদ্বয় ও মেষদ্বয়ের যে সংযোগ হয়, তাহা উভয় ক্রিয়া-জন্য। অঙ্গুলীর ক্রিয়াদ্বারা অঙ্গুলীর সহিত বৃক্ষের সংযোগ হইলে, বৃক্ষ ও হস্তেরও সংযোগ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই হস্ত-বৃক্ষ-সংযোগ অঙ্গুলী-বৃক্ষ-সংযোগ-জন্য। সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যে গুণ

উৎপন্ন হইলে সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম বিভাগ বিভাগও সংযোগের ন্যায় তিনপ্রকার। পর্ব্বত হইতে পক্ষীর বিভাগ পক্ষীর কর্ম্ম-জন্য। মল্লদ্বয় ও মেষদ্বয়ের বিভাগ উভয়-কর্ম্ম-জন্য। বৃক্ষ হইতে হস্তের বিভাগ বৃক্ষ হইতে অঙ্গুলীর বিভাগজন্য। পরত্ব এবং অপরত্ব কালিক ও দৈশিক ভেদে দ্বিবিধ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব-ও-কনিষ্ঠত্ব-রূপ। দূরত্ব ও অন্তিকত্বই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব।

বুদ্ধি কিনা জ্ঞান। জ্ঞান অনেকরূপে বিভক্ত। প্রথমতঃ নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব ভাসমান হয় না, যাহাতে কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র ভাসমান হয়, তাহা নির্ব্বিকল্পক। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, উহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয় মাত্র। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব ভাসমান হয়, তাহার নাম সবিকল্পক। 'অয়ং ঘটঃ' এই প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। কারণ, এই জ্ঞানে ঘট বিশেষ্যরূপে ও ঘটত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়াছে। সবিকল্পক জ্ঞানের অপর নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। বিকল্প কিনা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব। কেন না, বিশেষরূপ কল্পনাই বিকল্প। এইটি বিশেষণ, এইটি বিশেষ্য— ইহা বিশেষরূপ কল্পনা, সন্দেহ নাই। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ঈদৃশ বিশেষ-রূপ কল্পনা নাই বলিয়াই উহা নির্ব্বিকল্পক, অর্থাৎ বিকল্পশূন্য। নির্ব্বি-কল্পক জ্ঞান অনুমান করিবার প্রণালী এইরূপ। বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণ-জ্ঞান-জন্য। নীল না জানিলে নীলোৎপলের জ্ঞান হয় না। খড়্গ না জানিলে খড়্গীর জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্ব-জ্ঞান না হইলে ঘটত্ব-বিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে বিশেষণীভূত-ঘটত্বের জ্ঞান হইয়াছে, ইহা অনুমেয়। যে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ঘটত্বকে বিষয় করিয়াছে, সে জ্ঞান অবশ্য ঘটকেও বিষয় করিয়াছে। কেন না, ঘটত্ব ও ঘট উভয়েই বিষয় হইবার কারণ একরূপ। ঘটত্ব ও ঘট এই উভয়, জ্ঞানের বিষয় হইলেও, তাহা স্বরূপেই বিষয় হইয়াছে, বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে নহে। এইজন্যই উহা নির্ব্বিকল্পক। পূর্ব্বে বিশেষণজ্ঞান না হইলে বিশিষ্ট-জ্ঞান বা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বি-কল্পক জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে হইতে পারে না। এইজন্য নির্ব্বি-

কল্পক জ্ঞানের অভিলাপ হইতে পারে না, অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ জ্ঞানের আকার প্রকাশ করা যায় না। কারণ, শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অবশ্য বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন হইবে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন নহে, এইজন্য শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না।

অনুভূতি বা অনুভব এবং স্মৃতি বা স্মরণরূপেও জ্ঞান দুইপ্রকার। অনুভূতি দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও লৈঙ্গিক বা অনুমিতি। প্রত্যক্ষ ছয়প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানস। সংস্কারজন্য জ্ঞান-বিশেষের নাম স্মৃতি বা স্মরণ। বিদ্যা বা প্রমা ও অবিদ্যা বা অপ্রমা ভেদেও জ্ঞান দ্বিবিধ। যে বস্তুটি বস্তুগত্যা যেরূপ, সেই বস্তুর ঠিক সেইরূপে জ্ঞান বিদ্যা বা প্রমা। যে বস্তু যেরূপ, অন্যরূপে সেই বস্তুর জ্ঞান অবিদ্যা বা অপ্রমা। অবিদ্যা দুইপ্রকার—সংশয় ও বিপর্য্যাস। সংশয় অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, অর্থাৎ এক-ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানাধর্ম্মের জ্ঞানের নাম সংশয়। যেমন দূর হইতে স্থাণু অর্থাৎ শাখাদিশূন্য বৃক্ষ দর্শন করিলে 'ইহা স্থাণু কি পুরুষ'—এইরূপ যে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, তাহাই সংশয়। কেন না, এক স্থাণুরূপ ধর্ম্মীতে পরস্পরবিরুদ্ধ স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞান হইয়াছে। নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের নাম বিপর্য্যাস। যেমন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, পিত্তদোষদুষ্ট ব্যক্তির শঙ্খে পীতবর্ণ-বুদ্ধি, শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধি, মরীচিকাতে জলবুদ্ধি ইত্যাদি।

যে জ্ঞানের বিষয় বস্তুগত্যা বিদ্যমান নাই, তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। স্বপ্নজ্ঞানও অবিদ্যা। স্বপ্নকালেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয়-সকলের অনুভব হয়। পরন্তু তখন ইন্দ্রিয়সকলের কার্য্যকারিতা থাকে না, বিষয়েরও বিদ্যমানতা নাই। সুতরাং উহা মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। পূর্ব্বানুভবজন্য-সংস্কার-সহকারে স্বপ্নকালে বিষয়ের অনুভব হয়। কোন কোন আচার্য্যের মতে স্বপ্নজ্ঞান পূর্ব্বানুভূতের স্মরণ-মাত্র। স্বপ্নে স্বশিরশ্ছেদনও দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার কোন পদার্থই অননুভূত বলা যায় না। স্ব অর্থাৎ নিজেও অনুভূত, শিরও অনুভূত, ছেদনও অনুভূত, দোষাধীন পরস্পর-সম্বন্ধের প্রতিভাস হয় মাত্র। কোন কোন স্বপ্ন সংস্কারপটুতাজন্য। যেমন কোন বিষয়

আদরপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্বপ্ন ধাতুবৈষম্যজনিত। আকাশগমন, বসুন্ধরা-পর্য্যটন, ব্যাঘ্রাদিভয় প্রভৃতি স্বপ্ন বাতদোষজন্য। অগ্নিপ্রবেশ, দিগ্দাহ, কনকপর্ব্বত, বিদ্যুদ্‌বিস্ফুরণ প্রভৃতি স্বপ্ন পিত্তদোষজন্য। সমুদ্রসন্তরণ, নদীমজ্জন, বৃষ্টিপাত ও রজতপর্ব্বতদর্শন প্রভৃতি শ্লেষ্মদোষজন্য। অর্থাৎ বাতপিত্তাদি-ধাতুদোষে ঐ সকলের স্বপ্নানুভব হয়। তদ্ভিন্ন স্বপ্ন অদৃষ্টজন্য। তন্মধ্যে ধর্ম্মজন্য স্বপ্ন শুভসূচক এবং অধর্ম্মজন্য স্বপ্ন অশুভসূচক।

সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। উহা সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ। যত্ন তিনপ্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান, চিকীর্ষা কিনা কর্ত্তব্যত্বরূপে ইচ্ছা অর্থাৎ 'ইহা আমার কর্ত্তব্য' এইরূপ ইচ্ছা, কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান ও উপাদানপ্রত্যক্ষ, এইগুলি প্রবৃত্তির কারণ। ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞানের কারণতা পূর্ব্বেই সমর্থিত হইয়াছে। যাহা করিবার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিবার জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি বিবেচনা হয় যে, এ কার্য্য আমার কৃতিসাধ্য নহে, অর্থাৎ এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে, সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ না হইলে সে-কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটশরাবাদির নির্ম্মাণে, তণ্ডুলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে, কেহ প্রবৃত্ত হয় না, হইতে পারে না। নিবৃত্তির কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি যে যত্নপ্রভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম জীবনযোনি যত্ন।

গুরুত্ব পতনের কারণ। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে বস্তু পৃথিবীর অভিমুখে আকৃষ্ট হইলেও, গুরুত্ব বা গুরুত্বের পতনহেতুত্ব প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কেন না, বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে আকর্ষণশক্তির কার্য্যকারিতার তারতম্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি এ দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ততঃ ৭৫০ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থে উহা সিদ্ধপদার্থের ন্যায় উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তৎপূর্ব্বেও উহা সুপরিজ্ঞাত ছিল, ইহা অনুমান করা

যাইতে পারে। গুরুবস্তু পৃথিবীকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, ইহা গ্রন্থকার স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। স্যন্দনের হেতু গুণবিশেষের নাম দ্রবত্ব। দ্রবত্ব আছে বলিয়া জল স্থিরভাবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে। স্নেহের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। ধনুর্যন্ত্রপরিমুক্ত বাণ দূরস্থ লক্ষ্য বেধ করে। ধনু হইতে লক্ষ্য পর্য্যন্ত বাণের গতিক্রিয়া এক নহে। কারণ, বৈশেষিকমতে ক্রিয়া ক্ষণ-চতুষ্টয়মাত্র থাকে। প্রথম ক্ষণে ক্রিয়ার উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগ, তৃতীয় ক্ষণে পূর্ব্বসংযোগনাশ, চতুর্থ ক্ষণে উত্তরসংযোগের উৎপত্তি, পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ানাশ। উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশক। অতএব ধনু হইতে লক্ষ্য পর্য্যন্ত বাণ পৌঁছাইতে লক্ষ্যের দূরত্ব অনুসারে বহুক্ষণ আবশ্যক করে। বৈশেষিকাচার্য্যেরা বলেন যে, ধনুর নোদন বা নিপীড়নে বাণে গতিক্রিয়া জন্মে। সেই গতিক্রিয়া বেগাখ্য সংস্কার উৎপন্ন করে এবং বেগাখ্য সংস্কার বাণগত পর-পর গতিক্রিয়া জন্মাইয়া দেয়। এইরূপে বাণ লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যবেধ করে। ভাবনাখ্য সংস্কার স্মরণের কারণ। উহা নিশ্চয়জন্য। নিশ্চয় হইলেও তদ্বিষয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি থাকিলে ভাবনাখ্য সংস্কার জন্মে না। অতএব উপেক্ষানাত্মক নিশ্চয়—ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। যে সংস্কার বা গুণ-বশতঃ আকৃষ্ট বৃক্ষশাখাদি পরিত্যক্ত হইবামাত্র পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার। পুণ্য ও পাপের নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। বিহিতক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম জন্মে, উহা সুখের হেতু। নিষিদ্ধ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধর্ম্ম জন্মে, উহা দুঃখের হেতু। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, স্নেহ, স্বাভাবিক-দ্রবত্ব, ভাবনাখ্য সংস্কার ও অদৃষ্ট, এইগুলির সাধারণ নাম বিশেষগুণ।

যাহাতে কর্ম্মত্বজাতি আছে, তাহার নাম কর্ম্ম। উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত সত্তাভিন্ন জাতির নাম কর্ম্মত্ব। দ্রব্যত্ব-গুণত্বাদি জাতি উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে সমবেত নহে, উৎক্ষেপণত্ব ও অবক্ষেপণত্ব যথাক্রমে উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে সমবেত হইলেও উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ এতদুভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত নহে, সত্তাজাতি

উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ উভয়-সমবেত হইলেও সত্তা-ভিন্ন নহে. এজন্য ঐ সকল জাতিকে কর্ম্মত্ব বলা যাইতে পারে না। কর্ম্ম পাঁচপ্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাদির অধোদেশের সহিত বিভাগ এবং উর্দ্ধদেশের সহিত সংযোগ হয়, সেই কর্ম্মের নাম উৎক্ষেপণ।' ইহার বিপরীত অবক্ষেপণ, অর্থাৎ উর্দ্ধদেশের সহিত বিভাগ এবং অধোদেশের সহিত সংযোগজনক কর্ম্মই অবক্ষেপণ। কোন বস্তু প্রাসাদের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহার অবক্ষেপণ হইল বলা যায়। বিদ্যমান বস্তুর অবয়বসকলের আগন্তুক-পরস্পর-সংযোগ-জনক কর্ম্মের নাম আকুঞ্চন। হস্তাঙ্গুলীর মুষ্ট্যাকারে অবস্থিতি, বস্ত্রের পিণ্ডিতভাবসম্পাদন আকুঞ্চনের কার্য্য ঐ আগন্তুক-সংযোগের বিনাশক কর্ম্ম প্রসারণ। হস্তাঙ্গুলী ও বস্ত্রের যথাবদবস্থিতি-সম্পাদন প্রসারণের কার্য্য। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মের সাধারণ নাম গমন। নমন, উন্নমন, চক্রাদির পরিভ্রমণ, অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন প্রভৃতি গমনের অন্তর্গত।

নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্য বা জাতি। একাধিক বস্তুর সংযোগ হয়, সুতরাং সংযোগ অনেকসমবেত বটে, কিন্তু নিত্য নহে। জলপরমাণুর রূপ, আকাশের পরম মহৎপরিমাণ নিত্য ও সমবেত হইলেও অনেকসমবেত নহে; অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেকবৃত্তি হইলেও সমবেত নহে; এইজন্য উহারা সামান্য বা জাতি হইতে পারে না। জাতি দুইপ্রকার—পরা ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জাতি পরা এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতি অপরা। সত্তাজাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিন পদার্থেই আছে, সত্তা অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি জাতি নাই। এইজন্য সত্তা পরা জাতি। ঘটত্বাদি জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, এইজন্য উহারা অপরা জাতি। দ্রব্যত্বাদি-জাতি ক্ষিতিত্বাদি-জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি বলিয়া অপরা। এইজন্য উহাদিগকে পরাপর জাতি বলা যায়।

গুণ-কর্ম্ম-ভিন্ন এক-মাত্র-সমবেত পদার্থের নাম বিশেষ। জলীয়-পরমাণুর রূপ-প্রভৃতি-গুণ এবং কর্ম্ম একমাত্রসমবেত হইলেও গুণ-কর্ম্ম-ভিন্ন নহে, সামান্যপদার্থ গুণ-কর্ম্ম-ভিন্ন অথচ সমবেত হইলেও একমাত্র-

সমবেত নহে। কোন অভাব গুণ-কর্ম্ম-ভিন্ন এবং একমাত্রবৃত্তি হইলেও সমবেত নহে। এইজন্য উহাদিগকে বিশেষপদার্থ বলা যায় না। বিশেষ-পদার্থ স্বীকার করিবার সংক্ষিপ্ত যুক্তি এই—দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য অবয়বী অর্থাৎ ঘটাদিপর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়বদ্রব্যের তত্তৎ অবয়ব-ভেদে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর ভেদও অবশ্য কোন ধর্ম্মদ্বারা সম্পন্ন হইবে। মুদ্গ ও মাষের যথাক্রমে আরম্ভক মুদ্গ-পরমাণু ও মাষ-পরমাণু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন এস্থলে পরস্পরের ভেদক ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, মুদ্গের আরম্ভক পরমাণু ও মাষের আরম্ভক পরমাণু সমানরূপ হইলেও উভয় পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম্ম আছে। তদ্দ্বারা উভয় পরমাণু পরস্পর ভিন্ন হইতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম্মই বিশেষপদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষপদার্থ সাবয়ব-দ্রব্যবৃত্তি নহে, নিরবয়ব-দ্রব্যমাত্রবৃত্তি। কতগুলি পরমাণু মুদ্গমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মাষে থাকে না। কতগুলি পরমাণু মাষমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মুদ্গে থাকে না। কতগুলি পরমাণু মুদ্গ ও মাষ উভয়েরই আরম্ভক। উহারা মুদ্গ ও মাষ উভয়েই থাকে। এইজন্য মুদ্গ ও মাষ পরস্পর ভিন্ন হইলেও অনেকটা সমান-আকার।

অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের, জাতির সহিত ব্যক্তির এবং বিশেষের সহিত নিত্যদ্রব্যের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়। ঘটের অবয়ব কপাল, বস্ত্রের অবয়ব তন্তু। 'কপালে ঘটঃ, তন্তুষু পটঃ' এস্থলে কপাল ও তন্তুতে ঘট ও পটের সম্বন্ধ সমবায়। 'শুক্লো ঘটঃ' এস্থলে ঘটে শুক্লগুণের সমবায়সম্বন্ধ। এইরূপ ক্রিয়ার অধিকরণে ক্রিয়ার, জাতির অধিকরণে জাতির এবং বিশেষ-পদার্থের অধিকরণে বিশেষ-পদার্থের সমবায়সম্বন্ধ আছে।

অভাব দুইপ্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব কিনা সম্বন্ধের অভাব। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। প্রাগভাব অর্থাৎ বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে বস্তুর অভাব। 'কপালে ঘটো ভবিষ্যতি' অর্থাৎ 'কপালে ঘট হইবে', সুতরাং এখন ঘট নাই। উৎপত্তির পূর্ব্বে কপালে ঘটের যে অভাব আছে,

তাহা প্রাগভাব। প্রাগভাবের আদি নাই বটে, কিন্তু অন্ত আছে। ঘটের উৎপত্তি হইলে আর ঘটের প্রাগভাব থাকে না। সুতরাং প্রতি-যোগী প্রাগভাবের নাশক। মুদ্গরাদির আঘাতদ্বারা উৎপন্ন ঘটের যে অভাব হয়, তাহা ধ্বংসাভাব। 'ঘটো নষ্টঃ' অর্থাৎ 'ঘট নষ্ট হইয়াছে,' এস্থলে ঘটের ধ্বংসাভাবের প্রতীতি হইতেছে। ধ্বংসাভাবের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু অন্ত অর্থাৎ বিনাশ নাই। ধ্বংস ও প্রাগভাব ভিন্ন সংসর্গাভাবের নাম অত্যন্তাভাব। অর্থাৎ প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্বকালাবচ্ছেদে যে অভাব, তাহা প্রাগভাব; প্রতিযোগী বিনষ্ট হইবার পরকালে যে তাহার অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব; কিন্তু যে সংসর্গাভাব কোন বিশেষ-সময়ে সীমাবদ্ধ নহে, যাহা সর্ব্বকালে থাকে, তাহাই অত্যন্তাভাব। বায়ুতে রূপ নাই, ঘটে চৈতন্য নাই, ভূতলে ঘট নাই, ইত্যাদি অত্যন্তাভাবের উদাহরণ। ভূতলে ঘট আনীত হইলেও ঘটের অত্যন্তাভাবের বিনাশ বা অভাব হয় না। কেন না, তখনও প্রদেশান্তরে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে। ভূতলে ঘট আনীত হইলে, তৎকালে ঐ ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ থাকে না, এইমাত্র বিশেষ। অন্যোন্যাভাব কিনা অন্যোন্য অর্থাৎ পরস্পরেতে পরস্পরের যে অভাব। যে বস্তু যে বস্তু নহে, সেই বস্তুতে সেই বস্তুর যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব। ঘট পট নহে, সুতরাং ঘটে পটের যে অভাব, এবং পটে ঘটের যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব। অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে নিয়মিত হয়, তাহার নাম অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাবের অপর নাম ভেদ। 'ঘটঃ পটো ন, ঘটঃ পটাদন্যঃ, ঘটঃ পটাদ্ভিন্নঃ' এ সকল স্থলে ঘটে পটের অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হইতেছে।

কারণ তিনপ্রকার—সমবায়ি-কারণ, অসমবায়ি-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। কার্য্য, যে কারণে সমবেত বা সমবায়সম্বন্ধে থাকে, তাহার নাম সমবায়ি-কারণ। কপাল ও কপালিকা ঘটের কারণ, অথচ কপাল ও কপালিকাতে সমবায়সম্বন্ধে ঘট থাকে, কেন না, কার্য্য ও উপাদান-কারণের সম্বন্ধ সমবায়। সুতরাং কপাল ও কপালিকা ঘটের সমবায়ি-কারণ। এইরূপ তন্তু পটের সমবায়ি-কারণ। ফলতঃ যে উপাদানে কার্য্য নির্ম্মিত হয়, তাহাই সমবায়ি-কারণ। যে কারণ, সমবায়ি-কারণে

সমবেত, তাহা অসমবায়ি-কারণ। কপাল ও কপালিকার সংযোগ ঘটের অসমবায়ি-কারণ, তন্তুসকলের পরস্পর সংযোগ পটের অসমবায়ি-কারণ। কপাল ও কপালিকার সংযোগ না হইলে ঘট হয় না, তন্তু-সকলের পরস্পর সংযোগ না হইলে পট হয় না। সুতরাং কপাল-কপালিকার সংযোগ ঘটের এবং তন্তুসকলের পরস্পর সংযোগ পটের কারণ। কপাল-কপালিকার সংযোগ কপালে ও কপালিকাতে এবং তন্তুসকলের পরস্পর সংযোগ তন্তুতে সমবেত। কেন না, গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ সমবায়। সংযোগ গুণ এবং কপাল-কপালিকা ও তন্তু গুণী। সুতরাং কপাল-কপালিকার সংযোগ ঘটের এবং তন্তুসকলের পরস্পর সংযোগ পটের অসমবায়ি-কারণ। অসমবায়ি-কারণ নষ্ট হইলে দ্রব্যও বিনষ্ট হয়। সমবায়ি-কারণ ও অসমবায়ি-কারণ ভিন্ন সমস্ত কারণের নাম নিমিত্ত-কারণ। দণ্ডচক্রাদি ঘটের এবং তুরী-বেমাদি পটের নিমিত্ত-কারণ।

বৈশেষিকমতে প্রমাণ দুইপ্রকার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ-প্রমা ছয়প্রকার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমাণও ছয়প্রকার। চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসনা, শ্রোত্র, ত্বক্ ও মনঃ—এই ছয়টি প্রত্যক্ষপ্রমাণ। প্রমার করণের নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ছয়টি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমার করণ, অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাণ। যে কারণ কোনও একটি ব্যাপারের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার নাম করণ। যে পদার্থ যজ্জন্য হইয়া যজ্জন্যের জনক হয়, সে তাহার ব্যাপার; অর্থাৎ যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে বা তাহার কার্য্যসম্পাদনে সহায়তা করে, তাহাকে তাহার ব্যাপার বলা যায়। 'অসিনা ছিনত্তি' অর্থাৎ অসিদ্বারা ছেদন করিতেছে, এস্থলে অসি ছেদনক্রিয়ার করণ। ছেদ্য ও অসির সংযোগ ব্যাপার। কেন না, ছেদ্য ও অসির সংযোগ অসি-জন্য অর্থাৎ অসির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, এবং অসি-জন্য-কার্য্য অর্থাৎ অসির কার্য্য যে ছেদন, তাহার জনক বা সম্পাদক। ছেদ্যের সহিত অসির সংযোগ না হইলে ছেদনক্রিয়া হইতেই পারে না। 'কাষ্ঠৈঃ পচতি' অর্থাৎ কাষ্ঠদ্বারা পাক করিতেছে, এস্থলে কাষ্ঠ পাকের করণ। জ্বালা তাহার ব্যাপার। কাষ্ঠ না জ্বালিলে পাক

হয় না। জ্বালা কাষ্ঠ-জন্য অথচ কাষ্ঠজন্য পাকের জনক। প্রকৃতস্থলে বিষয়ের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ তাহাই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। কেন না, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়-জন্য, এবং ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানের জনক। অতএব বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয়প্রকার—সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় ও বিশেষণতা বা স্বরূপ। চক্ষুরিন্দ্রিয় ঘটের সহিত সংযুক্ত হইলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ। ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ ঘটত্বজাতি, ঘটগত শুক্লনীলাদি রূপ এবং সেই শুক্লনীলাদিরূপগত শুক্লত্ব নীলত্বাদি জাতিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহা অনুভবসিদ্ধ, ইহার অপলাপ করা যাইতে পারে না। কেন না, যে ব্যক্তি ঘটের প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ঘটটি কোন্-বর্ণ, ইহাও সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্বাদি-বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোন-রূপ সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। কারণ, তাহা না হইলে ঘটত্বাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বস্তুর প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত। ঘটত্বজাতি এবং শুক্ল রূপ ঘটসমবেত, অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধে ঘটবৃত্তি। সুতরাং ঘটত্বজাতি ও ঘটগত শুক্ল রূপের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইল সংযুক্ত-সমবায়। শুক্ল রূপ ঘটসমবেত, শুক্লত্বজাতি আবার ঐ শুক্ল রূপে সমবেত। অর্থাৎ শুক্লত্বজাতি শুক্ল রূপে সমবায়সম্বন্ধে আছে। তবেই শুক্লত্বজাতির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইতেছে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়। কেন না, ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত; শুক্ল রূপ ঘটসমবেত; শুক্লত্বজাতি শুক্লরূপ-সমবেত। এইরূপ ঘ্রাণ ও রসনার সহিত সংযুক্ত দ্রব্যের গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হয়, অতএব গন্ধ ও রসের সহিত ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায়। কেন না, গন্ধ ও রসের আশ্রয় বা অধিকরণ দ্রব্য যথাক্রমে ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়সংযুক্ত। গন্ধ ও রস ঐ দ্রব্য-সমবেত। গন্ধত্ব ও রসত্বের সহিত ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়। শব্দ

আকাশ-সমবেত। কর্ণপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, সুতরাং শব্দ-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ সমবায়। শব্দত্ব—কত্ব-গত্বাদি—প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ সমবেত-সমবায়। কেন না, শব্দত্বাদি শব্দসমবেত। অভাব-প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ বিশেষণতা বা স্বরূপ। ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণতাই সন্নিকর্ষ। কেন না, ভূতলের বিশেষণরূপেই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যে বস্তু যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সেই বস্তুর ধর্ম্ম এবং সেই বস্তুর অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ঘট চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতএব ঘটবৃত্তি গুণ-ক্রিয়াদি ধর্ম্ম ও ঘটের অভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

উদ্ভূত রূপ ও মহত্ত্ব বহির্দ্রব্য ও তদ্গত ক্রিয়া-গুণাদির প্রত্যক্ষের কারণ। উত্তপ্ত-ভর্জন-কপালে হস্ত লাগিলে হস্ত দগ্ধ হয়, সুতরাং তাহাতে অবশ্যই বহ্নি আছে, কিন্তু ঐ বহ্নির রূপ উদ্ভূত নহে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমাণুর মহত্ত্ব নাই, এইজন্য পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে বস্তুর গুণ-মাত্রই প্রত্যক্ষ হয়, বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। কণাদমতে বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয়। কেন না, বস্তু গুণসমষ্টিমাত্র নহে। বস্তু গুণের আধার। কোন বস্তু নষ্ট করিলে গুণের নাশ করা হয় না। গুণাশ্রয় বস্তুর নাশ করা হয়। জলপাত্রদ্বারা জল পান করা হয়, জলপাত্রের গুণদ্বারা জলের গুণ পান করা হয় না। অশ্ব বা শকটাদি আরোহণ করিয়া গমন করা হয়, তাহাদের গুণ আরোহণ করিয়া গমন করা হয় না। দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করা হয়, দীর্ঘতা পরিধান করা হয় না। দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে, শুক্ল ঘট, পীত পট দেখিতেছি। শুক্ল ও পীত গুণ দেখিতেছি, এতন্মাত্র অনুভব সর্ব্বত্র হয় না। অনুভব যদি পদার্থের বা বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-অবধারণের কারণ হয়, তবে ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মীর, গুণের ন্যায় গুণীরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করা উচিত।

আর এক কথা। মহত্ত্ব প্রত্যক্ষের কারণ। যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরমাণুর মহত্ত্ব নাই, এইজন্য পরমাণু অপ্রত্যক্ষ। মহত্ত্ব গুণগত নহে, দ্রব্যগত। দ্রব্যগত যে মহত্ত্ব দ্রব্যগত গুণের প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা দ্রব্যের প্রত্যক্ষের কারণ হইবে না, ইহা সমীচীন কল্পনা নহে। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, পরিদৃশ্যমান

ঘটপটাদি-দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জস্বরূপ নহে, পরমাণুপুঞ্জসমারব্ধ দ্রব্যান্তর। ঐ দ্রব্যান্তরের নাম অবয়বী। যাহার অবয়ব আছে, তাহার নাম অবয়বী। ঘটপটাদির অবয়ব আছে, অতএব তাহারা অবয়বী। যে-জাতীয় পরমাণু অবয়বীর আরম্ভক বা জনক হয়, অবয়বীও সেই-জাতীয় হইবে। যেমন, মৃদারব্ধ ঘট মৃজ্জাতীয়, রজতারব্ধ ঘট রজতজাতীয় ইত্যাদি। পরমাণু-পুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে—ঘটাদি-দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ-স্বরূপ হইলে, ঘটাদি-দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন দূরস্থ একটি কেশ প্রত্যক্ষ না হইলেও কেশগুচ্ছের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ এক একটি পরমাণু অপ্রত্যক্ষ হইলেও পরমাণুপুঞ্জ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্তটি ঠিক হইল না। কারণ, এক একটি কেশও ত অতীন্দ্রিয় নহে। কেন না, নিকটস্থ ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায়। দূরস্থ ব্যক্তি যে তাহা দেখিতে পায় না, এক একটি কেশের অতীন্দ্রিয়ত্ব তাহার কারণ নহে। কেন না, এক একটি কেশ অতীন্দ্রিয় হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিও তাহা দেখিতে পাইত না। কিন্তু দূরস্থ ব্যক্তি যে একটি কেশ দেখিতে পায় না, তাহার কারণ দূরত্ব-রূপ দোষ। যেমন কোন পক্ষী উড়িবার সময় প্রত্যক্ষ হইলেও আকাশের দূরতর প্রদেশে উৎপতিত হইলে আর প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর হয় না। দূরত্বই তাহার কারণ। সেইরূপ দূরস্থ একটি কেশ দৃষ্টিগোচর না হইবার কারণও দূরত্ব, কেশের অতীন্দ্রিয়ত্ব নহে। একটি কেশ যে-পরিমাণ দূরে থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই-পরিমাণ দূরে কেশগুচ্ছ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কারণ, ঐ দূরত্ব একটি কেশের উপর স্বপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও কেশগুচ্ছের উপর স্বপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তদপেক্ষা অধিকতর দূরত্ব ঘটিলে কেশগুচ্ছও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতস্থলে প্রত্যেকটি পরমাণু এক একটি কেশের ন্যায় কোনকালেই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং পরমাণু অতীন্দ্রিয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলে, পরমাণুপুঞ্জও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। কেন না, অতীন্দ্রিয় কিনা ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। স্ববিষয়ের প্রত্যক্ষেই কারণ-বশতঃ ইন্দ্রিয়ের পটুমন্দভাব হইতে পারে। কিন্তু অবিষয়ের গ্রহণ কোন-কালেও হয় না। একটি সুপক্ক আম্রফল দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহার

বর্ণ ও আকার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আম্রফলের দূরতা ও সন্নিধানের তারতম্যে দর্শনের অব্যক্ত ও পরিস্ফুট অবস্থা হইতে পারে মাত্র। 'কল্প আম্রফলে প্রচুরপরিমাণে মধুররস থাকিলেও কিছুতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়, রস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। সেইরূপ পরমাণু যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তখন প্রচুরপরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও তাহা অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে না। একটি ন্যায় আছে যে, 'শতমপ্যন্ধানাং ন পশ্যতি'—অর্থাৎ একটি অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, তেমনি শত অন্ধ একত্র হইলেও দেখিতে পায় না। কেন না, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাই। এবং একের পরে একটি বিন্দু দিলে দশ হয় বটে, কিন্তু এক সংখ্যা তুলিয়া লইয়া শত বিন্দু দিলেও কিছুই হইবে না। কেন না, একের সংযোগ ভিন্ন বিন্দুর কোনও কার্য্যকারিতা থাকে না। সেইরূপ মহত্ত্বের সহায়তা ভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তি কার্য্য করিতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরমাণু দেখিবার শক্তি নাই। চক্ষুর দ্বারা যেমন একটি পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ শত শত পরমাণু একত্র হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে না। এইজন্য অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুর অতিরিক্ত অবয়বারব্ধ অর্থাৎ পরমাণুদ্বারা সমারব্ধ অবয়বী অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 'একঃ স্থূলো মহান্ ঘটঃ' এই প্রত্যক্ষ অনুভব তাহার প্রমাণ।

বৌদ্ধেরা অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা এই মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহা অদৃশ্য, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা দৃশ্য বা দৃশ্যের উপাদান এবং মহৎ হইতে পারে না। উহা দৃশ্য বা মহৎ হইবার কারণ নাই। দৃশ্য ও মহান্ পরমাণুপুঞ্জ অদৃশ্য ও সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জ হইতে বস্তন্তর বলিয়া স্বীকৃত হইলে সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য ও স্থূল পরমাণু-পুঞ্জের উৎপত্তি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে উৎপন্ন পুঞ্জের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু দৃশ্য ও স্থূল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, যাহা প্রত্যেকে অদৃশ্য ও সূক্ষ্ম, তাহার সমষ্টিও দৃশ্য ও স্থূল হইতে পারে না। তাহা স্বীকার করিলে কিন্তু পরমাণু হইতে বস্তন্তরের উৎপত্তি উভয়বাদিসিদ্ধ হইতেছে। সেই বস্তন্তরের নাম

ন্যায়মতে অবয়বী, বৌদ্ধমতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ, এইমাত্র প্রভেদ। অর্থাৎ বস্তুন্তরের উৎপত্তি উভয় মতেই স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু সেই বস্তুর সংজ্ঞা বা নাম লইয়া বিবাদের পর্য্যবসান হইতেছে মাত্র। নৈয়ায়িকেরা ইহাও বলেন যে, ন্যায়মতে 'একো ঘটঃ'—এই প্রতীতির বিষয় একটি অবয়বী, আর বৌদ্ধমতে অসংখ্য পরমাণু। 'একো ঘটঃ'—এই প্রতীতির বিষয়তা একটি পদার্থে স্বীকৃত হওয়াই সঙ্গত; অনেক পদার্থে স্বীকৃত হওয়া অসঙ্গত ও গৌরবগ্রস্ত।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিনপ্রকার—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। সামান্যলক্ষণ অর্থাৎ যে সামান্য যাহাতে স্থিত, ঐ সামান্যই তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষস্বরূপ হয়। ঐ সামান্যের কোন একটি আশ্রয়ে চক্ষুঃসংযোগ হইলে, ঐ সামান্যরূপসম্বন্ধে সমস্ত তদাশ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোন একটি ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে ঘটত্বসম্বন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ইহার উদাহরণ। জ্ঞানলক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞানই সন্নিকর্ষস্বরূপ। যাহার জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান তাহারই অলৌকিক প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষস্বরূপ হয়। চন্দনখণ্ডে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলে 'সুরভি চন্দনম্' অর্থাৎ সুগন্ধযুক্ত চন্দন—এস্থলে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ সৌরভের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। যোগজধর্ম্মপ্রভাবে যোগিগণ অতীত-অনাগত, সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট, সর্ব্বপ্রকার পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অনুমিতির করণ অনুমান। সাধ্য, হেতু ও ব্যাপ্তির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ, কেন না, তদ্দ্বারা সাধ্য লিঙ্গিত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় বলিয়া পর্ব্বত পক্ষ। সিদ্ধির অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব পক্ষতা। অনুমিতির পূর্ব্বে পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় হয় নাই। অতএব পর্ব্বতে পক্ষতা আছে। সুতরাং পর্ব্বত পক্ষ। সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয় থাকিলেও সিষাধয়িষা কিনা সাধনের ইচ্ছা বা অনুমিৎসা কিনা অনুমিতির ইচ্ছা হইলে অনুমিতি হইতে পারে। আত্মার শ্রবণ ও মননাদি মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে বিহিত হইয়াছে।

বেদবাক্য শুনিয়া আত্মার বিষয়ে যে অববোধ বা জ্ঞান হয়, তাহার নাম শ্রবণ। এস্থলে বেদবাক্যশ্রবণে আত্মার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হইলে যদিও সিদ্ধির অভাব নাই, তথাপি সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা দ্বারা আত্মার মননরূপ অনুমান হইয়া থাকে। অনুমানের প্রণালী এইরূপ—প্রথমতঃ পর্ব্বতে ধূমদর্শন হয়। ইহাকে প্রথম লিঙ্গপরামর্শ বলা যায়। লিঙ্গ হেতু, পরামর্শ তাহার জ্ঞান। পর্ব্বতে ধূমদর্শন প্রথম লিঙ্গজ্ঞান। পরক্ষণে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ'—অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এইরূপ ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। ইহাই অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির করণ। ইহা দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তৎপরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ' অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের অপর নাম পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান। কেবল পরামর্শশব্দদ্বারাও ইহার নির্দ্দেশ করা হয়। তৎপরক্ষণে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ। পরামর্শ তাহার ব্যাপার। কেন না, পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অথচ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির জনক। প্রথম লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ হইতে পারে না। কেন না, কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিষ্কারণ কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানমাত্রই প্রায় দ্বিক্ষণস্থায়ী। প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে তাহার বিনাশ হয়। প্রথম লিঙ্গপরামর্শের অর্থাৎ ধূমদর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণে ব্যাপ্তিস্মরণ, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ, চতুর্থ ক্ষণে অনুমিতি হইয়া থাকে। প্রথম লিঙ্গপরামর্শ কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শক্ষণে অর্থাৎ অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষণে যে বস্তু বিনষ্ট হয়, সে ক্ষণে সে বস্তুর সত্তা থাকে না। কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের সত্তা না থাকিয়া তৎপূর্ব্বে সত্তা থাকা দিনান্তরে সত্তা থাকার তুল্য। তাদৃশ সত্তা কার্য্যোৎপত্তির কোনও উপকার করিতে পারে না। প্রথম লিঙ্গপরামর্শ বা প্রাথমিক লিঙ্গ-

জ্ঞান অনুমিতির করণ বা সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও পরম্পরা হেতু বা প্রযোজক বটে। কেন না, প্রথম লিঙ্গপরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানের, ব্যাপ্তি-জ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির হেতু বা কারণ।

যে হেতুবলে অনুমিতি হইবে, ঐ হেতুতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব, এই তিনটি রূপ বা ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। যে অধিকরণে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম সপক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম বিপক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিস্থলে পর্ব্বত পক্ষ, মহানস সপক্ষ এবং জলহ্রদ বিপক্ষ। ধূম পক্ষ-পর্ব্বত ও সপক্ষ-মহানসে আছে এবং বিপক্ষ-জলহ্রদে নাই, এইজন্য ধূমে ঐ রূপ-ত্রয় আছে। এই রূপত্রয়ের নাম গমকতৌপয়িক রূপ। গমকতা কিনা অনুমাপকতা, তাহার ঔপয়িক কিনা উপায়স্বরূপ। ধূম যে পরম্পরা-সম্বন্ধে বহ্নির অনুমিতির কারণ হয়, তাহার উপায়ভূত হইতেছে ঐ রূপ-ত্রয়। কারণ, হেতু পক্ষে না থাকিলে যে অনুমিতি হইতে পারে না, তাহা বলাই অনাবশ্যক। হেতু সপক্ষে না থাকিলেও ঐ হেতুবলে অনু-মিতি হইতে পারে না। কেন না, যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, সে অধিকরণে হেতু না থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিই থাকিতে পারে না। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে ঐ হেতুবলে সাধ্যের অনুমিতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলে ঐ হেতু সপক্ষে অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহাতে না থাকিয়াই পারে না। বিপক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহাতে হেতু থাকিলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। কারণ, যেখানে সাধ্যের অভাব আছে, সেখানে হেতু থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। কেন না, যেখানে সাধ্যের অভাব থাকে, সেখানে হেতু না থাকাই হইল ব্যাপ্তি। সুতরাং উক্ত রূপত্রয় গমকতার উপায়ভূত, সন্দেহ নাই। উক্ত রূপত্রয় বা তাহার কোন একটি রূপ হেতুতে না থাকিলেই ঐ হেতু গমকতৌপয়িক-রূপ-শূন্য হইবে। সুতরাং তাহা আপাততঃ

হেতু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে হেতু হয় না। এইজন্য তাদৃশ হেতুর নাম হেত্বাভাস। যাহা হেতুর ন্যায় ভাসমান হয়, প্রকৃতপক্ষে হেতু হইতে পারে না, তাহাই হেত্বাভাস। দুষ্ট হেতুর নামান্তর হেত্বাভাস। বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা কণাদের মতে হেত্বাভাসের নাম অনপদেশ। অপদেশ কিনা হেতু, যাহা হেতু নহে অথচ হেতুসদৃশ, তাহাই অনপদেশ বা হেত্বাভাস। কণাদমতে হেত্বাভাস তিনপ্রকার—অপ্রসিদ্ধ, অসন্ ও সন্দিগ্ধ। যে হেতুর প্রসিদ্ধি নাই, তাহার নাম অপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধি কিনা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অথবা ব্যাপ্তি থাকিলেও কোন কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, সে হেতু অপ্রসিদ্ধ। অপ্রসিদ্ধের অপর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এখানে ধূমের অনুমিতিবিষয়ে বহ্নিরূপ হেতু অপ্রসিদ্ধ বা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। অসন অর্থাৎ যে হেতু পক্ষে বা সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম অসন্। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। 'গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ'—গোত্ব সাধ্য, অশ্বত্ব হেতু, কিংবা 'অশ্বো বিষাণিত্বাৎ'—অশ্বত্ব সাধ্য, বিষাণিত্ব অর্থাৎ শৃঙ্গযুক্তত্ব হেতু, এই উভয় উদাহরণেই হেতু অসন্ বা বিরুদ্ধ। কেন না, গোপিণ্ডে অশ্বত্ব নাই, অশ্বপিণ্ডে শৃঙ্গ নাই। শঙ্করমিশ্রের মতে বিরুদ্ধও অপ্রসিদ্ধের অন্তর্গত। সাধ্যের সহিত যে হেতুর ব্যাপ্তি নাই, সাধ্যাভাবের সহিত ব্যাপ্তি আছে, সেই হেতু বিরুদ্ধ। সুতরাং উহা অপ্রসিদ্ধের অন্তর্গত। যে হেতু পক্ষে বিদ্যমান থাকে না, তাহা অসন্। 'হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ'—এখানে ধূমরূপ হেতু হ্রদরূপ পক্ষে বিদ্যমান নহে, সুতরাং উহা অসন্। যে হেতুতে সাধ্যব্যাপ্তির সন্দেহ হয় বা যে হেতু সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহমাত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম সন্দিগ্ধ। সন্দিগ্ধের অপর নাম অনৈকান্তিক। কেন না, সাধ্যও এক অন্ত, সাধ্যাভাবও এক অন্ত। যে হেতু একটি অন্তের সহিত অর্থাৎ কেবল সাধ্যের সহিত বা কেবল সাধ্যাভাবের সহিত সম্বদ্ধ, সে হেতু ঐকান্তিক। যে হেতু ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধ্যাভাব উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, সে হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব হেতু করিয়া গোত্ব সাধন করিতে গেলে বিষাণিত্ব-হেতু সন্দিগ্ধ বা অনৈকান্তিক।

কেন না, গোত্ব সাধ্য, বিষাণিত্ব হেতু। গো-পশুর যেমন বিষাণ অর্থাৎ শৃঙ্গ আছে, মহিষাদিরও সেইরূপ শৃঙ্গ আছে। সুতরাং বিষাণিত্ব-হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো-পশুতে আছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ, সেইরূপ সাধ্যের অর্থাৎ গোত্বের অভাবের অধিকরণ মহিষাদিতে আছে বলিয়া সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বদ্ধ। সুতরাং বিষাণিত্ব-হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব-হেতুদ্বারা গোত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না, গোত্বের সন্দেহ হইতে পারে মাত্র। এইজন্য ঐ হেতু সন্দিগ্ধ। বৈশেষিক-মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটিই প্রমাণ। শব্দাদি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, উহা অনুমানের অন্তর্গত। 'গৌরস্তি'—অর্থাৎ গো আছে, এই শব্দ শুনিলে, গো-পদার্থে অস্তিত্বের অনুমিতি হয়। ইহা বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মত। প্রত্যক্ষ ধূমদর্শনে যেমন অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ শব্দশ্রবণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হয়। লিঙ্গদর্শনেই হউক বা শব্দশ্রবণেই হউক, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞানমাত্রই অনুমিতি। সুতরাং নৈয়ায়িকসম্মত উপমানও বৈশেষিকমতে অনুমানের অন্তর্গত।

ষষ্ঠ লেক্‌চর।

ন্যায়দর্শন।
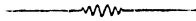
ন্যায়দর্শন মহর্ষি-গোতম-প্রণীত। কেহ কেহ তাঁহাকে গৌতমনামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। গৌতম তাঁহার নামান্তর থাকিতে পারে, কিন্তু গোতম যে তাঁহার নাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ চার্ব্বাকের মুখে ন্যায়দর্শনকর্ত্তার প্রতি তাঁহার নাম-ঘটিত যে উপহাসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ন্যায়দর্শনকর্ত্তা এবং তাঁহার দর্শনের প্রতি উপহাসপূর্ব্বক নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক বলিতেছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥

ন্যায়দর্শনের মতে আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসই মুক্তি। এই মুক্তিসম্পাদনের উদ্দেশে ন্যায়দর্শন প্রণীত। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখের অত্যন্তবিনাশ অসম্ভব। কেন না, অনিষ্ট বা অনভিমত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে দুঃখের উৎপত্তি ও অনুভব অনিবার্য্য। সুতরাং মুক্তিকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না; আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। শরীরেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার বিচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে আত্মার যেমন দুঃখ হইতে পারে না, সেইরূপ সুখও হইতে পারে না। অধিক কি, শরীরাদিসম্বন্ধ ভিন্ন আত্মার কোনরূপ জ্ঞান বা চেতনা হওয়াও একান্ত অসম্ভব। কেন না, আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তবে আত্মাতে জ্ঞানের বা চেতনার সঞ্চার বা উৎপত্তি হয়। মুক্তিকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে যেমন আত্মার চাক্ষুষাদি জ্ঞান হইতে পারে না, মনের সহিতও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া

সেইরূপ মানসিক জ্ঞানও হইতে পারে না। মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ মানসিক জ্ঞানের কারণ। ভিন্ন ভিন্ন মনের সহিত ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সম্বন্ধ আছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মানসিক জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে। মানসিক জ্ঞান সর্ব্বদা সমানভাবে হয় না, সুতরাং উহা কাদাচিৎক; যাহা কাদাচিৎক, তাহা কার্য্য; যাহা কার্য্য, অবশ্য তাহার কারণ থাকিবে। আত্মার সহিত মনঃসংযোগ মানসজ্ঞানের মুখ্য কারণ। ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ বা প্রত্যক্ষগম্য। অপিচ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের কারণ; তদ্ভিন্ন কোনও জ্ঞান হয় না। চক্ষুরাদি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ চাক্ষুষাদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কারণ। ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বদেহব্যাপী। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হউক না কেন, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ অপরিহার্য্য। কেন না, ত্বগিন্দ্রিয় দেহব্যাপী বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রদেশেই ত্বগিন্দ্রিয়ের বিদ্যমানতা রহিয়াছে। এখন প্রতিপন্ন হইল যে, মুক্তি-অবস্থাতে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আত্মার কোনরূপ সুখদুঃখ বা জ্ঞান থাকে না—থাকিতে পারে না। মৃত্তিকা-পাষাণাদি জড়পদার্থের ন্যায় মুক্তিকালে আত্মাও সুখদুঃখ এবং জ্ঞানাদির সম্পর্কপরিশূন্য হইয়া পড়ে। ন্যায়দর্শনের অভিমত মুক্তির এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চার্ব্বাক আস্তিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক উপহাসচ্ছলে বলিতেছেন—যে মহামুনির মতে মুক্তিকালে সুখদুঃখের ন্যায় জ্ঞান বা চেতনা পর্য্যন্ত থাকিবে না, সুতরাং মুক্তির অবস্থা এবং প্রস্তরাদির অবস্থার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, তাদৃশ মুক্ত্যবস্থার জন্য যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা গোতম বলিয়া ত জানই, কিন্তু গোতম বলিতে যেরূপ বুঝিতে পার, তাঁহাকে সেইরূপই বুঝিবে। চার্ব্বাকের অভিপ্রায় এই যে, গোশব্দ ও তমপ্রত্যয়ের যোগে গোতমশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গোশব্দের অর্থ গো-পশু, তমপ্রত্যয়ের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট। অতএব চার্ব্বাকের অভিপ্রায় অনুসারে গোতমশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট গো-পশু। যিনি জড়াবস্থারূপ মুক্তির জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গো-পশু বলিয়া বিবেচিত হইবারই যোগ্য। এতদ্দ্বারা স্থির হইতেছে যে, অন্ততঃ শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শনপ্রণেতার

নাম গোতম, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাঁহার আর একটি নাম অক্ষপাদ। তদনুসারে ন্যায়দর্শনেরও আর একটি নাম অক্ষপাদদর্শন। এই দর্শনে তর্কপদার্থ বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে এবং এই দর্শনের যথাবদনুশীলন করিলে তর্কশক্তির সবিশেষ সমুন্মেষ হয় বলিয়া ইহাকে তর্কশাস্ত্রও বলে। ন্যায়দর্শনের অপর নাম আন্বীক্ষিকী। 'অনু'শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, 'ঈক্ষা'শব্দের অর্থ দর্শন বা আলোচন। শ্রবণের পর আত্মার আলোচনা বা মনন 'অন্বীক্ষা'শব্দের অর্থ। ন্যায়দর্শন বা ন্যায়বিদ্যা অন্বীক্ষার নির্ব্বাহ করে বলিয়া তাহার নাম আন্বীক্ষিকী। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে অতি উচ্চতম স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

সেয়মান্বীক্ষিকী—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥

বিদ্যোদ্দেশে অর্থাৎ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সমস্ত বিদ্যার প্রদীপরূপে, সমস্ত কর্ম্মের উপায়রূপে এবং সমস্ত ধর্ম্মের আশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বনরূপে কথিত হইয়াছে। শ্লোকটির চতুর্থ চরণে "বিদ্যোদ্দেশে গরীয়সী" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তাহার অর্থ—বিদ্যার গণনায় আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শ্রেষ্ঠতর। আন্বীক্ষিকীকে এইরূপ উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়া ভাষ্যকার নিজের সূক্ষ্মদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন, কিছুমাত্র অত্যুক্তিদোষে দূষিত হন নাই। বস্তুতই আন্বীক্ষিকী তাদৃশ উচ্চাসন পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা—শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত। মোক্ষধর্ম্মে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, গরীয়সী আন্বীক্ষিকী অবলোকন করিয়া আমি উপনিষদের সারোদ্ধার করিতেছি। নব্যন্যায়ের অভ্যুদয়ে গোতমের ন্যায়দর্শনের বা আন্বীক্ষিকীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বর্ত্তমানসময়ে বিরল হইতে বিরলতর হইলেও, বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য, উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি-মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা, উদয়নাচার্য্যের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি, জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ন্যায়দর্শনে সচরাচর ৫৪৭টি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু মতভেদে এই সূত্রসংখ্যার কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। স্থলবিশেষে ভাষ্যের অংশবিশেষ সূত্ররূপে এবং সূত্র ভাষ্যের অংশবিশেষরূপে বিবেচিত হওয়াতেই সূত্রসংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি-মিশ্র-কৃত ন্যায়সূচীনিবন্ধ গ্রন্থে সূত্রসংখ্যা পরিশুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। বাচস্পতিমিশ্রের মতে ন্যায়দর্শনের সূত্রসংখ্যা ৫২৮। সূত্রগুলি ৫ অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায় দুই-দুইটি আহ্নিকে বিভক্ত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মহর্ষি গোতম দশদিনে ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক ও নির্ণয় পদার্থের নিরূপণ। দ্বিতীয়াহ্নিকে—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস ও ছলের নিরূপণ। দ্বিতীয়াধ্যায়ের উভয় আহ্নিকেই প্রমাণপরীক্ষা। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয়পরীক্ষা। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে জাতি এবং দ্বিতীয়াহ্নিকে নিগ্রহস্থান বিশেষরূপে নিরূপিত এবং প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর বিস্তর বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রটি এই—

প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

এই সূত্রদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গোতম ষোড়শপদার্থবাদী। তাঁহার মতে—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, এই ষোলটি পদার্থ। ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ করা যায়। তন্মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অন্যনিরপেক্ষরূপে নিঃশ্রেয়সহেতু, প্রমাণাদি-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরাসম্বন্ধে নিঃশ্রেয়সহেতু। দেহাদিতে আত্ম-নিশ্চয় সমস্ত অনর্থের মূল। দেহাদিতে আত্মনিশ্চয় আছে বলিয়া স্বভাবতই দেহাদির অনুকূলবিষয়ে রাগ বা উৎকট অভিলাষ এবং দেহাদির প্রতিকূল-বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে। রাগ ও দ্বেষ দোষ বলিয়া আখ্যাত। রাগ ও দ্বেষ থাকিলে তত্তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি অনিবার্য্য। যে বিষয়ে রাগ জন্মে, তাহার সংগ্রহ, এবং যে বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, তাহার পরিহার করিবার প্রবৃত্তি লোকের স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। কোন প্রবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিতবিষয়ে প্রবৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মের, এবং কোন প্রবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তিদ্বারা অধর্ম্মের সঞ্চয় হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখের হেতু,

জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ ভিন্ন সুখদুঃখ হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তি জন্মের কারণ। অর্থাৎ প্রবৃত্তিসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূত সুখদুঃখভোগের জন্য জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ হইয়া থাকে। শরীরপরিগ্রহ হইলে সুখদুঃখের ভোগ সম্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই যত অনর্থের মূল। আত্মা বাস্তবিক দেহাদি নহে, দেহাদি হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে 'দেহই আত্মা' এই মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয়। আত্মা অবিনাশী। দেহাদির ন্যায় আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জানাতে দেহাদির বিনাশ বা অনিষ্ট সম্পাদনে সমুদ্যত ব্যক্তির প্রতি যেমন দ্বেষ উপস্থিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহার বিনাশ সম্পাদন করিয়া অধর্ম্মসঞ্চয় করা হয়; আত্মা দেহাদি নহে, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর দেহের প্রতিকূল আচরণে সমুদ্যত ব্যক্তির প্রতি তেমন দ্বেষ হইতে পারে না, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত অধর্ম্মসঞ্চয়ও হয় না। যাঁহারা দেহকে আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহারা দেহের অনিষ্টকারীকে যেরূপ দ্বেষ করিয়া থাকেন, দেহের অনুকূল স্রক্‌-চন্দন-বসনাদির অনিষ্টকারীকে দ্বেষ করিলেও সেরূপ দ্বেষ করেন না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপগত হইলে রাগ-দ্বেষ অপগত হয়, রাগ-দ্বেষ অপগত হইলে তন্মূলক প্রবৃত্তি এবং তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয় অপগত হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট বা দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাহা আর থাকিতে পারে না, বা থাকিলেও ফল অর্থাৎ সুখদুঃখ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্মের অপগমে তৎফলভোগের জন্য জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ হয় না। শরীরপরিগ্রহের অপগম হইলেই দুঃখের অপগম হয়। এই দুঃখের অপগমেই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। এখন সংক্ষেপে গোতমোক্ত পদার্থগুলির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্রমার করণের নাম প্রমাণ। প্রমাণ চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রতি অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। 'প্রতি'শব্দের দ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ লাভ হইতেছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিষয়সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে বিষয়ের যে যথার্থ অনুভব হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষপ্রমা। বিষয়সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় এই প্রত্যক্ষপ্রমার করণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-

প্রমাণ। ইন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষপ্রমাণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ—ব্যাপার, তজ্জন্য বিষয়গোচর যথার্থ অনুভব বা প্রত্যক্ষপ্রমা—ফল। প্রত্যক্ষ প্রমার ফল—হান, উপাদান বা উপেক্ষাবুদ্ধি। অর্থাৎ বিষয়টি যথার্থরূপে জানিলে বিষয়টি যদি নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তদ্বিষয়ে হানবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা অনিষ্টকারী, অতএব ইহার সংস্রব পরিত্যাগ করা উচিত, এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞাতবিষয়টি উৎকৃষ্ট বা হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইলে তদ্বিষয়ে উপাদানবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা উপকারী অতএব ইহার সংগ্রহ করা উচিত, এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞাতবিষয়টি দ্বারা ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই হইতে পারে না বলিয়া বোধ হইলে তদ্বিষয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি হইয়া থাকে।

অনু পশ্চাৎ, মান জ্ঞান। অনুমিতিস্থলে প্রথমতঃ লিঙ্গদর্শন, তৎপরে লিঙ্গ-লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু-সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরিশেষে অপ্রত্যক্ষ অর্থের অর্থাৎ সাধ্যের জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অনুমিতি, ব্যাপ্তিজ্ঞান বা লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন করণ, পরামর্শ অর্থাৎ সাধ্য-ব্যাপ্তি-যুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান ব্যাপার। লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি-জ্ঞান করণ বলিয়া তাহাই অনুমান। কেন না, প্রথমতঃ লিঙ্গদর্শন, তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান বা স্মরণ হইয়া থাকে। 'অনু' পশ্চাৎ অর্থাৎ লিঙ্গ-দর্শনের পরে 'মান' কিনা জ্ঞান, ইহাই হইল অনুমান। লিঙ্গদর্শনের পরেই লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্বক। কেন না, লিঙ্গের প্রত্যক্ষ না হইলে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধস্মরণ হইতে পারে না। লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধও পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কেন না, অননুভূত-বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মহানসে বহ্নি ও ধূমের সহচার অর্থাৎ সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইলে তাহার পক্ষেই বহ্নিধূমের সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তির স্মরণ হইতে পারে, যে ব্যক্তি বহ্নি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য কখনও অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে বহ্নি-ধূমের ব্যাপ্তিস্মরণ অসম্ভব। ফলতঃ অব্যবহিত ভাবেই হউক বা ব্যবহিত ভাবেই হউক, অনুমানের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকিবে। অনুমান তিন-প্রকার—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে

পূর্ব্বে কারণের সত্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তদ্দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এইজন্য পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ, শেষশব্দের অর্থ কার্য্য। অতএব যেখানে কারণদ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়, তাহার নাম পূর্ব্ববৎ। মেঘের উন্নতিবিশেষ দেখিয়া, বৃষ্টি হইবে, এইপ্রকার অনুমান করা হইয়া থাকে। ঐ অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। এ স্থলে কারণের দ্বারা কার্য্যের অনুমান হইতেছে। কেন না, মেঘের উন্নতিবিশেষ বৃষ্টির কারণ। কার্য্যের দ্বারা কারণের অনুমানের নাম শেষবৎ। নদীর পরিপূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতাবিশেষ দর্শনে যে অতীত বৃষ্টির অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ অনুমান। কেন না, নদীর পরিপূর্ণতা এবং স্রোতের প্রখরতাবিশেষ বৃষ্টির কার্য্য। বৃষ্টিজলই উহা সম্পাদন করিয়াছে। সুতরাং এখানে কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান হইতেছে। পূর্ব্ববৎ ও শেষবৎ অনুমান ভিন্ন সমস্ত অনুমানের নাম সামান্যতোদৃষ্ট। দেশান্তরদৃষ্ট বস্তুর দেশান্তরে দর্শন ঐ বস্তুর গতিপূর্ব্বক দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহে দৃষ্ট ব্যক্তির রথ্যাতে দর্শন তাহার গতিপূর্ব্বক, সন্দেহ নাই। আদিত্যও দেশান্তরে দৃষ্ট হইয়া দেশান্তরে দৃষ্ট হয়, অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও আদিত্যের গতি অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট। কেন না, সামান্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, অন্যত্র দৃষ্টের অন্যত্র দর্শন গতিপূর্ব্বক। তদনুসারে আদিত্যের গতির অনুমান করা হইতেছে।

'পূর্ব্ববৎ'শব্দ মত্বর্থ-প্রত্যয় ও বতি-প্রত্যয়, এই উভয় প্রকারেই ব্যুৎপাদিত হইতে পারে। মত্বর্থ-প্রত্যয়-পক্ষে পূর্ব্ববৎশব্দের অর্থ পূর্ব্বযুক্ত, পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ। কারণযুক্ত অনুমানের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বতিপ্রত্যয়ান্ত হইলে পূর্ব্ববৎশব্দের অর্থ পূর্ব্ব-তুল্য। তদনুসারে প্রকারান্তরে অনুমানের ত্রৈবিধ্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে স্থলে সম্বন্ধগ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গ-লিঙ্গীর বা সাধ্য-সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট সাধনদ্বারা তথাবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সে স্থলে পূর্ব্বদৃষ্টের তুল্যরূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া ঐ অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট ধূমের তুল্য ধূম দেখিয়া পর্ব্বতাদিতে তথাবিধ

অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট বহ্নির তুল্য বহ্নির অনুমান হয়। এই অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ অনুমান। অর্থাৎ যে স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধন উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধনদ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। পূর্ব্ববৎ-অনুমান-স্থলে প্রত্যক্ষসাধনদ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদৃষ্ট নিয়তসম্বদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একটি পদার্থ দেখিয়া অপর পদার্থের অনুমান হয়। পরিশেষ অনুমানের নাম শেষবৎ অনুমান। একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং শব্দ সামান্য বা বিশেষাদি পদার্থ হইতেই পারে না। কেন না, সামান্যাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিন পদার্থ অনিত্য হইয়া থাকে। শব্দও অনিত্য, অতএব শব্দ—দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষরূপ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি। কোনও উৎপন্ন দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে থাকে না, অনেক দ্রব্যেই থাকে। কপাল ও কপালিকা এই দ্রব্যদ্বয় ঘটের অধিকরণ। যে সকল তন্তুদ্বারা পট বা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ সমস্ত তন্তু পটের অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য-সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বিদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। অতএব অবয়বদ্রব্য অবয়বিদ্রব্যের আশ্রয় বা অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য অনেক, সুতরাং অবয়বিদ্রব্যও অনেকাশ্রিত বা অনেকবৃত্তি। উহা একদ্রব্যবৃত্তি হইতেই পারে না। শব্দ কিন্তু একদ্রব্যবৃত্তি। আকাশ শব্দের অধিকরণ। আকাশ একমাত্র, অনেক নহে। জন্যদ্রব্যমাত্রই অনেকদ্রব্যবৃত্তি, শব্দ জন্য, অথচ একদ্রব্যবৃত্তি। এই হেতুতে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে না। শব্দকে কর্ম্মপদার্থ বলিয়া বিবেচনা করাও সঙ্গত নহে। তাহার কারণ এই যে, কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের জনক হয় না। শব্দ কিন্তু শব্দান্তরের জনক হইয়া থাকে। অভিঘাতদ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, দূরস্থ ব্যক্তি ঐ শব্দ শুনিতে পায় না। ঐ প্রথমোৎপন্ন শব্দ শব্দান্তরের উৎপত্তি করে, শব্দান্তর অপর শব্দের, অপর শব্দ অন্য শব্দের উৎপত্তি করে। এইরূপে বীচিতরঙ্গের ন্যায় শব্দপরম্পরার উৎপত্তি হইতে হইতে দূরস্থ শ্রোতার কর্ণ-

প্রদেশে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, দূরস্থ শ্রোতা সেই শব্দই শুনিতে পায়। নিকটস্থ ব্যক্তি তীব্র, দূরস্থ ব্যক্তি মন্দ, দূরতরস্থ ব্যক্তি মন্দতর শব্দ শুনিয়া থাকে। সকলে এক শব্দ শ্রবণ করিলে, তাহার তীব্র-মন্দ-ভাব হইতে পারে না। অতএব স্থির হইতেছে যে, উক্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শ্রবণ করে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শব্দ পর-পর শব্দের জনক। অতএব শব্দ কর্ম্ম নহে। কেন না, কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের জনক হয় না। উক্তপ্রকারে শব্দের দ্রব্যত্ব এবং কর্ম্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল। শব্দে সামান্যত্বাদির প্রসক্তি বা সম্ভাবনাই নাই। কেন না, শব্দ অনিত্য, সামান্যাদি নিত্য। সুতরাং সম্ভাবিতের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট রহিল, শব্দ সেই পদার্থ। এইরূপে শব্দের গুণত্ব স্থির হইতেছে। ইহাই শেষবৎ অনুমান।

যে লিঙ্গী বা সাধ্য কোনকালে প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ সাধ্য ও সাধন অনুসারে সামান্যতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে অনুমিত হয়, তাদৃশ নিত্যপরোক্ষ সাধ্যের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। কেন না, সে স্থলে সামান্যতঃ কোন বিষয় দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ের অনুমান হইতেছে। রূপাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। ছিদাদিক্রিয়া পরশু-প্রভৃতি-করণসাধ্য, পাকাদিক্রিয়া কাষ্ঠাদিরূপ-করণসাধ্য, এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বিশেষ-বিশেষ-করণসাধ্য দেখিয়া ক্রিয়ামাত্রই করণসাধ্য, এইরূপ সামান্যাকারে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয়। অনন্তর রূপাদির উপলব্ধিও ক্রিয়া, উহাও করণসাধ্য, এইরূপে রূপাদির উপলব্ধির করণ অনুমিত হয়। যাহা রূপাদির উপলব্ধির করণরূপে অনুমিত, তাহাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সকল অতীন্দ্রিয়। উহা কোনকালেও প্রত্যক্ষ হয় না। সচরাচর লোকে যে সকল সংস্থানকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে, উহা বস্তুতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা স্থান মাত্র। প্রকারান্তরে অনুমান দুইপ্রকার—স্বার্থ ও পরার্থ। নিজে বুঝিবার জন্য যে অনুমান করা হয়, লিঙ্গদর্শন ও ব্যাপ্তিস্মরণেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। পরার্থ অনুমান অর্থাৎ অন্যকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান হয়, তাহা ন্যায়সাধ্য। পঞ্চ-অবয়ব-যুক্ত বাক্যবিশেষের নাম ন্যায়। অবয়বসকল পরে প্রদর্শিত হইবে। প্রত্যক্ষ প্রায় বর্ত্তমানবিষয়গ্রহণেই পর্য্যব-

সিত। অনুমান তেমন নহে। অনুমানের কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমানের ন্যায় অতীত ও অনাগত বিষয়েও অপ্রতিহত। অর্থাৎ অনুমান বর্ত্তমান বিষয়ের ন্যায় অতীত ও অনাগত বিষয় গ্রহণেও সমর্থ। ধূমদর্শনে বর্ত্তমান অগ্নির, নদীবৃদ্ধিদর্শনে অতীত বৃষ্টির, এবং মেঘোন্নতিদর্শনে অনাগত বা ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান হয়।

প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যদ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন বা প্রজ্ঞাপনের নাম উপমান। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ এই পদার্থের এই নাম, বা এই বস্তু এই শব্দের অর্থ, এতাদৃশ জ্ঞান উপমানের ফল। উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। গবয়নামক একপ্রকার আরণ্য পশু আছে। গবয় কিরূপ পশু, তাহা নগরবাসীর অপরিজ্ঞাত। কথাপ্রসঙ্গে নগরবাসীর প্রশ্নানুসারে আরণ্যক বলিল যে, গবয়-পশু দেখিতে গো-পশুর মত। কালে ঐ নগরবাসী মৃগয়াদিপ্রয়োজনে অরণ্যে গমন করিলে তথায় দৈবাৎ একটি গবয়-পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নগরবাসী ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে গো-পশুর সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আরণ্যকের পূর্ব্ববাক্যানুসারে বুঝিতে পারিল যে, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুর নাম গবয় বা এইজাতীয় পশু গবয়-শব্দের অর্থ। এস্থলে প্রসিদ্ধ গো-পশুর সাদৃশ্যদ্বারা অপ্রসিদ্ধ গবয়-পশুর সাধন বা প্রজ্ঞাপন হইয়াছে। কেন না, অদৃষ্টপূর্ব্ব পশুতে গোপশুর সাদৃশ্য দর্শন করিয়াই, ইহার নাম গবয় বা এইজাতীয় পশু গবয়শব্দের অর্থ—দ্রষ্টা ঈদৃশ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে। প্রকৃতস্থলে অদৃষ্টপূর্ব্ব আরণ্য-পশুতে গোসাদৃশ্যদর্শন—করণ, আরণ্যকের বাক্য বা তদর্থের স্মরণ—ব্যাপার, এইজাতীয় পশু গবয়শব্দের অর্থ, এই জ্ঞান—ফল।

আপ্তোপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। শব্দপ্রতিপাদ্য-অর্থবিষয়ে যিনি অভ্রান্ত, যাঁহার প্রতারণাদিরূপ দূষিত অভিসন্ধি নাই, নিজে যাহা যথার্থ বলিয়া জানিয়াছেন, তাহা অন্যকে বুঝানই যাহার উদ্দেশ্য, তিনিই তদ্বিষয়ে আপ্ত। তাঁহার উপদেশ শব্দরূপ প্রমাণ। ভাষ্যকার বলেন, এই হিসাবে ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছ, সকলেই আপ্ত হইতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, এই সকল প্রমাণদ্বারা দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির ব্যবহারনির্ব্বাহ হয়, তদ্ভিন্ন হইতে পারে না।

প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার। এই প্রমেয়ের জ্ঞান অপবর্গের উপযোগী। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশটি প্রমেয়। আত্মা দ্রষ্টা ও ভোক্তা। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু। যে-জাতীয় বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ সুখের উপলব্ধি হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিষয় দর্শন করিলে তাহার উপাদানবিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে। অনেকার্থদর্শী এক বস্তুরই এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে। যে পূর্ব্বে কোন-জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষে সুখের অনুভব করিয়াছিল, তাহারই কালান্তরে তজ্জাতীয় অপর পদার্থ দর্শন করিলে তাহার উপাদানবিষয়ে ইচ্ছা হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বাপরকালস্থায়ী সুখোপলব্ধি এবং সুখসাধনার্থ-বিষয়িণী ইচ্ছার কর্ত্তা এক পদার্থ স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই পদার্থই আত্মা। উক্তরীতিক্রমে দ্বেষাদিদ্বারাও আত্মার অনুমান করা হইতে পারে। আত্মার ভোগায়তন অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মা ভোগ করেন, তাহাই শরীর। আত্মার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় পাঁচপ্রকার — ঘ্রাণ, রসন বা রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র। ইন্দ্রিয়সকল ভূত হইতে উৎপন্ন। ভূত পাঁচপ্রকার—পৃথিবী, অপ্ বা জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, রসনেন্দ্রিয় আপ্য বা জলীয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস, ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয় ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশীয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের নাম অর্থ। ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় রস, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ। সুতরাং অর্থ পাঁচ-প্রকার। বুদ্ধি—উপলব্ধি কিনা জ্ঞান। স্মরণ, অনুমান ও সংশয় প্রভৃতির এবং সুখাদিপ্রত্যক্ষের করণ মন। বহিরিন্দ্রিয়সকল ভৌতিক, এইজন্য স্বস্বপ্রকৃতিভূত পদার্থের অসাধারণ-গুণগ্রহণ-মাত্র বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়সকলের বিষয় নিয়মিত বা ব্যবস্থিত। মন অভৌতিক। এইজন্য মন সর্ব্ব-বিষয়। বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় মনের বিষয় নিয়মিত নহে। আরও এক কথা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকিলেও এককালে অনেক জ্ঞান হয় না। এতদ্দ্বারাও মন অনুমিত হইতে পারে। অনুমিত হইতে পারে যে, এমন একটি সহকারী নিমিত্তান্তর আছে, যাহার সংযোগ হইলেই ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মাইতে পারে, নচেৎ

পারে না। সেই নিমিত্তান্তরের নাম মন। প্রবৃত্তি তিনপ্রকার—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। দানাদির আচরণরূপ শারীরিক প্রবৃত্তি, হিতোপদেশাদিরূপ বাচিক প্রবৃত্তি এবং দয়াদিরূপ মানসিক প্রবৃত্তি ধর্ম্ম বা পুণ্যের হেতু। হিংসাদিরূপ শারীরিক প্রবৃত্তি, অনৃতভাষণাদিরূপ বাচিক প্রবৃত্তি এবং পরদ্রোহাদিরূপ মানসিফ প্রবৃত্তি অধর্ম্ম বা পাপের হেতু। প্রবৃত্তির হেতু দোষ। দোষ তিনপ্রকার—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। আসক্তিলক্ষণ রাগ বা অমর্ষলক্ষণ দ্বেষ না হইলে কোন বিষয়েই প্রবৃত্তি হয় না। মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন রাগ-দ্বেষের আবির্ভাব হয় না। ইহা প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ প্রভৃতি রাগপক্ষ বা রাগের অন্তর্গত (১)। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ প্রভৃতি দ্বেষপক্ষ বা দ্বেষের অন্তর্নিবিষ্ট (২)। মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্য্যয়, বিচিকিৎসা বা সংশয়, মান ও প্রমাদ প্রভৃতি মোহপক্ষ বা মোহের প্রকারভেদ (৩)। জন্মমরণপ্রবন্ধ বা পুনঃপুনঃ জন্মমরণের নাম প্রেত্যভাব। প্রপূর্ব্ব ইণ্‌ধাতু হইতে প্রেত্যশব্দ এবং ভূধাতু হইতে ভাবশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইণ্‌ধাতুর অর্থ গতি, ভূধাতুর অর্থ উৎপত্তি। প্রকৃষ্টরূপে গমন কিনা মরণ। ভাব কিনা উৎপত্তি। প্রেত্যভাব কিনা মরণানন্তর উৎপত্তি। উপাত্ত-দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধবিচ্ছেদের নাম মরণ,

(১) কাম—রতির ইচ্ছা। রতি সংযোগবিশেষ। নিজের প্রয়োজনের অভিসন্ধি না থাকিলেও পরের অভিপ্রেত বিষয়ের নিবারণ করিবার ইচ্ছার নাম মৎসর। ধর্ম্মের অবিরোধে কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছার নাম স্পৃহা। ধনাদির যেন ক্ষয় হয় না, এতাদৃশ ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা। ধর্ম্মবিরোধে দ্রব্যপ্রাপ্তির ইচ্ছার নাম লোভ।

(২) নেত্রলৌহিত্যাদির হেতু দ্বেষবিশেষের নাম ক্রোধ। ঈর্ষ্যার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। অবিভক্ত ধনে সকলের স্বত্ব আছে, কিন্তু ঐ ধন এক জনে লইলে অপরের যে দ্বেষ হয়, তাহার নাম ঈর্ষ্যা। পরগুণে দ্বেষ অসূয়া। যে দ্বেষ অনিষ্টসম্পাদন করে, তাহার নাম দ্রোহ।

(৩) অযথার্থ নিশ্চয়ের নাম মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্য্যয়। অনবস্থিত জ্ঞান—বিচিকিৎসা বা সংশয়। নিজের যে গুণ নাই, সেই গুণ আরোপ করিয়া নিজের উৎকর্ষবুদ্ধির নাম মান। কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত বিষয়ে অকর্ত্তব্যতাবুদ্ধি এবং অকর্ত্তব্যরূপে অবধারিত বিষয়ে কর্ত্তব্যতাবুদ্ধির নাম প্রমাদ।

অভিনব-দেহাদির সহিত সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি বা জন্ম। দোষ ও প্রবৃত্তিজনিত অর্থ অর্থাৎ সুখদুঃখের অনুভব ফল। দোষ ও প্রবৃত্তিবশতঃ সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখের, এবং অসৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। লোক যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আচরণ করে, তদ্দ্বারা সুখের বা দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব সুখদুঃখানুভব ফল, তদ্ভিন্ন ফলান্তর নাই। দুঃখ বাধনালক্ষণ। বাধনা কিনা পীড়া বা তাপ। শরীরেন্দ্রিয়াদি দুঃখসাধন, সুখও দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ সুখের সহিত দুঃখের একপ্রকার নিয়ত সম্বন্ধ বলিয়া, শরীর-ইন্দ্রিয়াদি এবং সুখ গৌণরূপে দুঃখ বলিয়া পরিগণিত। দুঃখ সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। দুঃখের অত্যন্তবিনাশ অপবর্গ।

অনবধারণ জ্ঞানের নাম সংশয়। সাধারণধর্ম্মজ্ঞান, অসাধারণধর্ম্মজ্ঞান, বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি—এই পাঁচটি সংশয়ের কারণ। সুতরাং কারণভেদে সংশয় পাঁচপ্রকার। বিশেষ ধর্ম্মের অর্থাৎ যে সকল ধর্ম্মের সংশয় হয়, তাহাদের স্মরণ সমস্ত সংশয়ের সাধারণ কারণ। বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ না হইলে কোনও সংশয় হইতে পারে না। সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। দূর হইতে উর্দ্ধ বা উচ্চ কোন পদার্থ দৃষ্ট হইলে, 'ইহা স্থাণু কি মনুষ্য' এবং চাকৃচিক্যশালী পদার্থ দৃষ্ট হইলে, 'ইহা শুক্তি কি রজত' ইত্যাকার সংশয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোদাহরণে উর্দ্ধত্ব বা উচ্চত্ব স্থাণু ও মনুষ্যের এবং দ্বিতীয় উদাহরণে চাকৃচিক্য শুক্তি ও রজতের সাধারণ ধর্ম্ম। উদাহরণদ্বয়ে যথাক্রমে স্থাণুত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং শুক্তিত্ব ও রজতত্বরূপ বিশেষধর্ম্মের স্মরণসহকারে উক্ত সাধারণধর্ম্মজ্ঞান সংশয় উৎপাদন করিতেছে। সাধারণ ধর্ম্মের অর্থাৎ উর্দ্ধত্ব ও চাকৃচিক্যের জ্ঞান হইলেও স্থাণুত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং শুক্তিত্ব ও রজতত্বরূপ বিশেষধর্ম্মের স্মরণ না হইলে ঐরূপ সংশয়ের উৎপত্তি একান্তই অসম্ভব। সন্দিহ্যমান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে-সকল-ধর্ম্মপ্রকারে সংশয় হয়, তাহার জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে তাহার সংশয় হইতে পারে? এই সন্দিহ্যমান ধর্ম্মের অপর নাম কোটি। ইহা স্থাণু কি মনুষ্য, ইহা দ্বিকোটিক সংশয়। সিদ্ধ হইতেছে যে, সন্দিহ্যমান কোটির স্মরণসহকারে সাধারণাদি-ধর্ম্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ।

শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এই সংশয় অসাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্য। শব্দের ধর্ম্ম

শব্দত্ব। নিত্যরূপে পরিজ্ঞাত আকাশাদিপদার্থে এবং অনিত্যরূপে পরিজ্ঞাত ঘটাদিপদার্থে শব্দত্ব থাকে না, এইজন্য শব্দত্ব অসাধারণ ধর্ম্ম। উদ্ধত্বধর্ম্ম যেমন স্থাণু ও মনুষ্য উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম, শব্দত্বধর্ম্ম তদ্রূপ নিত্য ও অনিত্যের সাধারণ ধর্ম্ম নহে, প্রত্যুত নিত্য ও অনিত্য এ উভয় হইতে ব্যাবৃত্ত। অর্থাৎ পরিজ্ঞাত নিত্য ও অনিত্য কোন পদার্থেই শব্দত্ব নাই। অথচ পদার্থমাত্রই হয় নিত্য, না হয় অনিত্য, ইহার কোনও এক প্রকারের অন্তর্গত হইবে। নিত্য বা অনিত্য ভিন্ন তৃতীয়শ্রেণীর পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। নিত্য ও অনিত্য, এই কোটিদ্বয়ের স্মরণসহকারে অসাধারণ অর্থাৎ নিত্যানিত্যব্যাবৃত্ত শব্দত্বধর্ম্মের জ্ঞান উক্ত সন্দেহের কারণ।

বিপ্রতিপত্তিও সংশয়ের কারণ। বিপ্রতিপত্তি কিনা এক বিষয়ে এক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের বা বস্তুদ্বয়ের জ্ঞান। বি—বিরুদ্ধ, প্রতিপত্তি—জ্ঞান। কোন দার্শনিক বলেন, সংঘাতের অতিরিক্ত আত্মা আছে। কোন দার্শনিক বলেন, সংঘাতের অতিরিক্ত আত্মা নাই। ইহা বিপ্রতিপত্তি। কারণ, এক সময়ে এক পদার্থে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব থাকিতে পারে না বলিয়া অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। দার্শনিকদিগের মতভেদ দর্শন করিয়া, বস্তুগত্যা সংঘাতের অতিরিক্ত আত্মা আছে কি না, লোকের এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপলব্ধি—জ্ঞান। যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, বা অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমানও হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, জলাশয়ে বিদ্যমান জলের এবং মরীচিকাতে অবিদ্যমান জলের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং উপলভ্যমান বিষয়টি অর্থাৎ যাহার উপলব্ধি হইতেছে, তাহা বস্তুগত্যা সৎ অথবা অসৎ, এইরূপ সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে। উপলব্ধিই উক্ত সংশয়ের কারণ। উপলব্ধির ন্যায় অনুপলব্ধিও সংশয়ের কারণ। কেন না, অবিদ্যমান বস্তুর ন্যায় অবস্থা বা সময়বিশেষে বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি হয় না। অতএব অনুপলভ্যমান বস্তু সৎ অথবা অসৎ, এইরূপ সংশয় হইতে পারে। মন্দান্ধকারে কোন ক্ষুদ্রবস্তু অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে, এই বস্তুটি এখানে আছে, অন্ধকারে দেখিতে পাওয়া গেল না, অথবা ইহা এখানে নাই—অনুসন্ধাতার অন্তঃকরণে এইরূপ

সন্দেহ বা সংশয় হইয়া থাকে। আলোকের সাহায্যে ঐ সন্দেহ অপনয়ন করিয়া একতর অবধারণ করা হয়।

যদুদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। লোকে যে-কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখপরিহার তাহার চরম লক্ষ্য। অতএব সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন সমস্তই গৌণ প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত।

যাহাদের স্বাভাবিক বা শিক্ষাজন্য বুদ্ধির উৎকর্ষ নাই, চলিতভাষায় যাহাদিগকে সাধারণ লোক বলা হয়, তাহারা লৌকিক। যাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ স্বভাবতঃ বা শিক্ষাদ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা তর্কানুসারে প্রমাণদ্বারা অর্থ পরীক্ষা করিতে সক্ষম, তাঁহারা পরীক্ষক। যে বিষয়ে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের বুদ্ধিসাম্য আছে অর্থাৎ যে বিষয়টি লৌকিকেরা যেরূপ বুঝে, পরীক্ষকেরাও সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন—যে বিষয়ে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের মতভেদ হয় না, তাহার নাম দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত দুইপ্রকার—সাধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত ও বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্ত।

অভ্যুপগম কিনা স্বীকার অর্থাৎ নিশ্চয়। অর্থের অভ্যুপগম বা অভ্যুপগম্যমান অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার—সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, অধিকরণ সিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। তন্ত্র—শাস্ত্র। স্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের নাম সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, প্রমাণদ্বারা অর্থগ্রহণ, এ সমস্ত সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত সমানতন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্রসিদ্ধ নহে, অথবা যে সিদ্ধান্ত স্বশাস্ত্রমাত্রসিদ্ধ, তাদৃশ সিদ্ধান্তের নাম প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, আত্মার কোনও গুণ নাই,—সাংখ্যদিগের এই সকল সিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। কেন না, উহা সমানতন্ত্র-পাতঞ্জলদর্শন-সিদ্ধ, পরতন্ত্র ন্যায়াদিদর্শন-সিদ্ধ নহে। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়, উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ হয়, আত্মার কতগুলি গুণ আছে—এই সকল নৈয়ায়িকদিগের প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। কেন না, উহা সমানতন্ত্র-বৈশেষিকদর্শন-সিদ্ধ, পরতন্ত্র-সাংখ্যাদিদর্শন-সিদ্ধ নহে। যে অর্থের সিদ্ধি হইলে আনুষঙ্গিকরূপে অপর অর্থও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে অর্থসিদ্ধি ভিন্ন যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহার নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা এক পদার্থের

গ্রহণ হইয়া থাকে। যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখন স্পর্শ করিতেছি। এইরূপ শত শত অনুভব সর্ব্বলোকসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ। ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে এক আত্মার দর্শন ও স্পর্শন অসম্ভব। কেন না, দর্শন চক্ষু-রিন্দ্রিয়সাধ্য, স্পর্শন ত্বগিন্দ্রিয়সাধ্য। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্পর্শনক্ষমতা নাই, ত্বগিন্দ্রিয়ের দর্শনক্ষমতা নাই। তবেই সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে, ত্বগিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনের এবং ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শনের কর্ত্তা আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ। ইহা সিদ্ধ হওয়াতে আনুষঙ্গিকরূপে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় এক নহে, নানা। ইন্দ্রিয়সকল নিয়তবিষয়, ইন্দ্রিয়-সকল জ্ঞাতা নহে, জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, দর্শনাদি জ্ঞান হইতেছে বলিয়াই তত্তৎ জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়সকল অনুমেয়, এবং গন্ধাদি গুণের অধিকরণ দ্রব্য গন্ধাদিগুণমাত্র নহে—গন্ধাদি গুণ হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ।

প্রতিবাদী যাহা বলিল, তাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত, ইহার বিচার না করিয়াই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ বিষয়সংক্রান্ত কোন বিশেষ ধর্ম্মাদির বিচার করার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অযুক্তিই হউক, তাহা মানিয়া-লইয়া প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্গত বিশেষের পরীক্ষাই অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মীমাংসক-মতে শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য। নৈয়ায়িকমতে শব্দ গুণপদার্থ ও অনিত্য। বিচারমুখে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া-লইয়া তাহার নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। নৈয়ায়িক গর্ব্বের সহিত বলেন যে, হোক শব্দ দ্রব্য, উহা নিত্য কি অনিত্য। এই বিচারে শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিয়া নৈয়ায়িক প্রকারান্তরে মীমাংসককে পরাস্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলেন, নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্তাপ্রখ্যাপনের জন্য এবং প্রতিবাদীর বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের অবতারণা হইয়া থাকে। কারণ, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু তথাপি তোমার মত টিকিতে পারিতেছে না, কেন না,

তাহাতেও অন্যপ্রকার দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত-বাদী প্রকারান্তরে এইরূপে প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা ও নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যে শব্দসমূহ বা বাক্যসমূহ অনুসারে সাধনীয় অর্থের কিনা সাধ্যের সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমিতি পরিসমাপ্ত হয়, তাহার নাম ন্যায়। ন্যায়ের একদেশ অবয়ব। অবয়ব পাঁচপ্রকার—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। সাধনীয়-ধর্ম্মযুক্ত-রূপে ধর্ম্মীর নির্দ্দেশ প্রতিজ্ঞা। যদ্দ্বারা সাধ্যের সাধন হইতে পারে, তাহার নাম হেতু। হেতু দুইপ্রকার সাধর্ম্ম্য-হেতু বা অন্বয়ী হেতু এবং বৈধর্ম্ম্যহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু। উদাহরণের সমান ধর্ম্ম অনুসারে যে হেতু সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধ্যের সিদ্ধি কিনা অনুমিতি সম্পাদন করে, তাহার নাম সাধর্ম্ম্যহেতু বা অন্বয়ী হেতু। যে হেতু উদাহরণের বিপরীত ধর্ম্ম অনুসারে সাধ্যের সাধক হয়, তাহার নাম বৈধর্ম্ম্যহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু। উদাহরণ কিনা দৃষ্টান্ত। তাহাও সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভেদে দুইপ্রকার—সাধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণস্থলে, 'তথা' এইরূপে, এবং বৈধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণস্থলে, 'ন তথা' এইরূপে, পক্ষে সাধ্যের উপসংহারের নাম উপনয়। হেতুকথন-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার পুনঃকথন নিগমন। উদাহরণের সাহায্যে অবয়ব-গুলির স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 'অনিত্যঃ শব্দঃ' অর্থাৎ শব্দ অনিত্য—ইহা প্রতিজ্ঞা। এস্থলে শব্দ ধর্ম্মী, অনিত্যত্ব ধর্ম্ম এবং তাহা সাধনীয় বা সাধ্য। সাধনীয় ধর্ম্ম অনিত্যত্ব, তদ্‌যুক্তরূপে শব্দরূপ ধর্ম্মীর নির্দ্দেশ হইয়াছে। অতএব, 'অনিত্যঃ শব্দঃ'—ইহা প্রতিজ্ঞা। 'উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্বাৎ' অর্থাৎ যেহেতু শব্দে উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম আছে। ইহা হেতু। 'উৎপত্তিধর্ম্মকং স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিত্যং দৃষ্টম্' অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক কিনা যাহার উৎপত্তি আছে, তথাবিধ স্থালী প্রভৃতি দ্রব্য অনিত্য দেখা গিয়াছে। ইহা সাধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণ। 'অনুৎপত্তিধর্ম্মকমাত্মাদি দ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টম্' অর্থাৎ অনুৎপত্তিধর্ম্মক কিনা যাহার উৎপত্তি নাই, তাদৃশ আত্মাদি দ্রব্য নিত্য দেখা গিয়াছে। ইহা বৈধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণ। 'তথা শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মকঃ' অর্থাৎ স্থাল্যাদি অনিত্যদ্রব্যের ন্যায় শব্দও উৎপত্তিধর্ম্মক কিনা স্থাল্যাদির ন্যায় শব্দেরও উৎপত্তি আছে। ইহা

সাধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণপক্ষে উপনয়। ‘ন চ তথা শব্দঃ’ অর্থাৎ আত্মাদি নিত্যদ্রব্যের ন্যায় শব্দ অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে। ইহা বৈধর্ম্ম্যযুক্ত উদাহরণপক্ষে উপনয়। ‘তস্মাদুৎপত্তিধর্ম্মকত্বাদনিত্যঃ শব্দঃ’ অর্থাৎ অতএব উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম আছে বলিয়া শব্দ অনিত্য, ইহা নিগমন। প্রতিজ্ঞাদ্বারা ধর্ম্মী অর্থাৎ পক্ষের সহিত ধর্ম্ম অর্থাৎ সাধ্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা হয়। উদাহরণস্থিত ধর্ম্মের সমান বা বিপরীত ধর্ম্মের সাধকত্বপ্রদর্শন হেতুর কার্য্য। উদাহরণদ্বারা সাধকধর্ম্ম ও সাধ্যধর্ম্মের সাধ্যসাধনভাব প্রদর্শিত হয়। সাধকধর্ম্ম ও সাধ্যধর্ম্মের প্রকৃত ধর্ম্মীতে সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অবস্থিতির প্রদর্শন করা উপনয়ের কার্য্য। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয় দ্বারা যাহা সমর্থিত হইল, নিগমনদ্বারা তাহার বিপরীত প্রসঙ্গের নিরাস করা হয়। হেতু এবং উদাহরণ পরিশুদ্ধ হইলে অনুমানের কোনও দোষ হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও উপনয়—এই দুইটিমাত্র অবয়ব। ইউরোপীয় নৈয়ায়িক এবং ভারতীয় বৈদান্তিক তিনটিমাত্র অবয়ব মানেন। ইউরোপীয়মতে এবং বৈদান্তিকমতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বৈদান্তিকমতে পক্ষান্তরে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনের পরিবর্ত্তে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ, এই তিনটি অবয়বও স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা দশটি অবয়ব মানিতেন। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

যে বিষয়ের তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থ্য জানা যাইতেছে না, সেই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য কারণের উপপত্তি অনুসারে একতর পক্ষের উহ অর্থাৎ অভ্যনুজ্ঞা বা সম্ভাবনার নাম তর্ক। যে বিষয়ের তত্ত্ব জানা যাইতেছে না, তাহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়া লোকের স্বাভাবিক। তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইলেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের আলোচনা হয়। অর্থাৎ ইহা এইপ্রকার কি এইপ্রকার নহে—এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দিহ্যমান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে যে ধর্ম্মের কারণের উপপত্তিবোধ হয়, তাহার অনুজ্ঞা বা সম্ভাবনা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা এইরূপ হইতে পারে, এতাদৃশ সম্ভাবনা বা অনুজ্ঞা হইয়া থাকে। এই সম্ভাবনাই তর্ক। একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মার তত্ত্ব জানি-

বার ইচ্ছা হইলে প্রথমতঃ আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক কি অনুৎপত্তিধর্ম্মক— এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। পরে কারণের উপপত্তি অনুসারে বক্ষ্যমাণরূপে তর্কের অবতারণা হয়। আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইলে বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেও আত্মা ছিল, সুতরাং তাহার দেহান্তরও ছিল। ঐ দেহান্তরে অবশ্য কর্ম্মও আচরিত হইয়াছিল। সুতরাং আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইলে পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মের ফলভোগার্থ আত্মার বর্ত্তমান দেহপরিগ্রহ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলোপভোগ এবং একই আত্মার নানাদেহসম্বন্ধ হইতে পারে। এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা শরীরাদির আত্যন্তিক বিয়োগও সম্ভবপর। এইরূপে আত্মা অনুৎপত্তিধর্ম্মক হইলে, তাহার সংসার ও অপবর্গ, উভয়ই হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে, তাহার সংসার বা অপবর্গ, কিছুই হইতে পারে না। কেন না, আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে বলিতে হইবে যে, অভিনব উৎপন্ন দেহাদির সহিত অভিনব উৎপন্ন আত্মার সম্বন্ধ হয়। ইহা ত আত্মার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মের ফল নহে। কারণ, পূর্ব্বে আত্মাই ছিল না। সুখদুঃখাদির কারণ কর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে তাহার সংসার হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম ভিন্ন অভিনব-দেহসম্বন্ধনিবন্ধন সুখদুঃখভোগ হওয়া অসম্ভব। এবং শরীরের সহিত উৎপন্ন আত্মা শরীরের সহিত বিনষ্ট হইবে, সুতরাং আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক হইলে তাহার অপবর্গও হইতে পারে না। অতএব আত্মা উৎপত্তিধর্ম্মক নহে, ইহাই সম্ভবপর।

নব্য নৈয়ায়িকেরা বলেন, আপত্তিবিশেষের নাম তর্ক। অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের অভাবনিশ্চয় আছে, সেই ধর্ম্মীতে ব্যাপ্যের আহার্য্য আরোপ অর্থাৎ ব্যাপ্য তথায় থাকিতে পারে না, এরূপ নিশ্চয়সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাপ্যের আরোপ করিয়া, তন্নিবন্ধন ব্যাপকের আহার্য্যারোপ অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক আরোপই তর্ক। 'ধূমবান্ স্যাৎ বহ্নিমান্ স্যাৎ' অর্থাৎ জলহ্রদ যদি ধূমবান্ হইতে পারে, তবে বহ্নিমান্ও হইতে পারে, ইত্যাদি আপত্তিই তর্ক। এখানে ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি ব্যাপক। জলহ্রদে ধূমের এবং বহ্নির অভাবের নিশ্চয় আছে। অথচ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে ধূমের

আরোপ করিয়া তন্নিবন্ধন বহ্নির আহার্য্য আরোপ করা হইয়াছে। তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে, প্রমাণের অনুগ্রাহক অর্থাৎ সহকারী।

পরপক্ষদূষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ের নাম নির্ণয়। স্থলবিশেষে সংশয়পূর্ব্বক এবং স্থলবিশেষে সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইয়া থাকে। নির্ণয় প্রমাণ ও তর্কের ফল।

তত্ত্বনির্ণয় বা বিজয় অর্থাৎ পরপরাজয় উদ্দেশে ন্যায়ানুগত বচন-পরম্পরার নাম কথা। কথা তিনপ্রকার—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। পরপরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম বাদ। বাদকথাতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই তত্ত্বনির্ণয়ের দিকেই লক্ষ্য থাকে, সুতরাং এক পক্ষ অপর পক্ষের ন্যূনতাদি ধর্ত্তব্য করেন না। বাদকথাতে প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষদূষণ করা হয়। সিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয় না এবং বাদকথা পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ বীতরাগ অর্থাৎ নিজের জয় বা প্রতিপক্ষের পরাজয়বিষয়ে অভিলাষশূন্য ব্যক্তির কথাই বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তথাবিধ বিজিগীষু অর্থাৎ জয়েচ্ছু ব্যক্তির কথার নাম জল্প। জল্পে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষপ্রতিষেধ করিয়া থাকে। নিজের কোনও পক্ষ নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষখণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার প্রবর্ত্তনা করে, তাহার নাম বিতণ্ডা।

জল্প ও বিতণ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ার্থ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদে কিন্তু তাহা পারা যায় না। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য হেত্বাভাস এবং আরও দুইএকটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে মাত্র। যাহারা তত্ত্বনির্ণয় বা বিজয়ের অভিলাষী, সর্ব্বজন-সিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করে না, শ্রবণাদিপটু, কথার উপযুক্ত ব্যাপারে কিনা উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে সমর্থ, অথচ কলহকারী নহে, তাহারাই কথার অধিকারী। যাহারা তত্ত্ববুভুৎসু, প্রকৃত কথা বলে, প্রতিভাশালী, যুক্তিসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করে, অথচ প্রতারক নহে এবং প্রতিপক্ষের তিরস্কার করে না, তাহারাই বাদকথায় অধিকারী। বাদকথাতে সভার

অপেক্ষা নাই। জল্প ও বিতণ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে। যে জনতার মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভা।

কথা বা শাস্ত্রীয়বিচারের প্রণালী এইরূপ। প্রথমতঃ বাদী প্রমাণোপন্যাসপূর্ব্বক স্বপক্ষস্থাপন করিয়া তাহাতে সম্ভাব্যমান দোষের নিরাস করিবে। প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানাদিনিরাসের জন্য অর্থাৎ তিনি বাদীর কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা প্রকাশের জন্য, বাদীর মতের অনুবাদ করিয়া দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন এবং প্রমাণোপন্যাসপূর্ব্বক স্বমতস্থাপন করিবে। তৎপরে বাদী, প্রতিবাদীর কথাগুলির অনুবাদ করিয়া স্বপক্ষে প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষগুলির উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিবাদীর স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবে। এই প্রণালী অনুসারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দোষপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই রীতির উল্লঙ্ঘন করেন, অথবা অনবসরে বা অযথাকালে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষপ্রদর্শন করিতে হয়, তদন্যসময়ে দোষপ্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হন। ঈদৃশ বিচারপ্রণালী যে সর্ব্বথা সমীচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বিচারপ্রণালীর তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বিচার হট্টগোল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নেতা থাকিলে বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ বিচারক পদে পদে নিগৃহীত হইতেন। সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

বৈশেষিকমতে হেতুর গমকতৌপয়িক রূপ অর্থাৎ যে হেতুবলে অনুমিতি হয়, সেই হেতুর অনুমাপকতানির্ব্বাহের অনুকূল রূপ বা ধর্ম্ম তিনটি—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব। এই রূপত্রয় না থাকিলে হেতু দুষ্ট বা হেত্বাভাস হয়। অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের কোন-একটি রূপ না থাকিলে ঐ হেতুবলে অনুমিতি হইতে পারে না। সুতরাং রূপত্রয়ের ব্যতিক্রমে হেত্বাভাসও বৈশেষিকমতে তিনপ্রকার—অপ্রসিদ্ধ, অসন্‌ ও সন্দিগ্ধ বা অনৈকান্তিক। ইহা প্রস্তাবান্তরে বলা হইয়াছে। নৈয়ায়িকমতে উক্ত তিনটি রূপের অতিরিক্ত অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই দুইটি রূপও

গমকতৌপয়িক রূপ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অতএব নৈয়ায়িকমতে হেতুর গমকতৌপয়িক রূপ পাঁচটি। এই পাঁচটি রূপের ব্যতিক্রম ঘটিলেই হেত্বাভাস ঘটে। যাহা আপাততঃ হেতুর মত আভাসমান কিনা প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না, তাহাকে হেত্বাভাস বলা যায়। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকাল বা কালাতীত—এই পাঁচপ্রকার হেত্বাভাস গোতমের অনুমত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান, তাহাকে সব্যভিচার বলা যায়। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানে বিশেষরূপে অবস্থিতি না থাকাই ব্যভিচার। বি—বিশেষরূপে, অভি—সর্ব্বতোভাবে, চার—গতি। সাধ্যের অধিকরণমাত্রে হেতুর অবস্থান নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ, ঐরূপ হইলেই তদ্দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। যে হেতুর গতি বা সম্বন্ধ অর্থাৎ অবস্থিতি উক্তরূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সার্ব্বতোমুখীন অর্থাৎ যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে তুল্যরূপে থাকে, সেই হেতুবলে সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে না। তাদৃশ দুষ্ট হেতুকে সব্যভিচার বলা যায়। যে হেতু বিশেষরূপে সাধ্যের রোধ করে অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণে না থাকিয়া সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে, তাহার নাম বিরুদ্ধ। কণাদ বিরুদ্ধকেই 'অসন্'শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রকরণ—প্রস্তাব। সাধ্য এবং সাধ্যাভাব, এ উভয় প্রকরণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেন না, সাধ্যনির্ণয়ের জন্যই হেতু প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তবেই সাধ্য আছে কি না, এইরূপ চিন্তা সাধ্যনির্ণয়ে পূর্ব্বে অবশ্য থাকিবে। যে হেতুদ্বারা প্রকরণবিষয়ে চিন্তা হইতে পারে অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাবের সন্দেহমাত্র হইতে পারে, সেই হেতু একতরপক্ষনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রকরণসম বলা যায়। অর্থাৎ যে হেতুদ্বারা সাধ্য ও সাধ্যাভাব, এ উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষের অর্থাৎ যদ্দ্বারা উহার একতর নিশ্চয় হইতে পারে—তাদৃশ বিশেষের উপলব্ধি হইতে পারে না, তাহাই প্রকরণসম। ভাষ্যকার ইহার এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন—"অনিত্যঃ শব্দো নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ" অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দে নিত্যবস্তুর কোনও ধর্ম্মের উপলব্ধি

হইতেছে না। এখানে "নিত্যধর্ম্মানুপলব্ধেঃ"—এই হেতু প্রকরণসম। কেন না, শব্দে নিত্যধর্ম্মের অনুপলব্ধি, শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সন্দেহের কারণমাত্র হইতে পারে। কেন না, নিত্যধর্ম্মের বা অনিত্য-ধর্ম্মের উপলব্ধি হইলে সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া যায়। বিশেষধর্ম্মের অর্থাৎ নিত্যধর্ম্মের বা অনিত্যধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই, শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সন্দেহ হয়। সুতরাং নিত্যধর্ম্মের অনুপ-লব্ধি সংশয়ের কারণ, অথচ তাহাই নিশ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। অত-এব এই হেতু প্রকরণসম। বৃত্তিকার বলেন যে, বাদী সাধ্যের এবং প্রতিবাদী সাধ্যাভাবের সাধকরূপে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রকরণ কিনা প্রকৃষ্টকরণ বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ এই দুই হেতুর মধ্যে কোন্ হেতু প্রকৃষ্ট বা নির্দ্দোষ, তদ্বিষয়ে চিন্তা হয়, এইজন্য ঐ উভয় হেতুই প্রকরণসম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। ফলতঃ বৃত্তি-কারের মতে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ একটি হেতু সাধ্যের সাধক, অপর হেতু সাধ্যাভাবের সাধকরূপে প্রযুক্ত হইলে, ঐ উভয় হেতুই প্রকরণ-সমদোষে দূষিত হয়। কেন না, প্রযুক্ত হেতুদ্বয়ের মধ্যে কোন্ হেতুটি উৎকৃষ্ট, এই চিন্তা থাকিয়া যায়। এক পক্ষ নিত্যধর্ম্মের অনু-পলব্ধি-হেতুতে শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে, অপর পক্ষ অনিত্য-ধর্ম্মের অনুপলব্ধি-হেতুতে শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উভয় হেতুই প্রকরণসমদোষে দুষ্ট হইবে। প্রকরণসমের অপর নাম সৎপ্রতিপক্ষ। যে হেতুর প্রতিপক্ষ কিনা শত্রু অর্থাৎ সমানবল বিরোধী হেতু, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই সৎপ্রতিপক্ষ বলা যায়।

যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়, তাহার নাম সাধ্যসম। কেন না, সে সাধ্যেরই তুল্য। হেতু বাদি-প্রতিবাদী উভয়ের মতসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই হেতুতে বিপ্রতিপন্ন হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার করিলে, বাদীকে সাধ্যের ন্যায় হেতুও সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। একটি প্রবাদ আছে যে, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি" অর্থাৎ যে নিজে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অন্যের সাধন করিবে? তথাবিধ সাধনীয় হেতুই সাধ্যসম। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—মীমাংসকমতে ছায়া বা

অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ বলিয়া অঙ্গীকৃত। নৈয়ায়িকমতে ছায়া দ্রব্য নহে, আলোক বা তেজের অভাবমাত্র। মীমাংসকেরা বিবেচনা করেন যে, ক্রিয়া দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, ইহা নৈয়ায়িকদিগেরও সম্মত। ছায়ারও গতিক্রিয়া আছে। কেন না, কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়াও গমন করে। সুতরাং গতিমত্ত্ব-হেতুর বলে মীমাংসকেরা নৈয়ায়িকদিগের প্রতি ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন করিতে চাহেন; নৈয়ায়িকেরা কিন্তু ছায়ার গতি স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহার গতিমত্ত্বরূপ হেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া উহা সাধ্যসম। নৈয়ায়িকেরা বলেন, পুরুষের ন্যায় বস্তুগত্যা ছায়ারও গতি আছে অথবা বস্তুগত্যা ছায়ার গতি নাই,—দোষজন্য গতির ভ্রম হয়, তাহা বিবেচ্য। গমনশীল পুরুষ আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে আলোকের অসন্নিধি বা অভাব অবিসংবাদী। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আলোকের অসন্নিধি বা অভাবও উত্তরোত্তর অগ্রিম-স্থানে উপলব্ধ হয়। এইজন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই, সুতরাং ছায়া দ্রব্য নহে, উহা আলোকের অসন্নিধিমাত্র। সাধ্যসমের অপর নাম অসিদ্ধ। কণাদ ইহাকেই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কালের অতিক্রমযুক্ত হেতুর নাম অতীতকাল বা কালাতীত। মীমাংসকেরা বলেন যে, যেমন উপলব্ধির পূর্ব্বে এবং পরেও রূপের অবস্থিতি থাকে, অথচ রূপের অধিকরণদ্রব্যের সহিত আলোকের সংযোগ হইলে রূপের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়; সেইরূপ ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হইলে শব্দের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়। অতএব সংযোগব্যঙ্গ্য বলিয়া শব্দের শব্দও রূপের ন্যায় উপলব্ধির পূর্ব্বে ও পরে অবস্থিত থাকে। এস্থলে সংযোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতুদ্বারা প্রকারান্তরে শব্দের নিত্যত্ব সাধন করা হইতেছে। এই হেতু কালাতীত। কেন না, আলোক-সংযোগের সমকালে রূপের অভিব্যক্তি হয় এবং আলোকসংযোগ নিবৃত্ত হইয়া গেলে রূপের অভিব্যক্তি হয় না। সুতরাং রূপের অভিব্যক্তি সংযোগজন্য, সন্দেহ নাই। শব্দের অভিব্যক্তি কিন্তু সংযোগ-

জন্য হইতে পারে না। কারণ ভেরী-দণ্ড-সংযোগের সমকালেই শব্দের অভিব্যক্তি হয় না, তৎপরে হইয়া থাকে। আর একটি উদাহরণের সাহায্য লইলে ইহা আরও একটু স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। দূরে কোন কাষ্ঠে কুঠারের আঘাত করিলে দূরস্থ ব্যক্তি ঐ আঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকালে দূরস্থ ব্যক্তির শব্দোপলব্ধি হয় না,—অনেক পরে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেন না, দূরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করে না, শ্রোতার শ্রবণপ্রদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই সে শ্রবণ করিয়া থাকে। সুতরাং শব্দের উপলব্ধি কাষ্ঠ ও কুঠারের সংযোগকাল অতিক্রম করে। অতএব সংযোগ-ব্যঙ্গ্যত্ব হেতু কালাতীত। ফলতঃ, শব্দ সংযোগব্যঙ্গ্য নহে—সংযোগ-জন্য। কালাতীতের অপর নাম কালাত্যয়াপদিষ্ট।

বক্তা যে অর্থ-অভিপ্রায়ে বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষোদ্ভাবন করার নাম ছল। ছল তিনপ্রকার—বাক্ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল। বক্তার অনভিপ্রেত অর্থকল্পনার নাম বাক্ছল। 'নবকম্বলোঽয়ং মনুষ্যঃ' এই বাক্যে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ এই যে, এই মনুষ্য নূতনকম্বলযুক্ত, কিন্তু ছলবাদী তাহার অর্থ কল্পনা করিল যে, 'এই মনুষ্য নয়খানি-কম্বল-যুক্ত।' এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া বক্তাকে উপহসিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিল যে, 'ইহার ত একখানি বৈ কম্বল নাই, কিরূপে বলিলে, ইহার নয়খানি কম্বল?'

যে অর্থ সম্ভবপর, তাহার অতি সামান্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া অসম্ভব অর্থের কল্পনা করার নাম সামান্যচ্ছল। ব্রাহ্মণে বিদ্যা সম্ভবপর, কেহ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্যা সম্ভবপর হয়, তবে ব্রাত্য বা বালকেও বিদ্যা সম্ভবপর হইতে পারে? কেন না, তাহারাও ত ব্রাহ্মণ, এইরূপে ছলবাদী অসম্ভব অর্থের কল্পনা করে। ইহাই সামান্যচ্ছল।

মুখ্য ও গৌণ ভেদে শব্দের দ্বিবিধ বৃত্তি আছে। তন্মধ্যে বক্তা মুখ্যবৃত্তি বা গৌণবৃত্তি অভিপ্রায়ে বাক্যপ্রয়োগ করিলে প্রযোক্তার অভিপ্রেত বৃত্তির ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দোষোদ্ভাবন করার নাম উপচারচ্ছল। মঞ্চস্থ পুরুষে মঞ্চশব্দের মুখ্যবৃত্তি নাই—কিন্তু গৌণবৃত্তি আছে। বক্তা

মঞ্চশব্দের গৌণবৃত্তি-অভিপ্রায়ে 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এইরূপ বলিলে বুঝায়, মঞ্চস্থ পুরুষেরা ক্রোশন করিতেছে, কিন্তু ছলবাদী, মঞ্চেরা ত ক্রোশন করে না, এই বলিয়া যে দোষারোপ করে, তাহাই উপচারচ্ছল।

ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যবলে যে দোষোদ্ভাবন করা হয়, তাহার নাম জাতি। জাতি চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার— সাধর্ম্ম্যসমা, বৈধর্ম্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা, অপকর্ষসমা, বর্ণ্যসমা, অবর্ণ্যসমা, বিকল্পসমা, সাধ্যসমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসমা, প্রতিদৃষ্টান্তসমা, অনুৎপত্তিসমা, সংশয়সমা, প্রকরণসমা, অহেতুসমা, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষ-সমা, উপপত্তিসমা, উপলব্ধিসমা, অনুপলব্ধিসমা, নিত্যসমা, অনিত্যসমা ও কার্য্যসমা। এক একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। ঘটপটাদি কৃতক অর্থাৎ জন্য অথচ অনিত্য, শব্দও কৃতক, অতএব শব্দও অনিত্য। এই স্থাপনাতে জাতিবাদী ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধর্ম্ম্য-অবলম্বনে এইরূপ দোষোদ্ভাবন করে যে, যদি অনিত্য ঘটপটাদির সাধর্ম্ম্য-বলে শব্দ অনিত্য হয়, তবে নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব শব্দে আছে বলিয়া শব্দ নিত্যও হইতে পারে? ইহা সাধর্ম্ম্যসমা জাতি। ঘট কৃতক অর্থাৎ জন্য অথচ অনিত্য, শব্দও কৃতক, অতএব উহাও ঘটের ন্যায় অনিত্য, বাদীর এইরূপ স্থাপনাতে অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব শব্দে রহিয়াছে, অতএব শব্দ নিত্য হউক—প্রতিবাদীর ঈদৃশ প্রত্যবস্থান বৈধর্ম্ম্যসমা জাতির উদাহরণ। কৃতকত্ব-হেতুতে ঘটের ন্যায় শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিলে কৃতকত্ব ও অনিত্যত্ব ঘটে রূপ-সহচরিত দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ঘটে কৃতকত্ব, অনিত্যত্ব ও রূপ আছে, অতএব শব্দ ঘটের ন্যায় কৃতক ও অনিত্য হইলে ঘটের ন্যায় রূপবান্‌ও হউক—প্রতি-বাদীর এতাদৃশ প্রত্যবস্থান উৎকর্ষসমা জাতি। 'শব্দোঽনিত্যঃ কৃতক-ত্বাৎ'—এই স্থাপনাতেই ঘটে কৃতকত্ব ও অনিত্যত্বসহচরিত রূপ আছে। শব্দে রূপ নাই, অতএব কৃতকত্ব ও অনিত্যত্বও থাকিবে না—এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম অপকর্ষসমা। 'শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ'—এই স্থাপনাতে জাতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান হইতে পারে যে, পক্ষবৃত্তি হেতু সাধ্যের সাধক। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহাই পক্ষ। পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে না—সন্দেহ থাকে। যে হেতুবলে অনুমিতি বা

সাধ্যসিদ্ধি হইবে, দৃষ্টান্তেও সেই হেতু থাকা আবশ্যক। দৃষ্টান্তে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় নাই—ইহা স্বীকার করিলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যরূপত্ব হয় না। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক কিন্তু তুল্যরূপ হওয়াই উচিত। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যরূপত্বরক্ষার জন্য, হয় পক্ষের ন্যায় দৃষ্টান্তেও সাধ্যের সন্দেহ, অথবা দৃষ্টান্তের ন্যায় পক্ষেও সাধ্যের নিশ্চয় স্বীকার করিতে হয়। এই উভয়ের নাম যথাক্রমে বর্ণ্যসমা ও অবর্ণ্যসমা। জাতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, কোনরূপেই স্থাপনা হেতুসিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। কেন না, দৃষ্টান্তে সাধ্যের সন্দেহ স্বীকার করিলে দৃষ্টান্তের এবং পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় স্বীকার করিলে পক্ষের অসিদ্ধি হইয়া পড়ে। 'শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ'—এই স্থাপনাতে কৃতকত্ব বায়ুতে গুরুত্বব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটাদিতে কৃতকত্ব ও গুরুত্ব সহচর হইলেও বায়ুতে কৃতকত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। গুরুত্ব পরমাণুতে অনিত্যত্ব-ব্যভিচারী, অর্থাৎ ঘটাদিতে গুরুত্ব ও অনিত্যত্ব সহচর বটে, কিন্তু পরমাণুতে গুরুত্ব আছে, অনিত্যত্ব নাই। অনিত্যত্ব ক্রিয়াতে মূর্ত্তত্ব-ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটাদিতে অনিত্যত্ব এবং মূর্ত্তত্ব এ উভয়ই আছে, ক্রিয়াতে কিন্তু অনিত্যত্বই আছে, মূর্ত্তত্ব নাই। এইরূপে ধর্ম্মসকলের পরস্পর ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। অতএব কৃতকত্বও অনিত্যত্বব্যভিচারী হউক—জাতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান বিকল্পসমা। সাধ্যের ন্যায় পক্ষাদিও অনুমিতির বিষয়, সুতরাং প্রস্তাবিতন্যায়সাধ্য এই বিবেচনায়, পক্ষাদি পূর্ব্বে সিদ্ধ হইলে তাহাদের প্রস্তাবিতন্যায়সাধ্যত্ব হইতে পারে না বলিয়া অভিলষিত অনুমিতিবিষয়ত্বও হইতে পারে না, পূর্ব্বে সিদ্ধ না হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ হয়, এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম সাধ্যসমা। হেতু সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সাধ্যের সাধক হয়, অথবা সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াই সাধ্যের সাধক হয়? সম্বদ্ধ হইয়া সাধ্যের সাধক হইলে, হেতু ও সাধ্য উভয়েরই সম্বদ্ধত্ব তুল্য, তন্মধ্যে কে কাহার সাধক হইবে? পক্ষান্তরে, হেতু সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াই যদি সাধ্যের সাধক হয়, তবে অসম্বদ্ধত্বের অবিশেষহেতুক সাধ্যাভাবেরই সাধক হয় না কেন? ঈদৃশ প্রত্যবস্থানদ্বয়ের যথাক্রমে নাম প্রাপ্তিসমা ও অপ্রাপ্তিসমা। দৃষ্টান্তের প্রমাণ বলিতে হইবে, ঐ প্রমাণেরও প্রমাণ বলিতে হইবে,

ইত্যাদিরূপে প্রত্যবস্থানের নাম প্রসঙ্গসমা। 'শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ'—এই স্থাপনাতে, যদি ঘটদৃষ্টান্তবলে শব্দ অনিত্য হয়, তবে আকাশদৃষ্টান্তবলে নিত্যই হয় না কেন? এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম প্রতিদৃষ্টান্তসমা। 'ঘটো রূপবান্ গন্ধাৎ পটবৎ' অর্থাৎ ঘটে গন্ধ আছে, অতএব পটের ন্যায় ঘটে রূপ আছে—এইরূপ স্থাপনাতে ঘট, গন্ধ ও পটের উৎপত্তির পূর্ব্বে হেতু ও দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি—জাতিবাদীর ঈদৃশ প্রত্যবস্থানের নাম অনুৎপত্তিসমা। 'শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ'—এই স্থাপনাতে অনিত্য ঘট এবং নিত্য গোত্বাদিজাতি, এই উভয়েই ঐন্দ্রিয়কত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে। সুতরাং কৃতকত্ব-হেতুবলে যেরূপ শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করা হয়, সেইরূপ ঐন্দ্রিয়কত্ব-হেতুবলে শব্দের অনিত্যত্বের সন্দেহই করা হয় না কেন? এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম সংশয়সমা। ঐ স্থাপনাতেই, শব্দ অনিত্য হইতে পারে না। কারণ, নিত্যত্বসাধক শ্রাবণত্ব অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব অনিত্যত্বের বাধক হইতেছে। কেন না, শব্দত্ব নিত্য অথচ তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এতাদৃশ প্রত্যবস্থানের নাম প্রকরণসমা। দণ্ডাদি ঘটাদির পূর্ব্বকালবর্ত্তী হইয়া ঘটাদির কারণ হইতে পারে না। কেন না, ঘটাদির পূর্ব্বকালে ঘটাদিই নাই, কাহার কারণ হইবে? দণ্ডাদি ঘটাদির উত্তরকালবর্ত্তী হইয়াও কারণ হইতে পারে না। কেন না, তৎপূর্ব্বেই ঘট হইয়াছে। ঘটাদির সমকালবর্ত্তী হইয়াও কারণ হইতে পারে না। কেন না, বাম ও দক্ষিণ শৃঙ্গের ন্যায় তুল্যকালবর্ত্তী পদার্থদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব হয় না। এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম অহেতুসমা। 'শব্দোঽনিত্যঃ'—এরূপ বলিলে, অর্থাৎ বোধ হয় যে, শব্দ ভিন্ন সমস্তই নিত্য; 'কৃতকত্বাদনিত্যঃ'—এরূপ বলিলে, অর্থাৎ বোধ হয় যে, অন্য হেতুতে নিত্য—ইত্যাদিরূপ প্রত্যবস্থানের নাম অর্থাপত্তিসমা। শব্দ ও ঘট উভয়েই কৃতকত্ব আছে বলিয়া যদি উভয়ের তুল্যতা হয়, তবে সকল পদার্থেরই সত্তা আছে বলিয়া সকল পদার্থেরই তুল্যতা হউক—ইত্যাকার প্রত্যবস্থানের নাম অবিশেষসমা। 'শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ'— এই স্থাপনাতে, শব্দের অনিত্যত্বের কারণ কৃতকত্বের উপপত্তি হয় বলিয়া যদি শব্দ অনিত্য হয়, তবে নিত্যত্বের কারণ অস্পর্শত্বের উপপত্তি হয় বলিয়া শব্দ নিত্যও হইতে পারে—এইরূপ

প্রত্যবস্থানের নাম উপপত্তিসমা। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এই স্থাপনাতে ধূমের অভাবে আলোকদ্বারাও বহ্নির সিদ্ধি হয়, সুতরাং ধূম বহ্নির সাধক হইতে পারে না—ঈদৃশ প্রত্যবস্থানের নাম উপলব্ধিসমা।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, শব্দ নিত্য নহে। কারণ, উচ্চারণের পূর্ব্বে এবং পরে শব্দের উপলব্ধি হয় না। শব্দ নিত্য হইলে তাহার অনুপলব্ধি হইতে পারে না। যেমন কুড্যাদিদ্বারা আবৃত ঘটাদির উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ উচ্চারণের পূর্ব্বে ও পরে শব্দ আবৃত থাকে বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না—এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে যাহা দ্বারা শব্দ আবৃত হয়, সেই আবরণের উপলব্ধি হইত। আবরণের উপলব্ধি হয় না বলিয়া আবরণের অভাব নিশ্চিত হয়। ইহাতে জাতিবাদী এইরূপ প্রত্যবস্থান করেন যে, আবরণের যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ আবরণের অনুপলব্ধিরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অনুপলব্ধিবলে যদি আবরণের অভাবনিশ্চয় হয়, তবে অনুপলব্ধিবলেই আবরণের অনুপলব্ধিরও অভাবনিশ্চয় হইতে পারে। অনুপলব্ধির অভাবের নিশ্চয় হইলে কিন্তু আবরণের উপলব্ধিই সিদ্ধ হয়। এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম অনুপলব্ধিসমা। ঘটের ন্যায় শব্দে কৃতকত্ব আছে বলিয়া ঘটের ন্যায় শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে, ঘটের যৎকিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া সকলেরই অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারা যায়, এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম অনিত্যসমা। শব্দের অনিত্যত্ব যদি সর্ব্বকালে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শব্দ সর্ব্বকালে থাকে—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। শব্দ সর্ব্বকালে থাকিলে শব্দ নিত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম নিত্যসমা। 'শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ' অর্থাৎ যেহেতু শব্দ প্রযত্নের অনন্তরভাবী, অতএব শব্দ অনিত্য, এই স্থাপনাতে, দেখা যাইতেছে যে, প্রযত্নের অনন্তর বিদ্যমান বস্তুরও অভিব্যক্তি হয়, অবিদ্যমান বস্তুরও উৎপত্তি হয়। সুতরাং প্রযত্নানন্তরভাবিত্বরূপ হেতুদ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ইত্যাকার প্রত্যবস্থানের নাম কার্য্যসমা। অথবা যে সকল জাতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন জাতিমাত্রই কার্য্যসমা।

যদ্দ্বারা বিচারকারীর বিপ্রতিপত্তি কিনা বিপরীত জ্ঞান বা অপ্রতিপত্তি কিনা প্রকৃতবিষয়ে অজ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহস্থান।

প্রথমতঃ একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার পরিত্যাগ করা, পরপক্ষে দোষোদ্ভাবন না করা, পরদত্ত দোষের উদ্ধার না করা প্রভৃতি নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ঘটিলে পুরুষ নিগৃহীত বা পরাজিত হয়। নিগ্রহস্থানগুলি পুরুষদোষের উন্নায়ক।

নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতিপ্রকার—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস। সংক্ষেপে নিগ্রহস্থানগুলির পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

'শব্দোঽনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বহেতুক ঘটের ন্যায় শব্দ অনিত্য, এই স্থাপনাতে, সামান্য (জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ নিত্য—প্রতিবাদী এইরূপে ব্যভিচারের উদ্ভাবন করিলে, বাদী যদি বলে যে, যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য নিত্য হয়, ঘটও নিত্যই হউক, তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাহানি হইল। ঐ স্থাপনাতে ঐ দোষের নিরাসার্থ যদি বাদী বলে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য নিত্য বটে, কিন্তু সামান্য সর্ব্বগত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ঘট সর্ব্বগত নহে, অথচ অনিত্য। শব্দও সর্ব্বগত নহে, সুতরাং অনিত্য। তাহা হইলে, প্রতিজ্ঞান্তর হইল। কেন না, 'শব্দো-ঽনিত্যঃ'—ইহা প্রথম প্রতিজ্ঞা। 'অসর্ব্বগতঃ শব্দোঽনিত্যঃ' ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। 'গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং রূপাদিভ্যোঽর্থান্তরস্যানুপলব্ধেঃ'—অর্থাৎ দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত, যেহেতু রূপাদিগুণের অতিরিক্ত কিছুরই উপলব্ধি হয় না। ইহা প্রতিজ্ঞাবিরোধের উদাহরণ। কেন না, দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত হইলে অবশ্য তাহার উপলব্ধি হইবে। গুণাতিরিক্তের উপলব্ধি না হইলে দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ। 'শব্দোঽনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ' এই স্থাপনাতে সামান্যে ব্যভি-চারের উদ্ভাবন করিলে বাদী যদি বলে যে, কে বলে শব্দ অনিত্য? তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাসংন্যাস হইল। ঐ স্থাপনাতেই প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত সামান্যে ব্যভিচারের নিবারণার্থ বাদী যদি হেতুতে 'সামান্যবত্ত্বে সতি' এইরূপ বিশেষণ দেয় অর্থাৎ সামান্যযুক্তত্ব-সহকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব হেতু

করে, তাহা হইলে সামান্য সামান্যযুক্ত নয় বলিয়া প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত ব্যভিচারের নিরাস হয় বটে, কিন্তু হেত্বন্তর হয়। কেন না, 'ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ'— ইহা প্রথম হেতু। 'সামান্যবত্ত্বে সতি ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ'—ইহা দ্বিতীয় হেতু। 'শব্দোঽনিত্য ইতি প্রতিজ্ঞা, অস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ'—এইরূপ স্থাপনা করিয়া বাদী যদি বলিতে থাকে যে, হেতুশব্দটি হিধাতু ও তুন্‌প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন কৃদন্তপদ, পদ চারিপ্রকার—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত ইত্যাদি, তাহা হইলে অর্থান্তর হইল। কেন না, বাদীর পর-পর কথাগুলি প্রকৃতের উপযোগী নহে। 'নিত্যঃ শব্দঃ কচটতপাঃ' অর্থাৎ ক–চ–ট–ত–প–রূপ শব্দ নিত্য। এস্থলে 'কচটতপাঃ' ইহা নিরর্থক। যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষদ্ ও প্রতিবাদী তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারে না, তাদৃশ দুর্ব্বোধ্য বাক্য অবিজ্ঞাতার্থ। 'দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ'—অর্থাৎ দশটি দাড়িম ফল, ছয়টি অপূপ, ইত্যাদিরূপ যে সকল বাক্য পূর্ব্বাপর মিলিত হইয়া কোন অর্থ প্রতিপাদন করে না, তাহার নাম অপার্থক। ন্যায়াবয়বগুলি যে ক্রমে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রয়োগ করার নাম অপ্রাপ্তকাল। পাঁচটি ন্যায়াবয়বের কোন-একটি অবয়ব প্রযুক্ত না হইলে, ন্যূনরূপ নিগ্রহস্থান হয়। 'ধূমাদালোকাৎ মহানসবৎ চত্বরবৎ'—ইত্যাদিরূপে অধিক হেতু বা উদাহরণ প্রযুক্ত হইলে 'অধিক'নামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার বলেন যে, একটি হেতু বা উদাহরণ প্রযুক্ত হইবে—এইরূপ নিয়মে কথার আরম্ভ হইলে ইহা দোষ হইবে।

প্রয়োজন ভিন্ন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি এবং যাহা অর্থাৎ লব্ধ হয়, শব্দদ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করার নাম পুনরুক্ত। বাদী তিনবার বলিয়াছে, সভা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, অথচ প্রতিবাদী তাহার প্রত্যুচ্চারণ পর্য্যন্ত করে না। এস্থলে প্রতিবাদীর অননুভাষণরূপ নিগ্রহস্থান হইল। বাদী তিনবার বলিয়াছে, পরিষদ্ তাহার অর্থ বুঝিয়াছে, অথচ প্রতিবাদী তাহার অর্থ বুঝিতেছে না, এস্থলে প্রাতবাদীর অজ্ঞানরূপ নিগ্রহস্থান হইল। উচিত অবসরে উত্তর করিতে না পারিলে অপ্রতিভারূপ নিগ্রহ-স্থান হয়। কথা চলিতেছে, এমন সময়ে কার্য্যান্তরব্যপদেশে কথাবিচ্ছেদ করার নাম বিক্ষেপ। স্বপক্ষে কোন দোষ প্রদত্ত হইলে ঐ দোষের

উদ্ধার না করিয়াই যদি বলা হয় যে, তোমার পক্ষেও এ দোষ রহিয়াছে, তাহা হইলে মতানুজ্ঞা হইল। এক পক্ষ নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার উদ্ভাবন না করিলে পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ হয়। বাস্তবিক নিগ্রহস্থান হয় নাই, তথাবিধস্থলে ভ্রমবশতঃ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করার নাম নিরনুযোজ্যানুযোগ। বিচারকালে নিজের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-কথা বলিলে অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থান হয়। হেত্বাভাসের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

সপ্তম লেক্‌চর।

সাংখ্যদর্শন।

মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রথম আচার্য্য। তাঁহার প্রণীত সাংখ্যদর্শন 'তত্ত্বসমাস'নামে আখ্যাত। উহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনও কপিলপ্রণীত। 'তত্ত্বসমাস'নামক সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের প্রপঞ্চন অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা আছে বলিয়া প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের অপর নাম সাংখ্যপ্রবচন। এই কারণে পাতঞ্জলদর্শনও সাংখ্যপ্রবচন নামে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, অধিকন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন বলিয়া, ইহার অপর নাম নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শন। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সূত্রকার অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম বিচারমুখে ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না। তদ্দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"— এইরূপ সূত্ররচনাদ্বারাই সূত্রকারের উক্তরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। 'ঈশ্বর নাই'—ইহা সূত্রকারের অভিপ্রায় হইলে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এরূপ সূত্র না করিয়া, 'ঈশ্বরাভাবাৎ'—এইরূপ সূত্র করিতেন। বাচস্পতিমিশ্রের মতে কিন্তু সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী।

সে যাহা হউক, মহর্ষি কপিলের শিষ্য আসুরি, আসুরির শিষ্য পঞ্চ-শিখাচার্য্য সাংখ্যদর্শনের পরিষ্কারচ্ছলে বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে সাংখ্যদর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা অতি সমীচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচীন আচার্য্যদিগের নিকট ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের সূত্র অপেক্ষাও সাংখ্যকারিকা সমাদৃত ও প্রামাণিকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে সাংখ্যদর্শনের মতখণ্ডনপ্রসঙ্গে প্রচলিত সাংখ্য-

দর্শনের সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা সাংখ্যকারিকার সমধিক সম্মান করিতেন—এরূপ বিবেচনা করিলে অসঙ্গত হইবে না। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ৪৫৬টি সূত্র আছে। সূত্রগুলি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানহেতু নিরূপিত হইয়াছে। দুঃখ হেয়, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান দুঃখহেতু। দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই হান। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি পুরুষ নহে ; পুরুষ—প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকার্য্য বুদ্ধ্যাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এতাদৃশ বিবেকজ্ঞান কিনা প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্‌রূপে জ্ঞান, হানের কিনা অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির হেতু। এই সকল বিষয় প্রথমাধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য্য ; তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতির স্থূলকার্য্য, লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর, অপরবৈরাগ্য এবং পরবৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে বিবেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাস অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তে বাদীদিগের সমুদ্ভাবিত দোষের নিরাস এবং তাহাদের মতখণ্ডন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে শাস্ত্রের মুখ্যবিষয়ের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থের উপসংহার করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, শ্রবণের পর আত্মার মননের জন্য ভগবান্ কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনে শ্রুতির অবিরোধী ও অনুকূল উপপত্তি বা যুক্তিসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্রকৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যভাষ্য এবং তৎকৃত সাংখ্যসার প্রভৃতি সাংখ্যশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ। সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্রটি এই—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।

অর্থাৎ ন্যায়মতের ন্যায় সাংখ্যমতেও দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যে দুঃখ আভ্যন্তরীণ উপায়ে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকেই

আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে, সুতরাং তাদৃশ-উপায়-সাধ্য দুঃখ আধ্যাত্মিক-দুঃখরূপে পরিগণিত। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুইপ্রকার—শারীর ও মানস। বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থা আরোগ্য বা স্বাস্থ্যের নিদান। উহাদের বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। তন্নিবন্ধন যে দুঃখের অনুভব হয়, তাহাই শারীর দুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদিজনিত দুঃখ মানস দুঃখ। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই দ্বিবিধ দুঃখই বাহ্য-উপায়-সাধ্য, আভ্যন্তরীণ-উপায়-সাধ্য নহে। মানুষ, পশু বা স্থাবরাদি-জনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। কেন না, ঐ-জাতীয় দুঃখ ভূতপদার্থের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যক্ষরাক্ষসাদির আবেশনিবন্ধন যে দুঃখ হয়, তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ। যেহেতু, দেবতাদ্বারা তাদৃশ দুঃখ সমুৎপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই মুক্তি। বিবেক-জ্ঞান মুক্তির বা অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির উপায়। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকার্য্য বুদ্ধ্যাদি হইতে ভিন্নরূপে পুরুষের কিনা আত্মার জ্ঞানের নাম বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞান সম্পাদনের জন্য সাংখ্যদর্শনের আবির্ভাব বা অবতারণা।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, থাকিয়াও যদি জিহাসিত না হইত অর্থাৎ লোকে যদি দুঃখ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে চাহিত না। কিন্তু প্রাণিমাত্রেই দুঃখের অনুভব করে, এবং স্বভাবতই দুঃখকে প্রতিকূলরূপে ভাবিয়া থাকে। এমন ব্যক্তি নাই, যে দুঃখকে নিজের অনুকূলরূপে বিবেচনা করিতে পারে। প্রতিকূল বিষয় পরি-ত্যাগ করিবার ইচ্ছাও লোকের স্বাভাবিক। শাস্ত্র বা সাংখ্যদর্শন দুঃখ-সমুচ্ছেদের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এইহেতু শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইবার জন্য লোক আগ্রহান্বিত, সুতরাং শাস্ত্রপ্রণেতার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্। লোকে যাহা জানিতে চায়, যে বক্তা তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ বা অবতারণা করেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মনোযোগের সহিত তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। লোকে যাহা জানিতে চায় না, বক্তা তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, বুদ্ধিমানেরা তাঁহার বাক্য শুনিতে চাহেন না, প্রত্যুত উন্মত্তের ন্যায় তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যে দুঃখের অপ্রতিহত প্রভাবে লোকসকল একান্ত জর্জরিত ও তাহার সমুচ্ছেদসাধনে নিতান্ত আগ্রহান্বিত, শাস্ত্র সেই দুঃখসমুচ্ছেদের উপায় নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় লোকের বুভুৎসিত ও অপেক্ষিত। অতএব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে লোকের মনোযোগ অবশ্যম্ভাবী।

সত্য বটে, শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে দুঃখের সমুচ্ছেদসাধন করা কষ্টসাধ্য। কেন না, বিবেকজ্ঞান দুঃখসমুচ্ছেদের শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়। বিবেকজ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে, অনেকজন্মপরম্পরার আয়াসে বিবেকজ্ঞান লাভ করা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

লৌকিক উপায়ে কিন্তু অল্পায়াসে দুঃখের সমুচ্ছেদ সাধন করা যাইতে পারে। সদ্বৈদ্যের উপদেশানুসারে উত্তম-ঔষধ-ব্যবহারে শারীরদুঃখের, মনোজ্ঞ স্ত্রী-পান-ভোজনাদির পরিসেবনে মানসদুঃখের, নীতিশাস্ত্রকুশলতা ও নিরাপদ্ সমীচীন স্থানে অবস্থিতিদ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে, তখন কষ্টকর শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে লোকের প্রবৃত্তি একান্ত অসম্ভব। একটি প্রবাদ আছে যে—

অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥

অর্ক অর্থাৎ আকন্দবৃক্ষে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে মধু-আহরণ-উদ্দেশে কিজন্য লোক পর্ব্বতে যাইবে? অভিলষিত প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকে? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুকর উপায়ে অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিলে দুষ্কর উপায়ে কেহই প্রবৃত্ত হয় না।

এ আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বা অকাট্য বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু অভিনিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিলে ইহার অসারতা প্রতিপন্ন হইতে অধিক সময়ের অপেক্ষা থাকে না। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি ঔষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রী-পান-ভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ্ স্থানে অবস্থিতি

ও নীতিশাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের প্রতিকার করিতে পারা যায় নাই। অতএব ঔষধসেবনাদি দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী উপায় নহে। আরও বিবেচ্য যে, ঐ সকল উপায়ে তৎকালে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও কালান্তরে তজ্জাতীয় দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ; তাহার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন অনাবশ্যক। বিবেকজ্ঞান কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির ঐকান্তিক উপায়, অথচ বিবেকজ্ঞানদ্বারা দুঃখের সমুচ্ছেদসাধন হইলে পুনর্ব্বার দুঃখের আবির্ভাব একান্ত অসম্ভব। কেন না, মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের নিদান বা আদিকারণ। বিবেকজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সমূলে উন্মূলিত হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ফলের প্রত্যাশা করিতে পারে না।

যদিও বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গলাভ করা যায়, স্বর্গ কিনা দুঃখবিরোধী সুখবিশেষ, সুতরাং তদ্দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে এবং অনেকজন্মপরম্পরার আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অল্পকালসাধ্যও বটে, তথাপি বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-দ্বারা দুঃখের সমুচ্ছেদ হইলেও অত্যন্তসমুচ্ছেদ হয় না। তাহার কারণ এই যে, বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে পশু ও বীজাদির হিংসা করিতে হয়। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৈধহিংসাও পাপজনক। শাস্ত্রাদিষ্ট হিংসা করিলেও পাপ হইবে। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি"—অর্থাৎ কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না—এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের প্রত্যবায় বা পাপ জন্মে। "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত"—অর্থাৎ অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে—ইত্যাদি বিধি-দ্বারা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, ঐ হিংসাদ্বারা যজ্ঞসম্পাদন করিবে। কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, ইহা সামান্যশাস্ত্র; আর অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ-শাস্ত্র। শাস্ত্রীয়নিয়মানুসারে সচরাচর বিশেষশাস্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্তস্থলে সামান্যশাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিশেষশাস্ত্র সামান্যশাস্ত্রের বাধক এবং সামান্যশাস্ত্র বিশেষশাস্ত্রদ্বারা

বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে ঐরূপ বাধ্যবাধকভাব হইতে পারে না। অর্থাৎ বিশেষশাস্ত্র সামান্যশাস্ত্রের বাধক বা সামান্যশাস্ত্র বিশেষশাস্ত্রকর্ত্তৃক বাধিত হইতে পারে না। কেন না, পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্যবাধকভাব হয় না অর্থাৎ একে অন্যের বাধা জন্মাইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। কেন না, কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না—এই নিষেধবিধি বুঝাইয়া দিতেছে, প্রাণিহিংসা করিলে পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। অগ্নি-ষোমীয় পশুর হিংসা করিবে—এই বিধি বুঝাইয়া দিতেছে যে, অগ্নি-ষোমীয় পশুর হিংসা যজ্ঞের উপকারক কিনা সম্পাদক। অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসাদ্বারা যজ্ঞসম্পাদন করিবে। এই দুইটি বিধির কিছুমাত্র বিরোধ হইতে পারে না। কেন না, যজ্ঞীয়পশুহিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায়, এই উভয়েরই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং এস্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধকভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে, অগ্নিষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধকভাব হইতে পারিত। যেহেতু, পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ, ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে কিন্তু তেমন উপদেশ নাই।

এইরূপে সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেন যে, বৈধহিংসাতেও পাপ হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসাজন্য পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গী পুরুষেরা সুখের মোহিনী শক্তির প্রভাবে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না, অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হন।

অপিচ, বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি একরূপ নহে। কর্ম্মের

তারতম্য অনুসারে কর্ম্মফলেরও অর্থাৎ স্বর্গেরও তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যেরও বৈজাত্য বা তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গের উৎকর্ষাপকর্ষ থাকিলে স্বর্গীদিগেরও কিঞ্চিৎ উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য্য। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গ ভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্টস্বর্গভোগীর সবিশেষ সুখস্বচ্ছন্দতা অবলোকন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখানুভব করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রতিবেশীর নিরতিশয় সুখস্বচ্ছন্দতা দেখিলে, তাহার তুল্যশ্রেণীস্থ যে ব্যক্তির তাদৃশ সুখস্বচ্ছন্দতা নাই, তাহার মন কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং স্বর্গিগণ এককালে দুঃখপরিমুক্ত নহেন, অর্থাৎ স্বর্গীদিগেরও অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা। স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ সুখবিশেষ-মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশী। সুখ নিত্য বা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কারণবিগমে বা অন্যরূপে তাহার বিনাশ হইবেই হইবে। পক্ষান্তরে, দুঃখনিবৃত্তি বিবেকজ্ঞানরূপ-কারণসাধ্য হইলেও উহা অভাবস্বরূপ, উহা ভাবপদার্থ নহে। অভাব উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। মুদ্গরপাতনে ঘটের এবং পাটনে পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুদ্গরপাত বা পাটনের বিগমে তজ্জনিত ঘটপটবিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইলে বা না থাকিলে, ঘটপটের সত্তা এবং উপলব্ধি অবশ্য থাকিবার কথা। তাহা সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ, তাহা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অনুমত হইতে পারে না। ঘট-পটাদিরূপ সমুৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দুঃখনিবৃত্তি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই। স্বর্গনামক সুখবিশেষই তাহার ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুখ অভাবরূপ নহে, উহা ভাবরূপ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, সুতরাং স্বর্গেরও অবশ্য বিনাশ আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় ঔষধাদি

এবং অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায় যজ্ঞানুষ্ঠানাদি, ইহার কোন উপায়েই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং বেদোক্ত একমাত্র বিবেকজ্ঞান-রূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হইতে পারে। দয়ালু মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে সেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। বিবেকজ্ঞান যে অজ্ঞাননিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির সাধন, তাহা কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, যুক্তিসিদ্ধও বটে। প্রস্তাবান্তরে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য বা শব্দ। এই প্রমাণত্রয়ও প্রস্তাবান্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রমাণসম্বন্ধে প্রণালীগত যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা দেখান যাইতেছে। বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগের নাম বৃত্তি। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের সমুদ্রেক হয়, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের সমুদ্ভব হয় বা সত্ত্বগুণ প্রধান বা প্রবল হইয়া উঠে। এই সত্ত্বসমুদ্রেকের নাম অধ্যবসায়, বৃত্তি ও জ্ঞান। বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানই হইল প্রমাণ। এই জ্ঞানদ্বারা চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ, তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। ইহারই অপর নাম বোধ। প্রকৃতি অচেতন, তৎসমুদ্ভূত বুদ্ধিসত্ত্বও অচেতন। সুতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন। অচেতন বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিজে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষ চেতন ও অপরিণামী। অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিরূপ পরিণাম হইতে পারে না। কেন না, যাহার পরিণাম হয়, তাহাকে অপরিণামী বলা যায় না। বিষয় বুদ্ধিভাষ্য, বুদ্ধি পরিণামিনী, পরিণাম সর্ব্বদা হয় না, কখন-কখন হইয়া থাকে; এইজন্য সর্ব্বদা বিষয়ের ভান হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া স্বপ্রকাশ নহে, উহা পুরুষভাষ্য, বুদ্ধিবৃত্তি অনবগত বা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না, এইজন্য পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ পরিণামী হইলে সর্ব্বদা বুদ্ধি-বৃত্তির ভান বা প্রকাশ হইতে পারিত না। কেন না, পুরুষ পরিণামী হইলে বুদ্ধির পরিণামের ন্যায় পুরুষের পরিণামও কাদাচিৎক হইবে। তাহা হইলে পুরুষের পরিণাম না হওয়া অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি কখন অজ্ঞাতও থাকিতে পারে। পুরুষ অপরিণামী বলিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞাত থাকিতে

পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়াকার, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের প্রকাশ হয়। এইজন্য আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয় প্রকাশ পায় না। কেন না, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই বিষয়ের প্রকাশ হয়। বিষয়াকার-বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশেই বিষয়ের প্রকাশ।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেও উজ্জ্বলিত হয় না। কিন্তু নির্ম্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্বসমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলিত বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। বুদ্ধিসত্ত্বে চিতিশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই, জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি বস্তুতঃ বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও, পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ, ইহারই নাম পৌরুষেয় বোধ। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। পাতঞ্জলভাষ্যকার বেদব্যাসের মতও ঐরূপ। কিন্তু সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধি-বৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েতেই উভয়ের প্রতিবিম্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেই-রূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অপরিণামী, অথচ তাঁহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপ বিষয়াকারতা স্বীকার

করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজমত-সমর্থনের জন্য নিম্নলিখিত বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥

তটস্থ বৃক্ষসকল যেমন সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বিস্তৃত সেই চৈতন্যস্বরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তুদৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকার বৃত্তিসকল প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি উপসংহারে বলেন যে—

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমাঽর্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥

আমাদিগের অর্থাৎ সাংখ্যদিগের মতে বিশুদ্ধ চেতন অর্থাৎ পুরুষ, প্রমাতা অর্থাৎ প্রমাসাক্ষী। বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি-সকলের চেতনে কিনা পুরুষে প্রতিবিম্বন প্রমা। প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানাদিস্থলেও সাংখ্যমতে উক্তরূপ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নিব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর, এইজন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিসকল বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম নহে। তার্কিকেরাও এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও ভ্রান্ত হইয়াছে। সাংখ্যেরা বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় সুখদুঃখাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ পুরুষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুখদুঃখাদি না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, যে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তাহা অনুমানসিদ্ধ। যাহা অনুমানদ্বারাও সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্তবাক্য অনুসারে সিদ্ধ হইবে। প্রধানপুরুষাদি প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও অনুমানসিদ্ধ। মহদাদিক্রমে সৃষ্টিক্রম অনুমানসিদ্ধ না হইলেও আপ্তবাক্য-সিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাবনিশ্চয় হয়, সেইরূপ প্রধানপুরুষাদিরও অভাবনিশ্চয়

হউক, এ আপত্তি সঙ্গত নহে। যেহেতু অতিদূরত্ব, অতিনিকটত্ব, ইন্দ্রিয়ঘাত, মনের অনবস্থান বা অভিনিবেশাভাব, বিষয়ের সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব, অনুদ্ভব এবং তুল্যবস্তন্তরের সংশ্লেষবশতঃ বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশে উৎপতিত পতত্রী কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়া যখন অতিদূর প্রদেশে গত হয়, তখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার অভাবনিশ্চয় করা যাইতে পারে না। লোচনস্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়ঘাত অন্ধত্ব-বধিরত্বাদি। অন্ধ ব্যক্তি বিদ্যমান বস্তু দেখিতে পায় না, বধির ব্যক্তি বিদ্যমান শব্দ শুনিতে পায় না। অনবস্থিতচিত্ত অর্থাৎ যাহার মন বিষয়ান্তরে আসক্ত, তথাবিধ ব্যক্তি উজ্জ্বল-আলোক-স্থিত ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তু ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। যবনিকার অন্তরালস্থ বস্তু ব্যবহিত বলিয়া দৃষ্ট হয় না। রাত্রিকালের ন্যায় দিবাকালে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যের প্রখরতেজে অভিভূত হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দুগ্ধাদি অবস্থায় দধ্যাদি এবং তিলে তৈল উদ্ভূত হয় নাই বলিয়া উপলব্ধ হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর, জলাশয়-পতিত বৃষ্টিজল তুল্যবস্তন্তরের সংশ্লেষবশতঃ পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত উদাহরণপ্রপঞ্চ দ্বারা স্থির হইল যে, প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলেই বস্তুর অভাবনিশ্চয় করা যাইতে পারে না। কেন না, উক্ত উদাহরণাবলীতে বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি হইতে পারিতেছে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলে তাহার অভাবনিশ্চয় করা যাইতে পারে। ঘটপটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ, অথচ গৃহে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে, গৃহে ঘটপটাদি নাই—এইরূপ অভাবনিশ্চয় হইতে পারে। ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্ব্বাকের ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে, চার্ব্বাক যখন গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তখন সে গৃহজন দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহাদের অভাবনিশ্চয় করিয়া কপালে করাঘাতপূর্ব্বক উচ্চস্বরে রোদন করাই তাহার কর্ত্তব্য হইতে পারে। তাহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে সেও ঐরূপ করিয়া থাকে। অতএব

যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য, তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে তাহার অভাবনিশ্চয় হইতে পারে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহার অভাবনিশ্চয় হইতে পারে না। প্রধানপুরুষাদি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষের অযোগ্য, সুতরাং প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহাদের অভাব-নিশ্চয় করা নিতান্তই অসঙ্গত। কেন না, অন্য প্রমাণদ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। প্রমাণসিদ্ধ বস্তুতে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলে, তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কারণ, দৃঢ়তর প্রমাণদ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, অথচ তাহাতে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি হইতেছে না। সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে বলিয়াই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, এতদ্ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রস কোনও প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং উহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাবনিশ্চয় করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ার্থ, অথচ ইন্দ্রিয়ের যোগ্য নহে, এরূপ কল্পনা করাও অসঙ্গত।

সাংখ্যমতে প্রমেয় বা পদার্থগুলি 'তত্ত্ব'নামে অভিহিত। তত্ত্ব পঞ্চ-বিংশতিপ্রকার—মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্ধতন্মাত্র—এই পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চক, পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন—এই একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এবং পুরুষ। তন্মধ্যে প্রথম চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব জড়বর্গ, পুরুষ চেতন। সাংখ্যা-চার্য্যেরা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করেন, সুতরাং প্রকৃত্যাদির ধর্ম্মও প্রকৃত্যাদিরূপেই পরিগৃহীত। এই তত্ত্বগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কোন তত্ত্ব কেবলই প্রকৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে। কোন কোন তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক। কোন কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি অর্থাৎ কোনও তত্ত্বের প্রকৃতি নহে। কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। প্রকৃতিশব্দের অর্থ উপাদান-কারণ, বিকৃতিশব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না, মূলপ্রকৃতি কারণজন্য হইলে সেই কারণও

কারণান্তরজন্য, সেই কারণান্তরও অপরকারণজন্য—ইত্যাদিরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। অতএব মূলকারণ উৎপন্ন বস্তু নহে, উহা স্বতঃসিদ্ধ—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এতাবতা সিদ্ধ হইল যে, মূলপ্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, কাহারও বিকৃতি নহে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি বা উভয়রূপ। অর্থাৎ ইহারা কোন তত্ত্বের প্রকৃতি এবং কোন তত্ত্বের বিকৃতি। মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূলপ্রকৃতির বিকৃতি। এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকৃতি। উক্তরূপে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কারতত্ত্ব পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কার-তত্ত্বের বিকৃতি, এবং তাহা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পঞ্চমহাভূতের প্রকৃতি। পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বান্তরের উপাদান বা আরম্ভক হয় না। এজন্য উহারা প্রকৃতি নহে। উহারা পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিকৃতি বটে। অতএব পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহারা কেবলই বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নহে। পুরুষ অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। স্মরণ করিতে হইবে. প্রকৃতিশব্দের অর্থ কারণ, বিকৃতি-শব্দের অর্থ কার্য্য। পুরুষ কূটস্থ অর্থাৎ জন্যধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এজন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই, সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলি অনুমানসিদ্ধ। জগৎরূপ কার্য্যদ্বারা তাহার মূলকারণ অনুমেয়। কেন না, কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে বাদীদিগের বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা অসদ্বাদী। তাঁহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা বলেন, বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তবে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ভাবরূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে, বীজের

প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুররূপ ভাবপদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্তদ্বারা সর্ব্বত্রই অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ, বৌদ্ধেরা এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বীজের প্রধ্বংসের পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য। কিন্তু বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ ভাবভূত বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক। বীজাভাব অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে, অভাব সর্ব্বস্থলে সুলভ বলিয়া সর্ব্বস্থলে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। ভাবপদার্থই ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। বৌদ্ধদিগের অসদ্বাদের ন্যায় বৈদান্তিকদিগের বিবর্ত্তবাদও সাংখ্যাচার্য্যদিগের আদৃত হয় নাই। বিকারবাদ বা পরিণামবাদেরই তাঁহারা আদর করিয়াছেন। বিকার ও বিবর্ত্তের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

অর্থাৎ বস্তুর সহিত যে অন্যথাপ্রথা কিনা অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার, আর বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তর-প্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান নির্বস্তুক নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে, কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুগত্যা কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের দধিভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকেরা বিবেচনা করেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি-অবিদ্যা-রূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ-নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মান মাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইবার পর নৈপুণ্য-সহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে, 'ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু'—এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রপঞ্চসম্বন্ধে ঐরূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। অতএব প্রপঞ্চপ্রতীতি ভ্রমাত্মক, ইহা বলা যাইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে সাংখ্যাচার্য্যেরা বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিণামবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন। মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিণামবাদে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট, যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে বস্তুগত্যা ভিন্ন—ইহা বলা যাইতে পারে না। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না, তাহার পূর্ব্বেও ত কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। অতএব কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে,—অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। অর্থাৎ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ও অব্যক্তরূপে কার্য্য বিদ্যমান ছিল, কারকব্যাপার-দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সাংখ্যাচার্য্যেরা পরিণামবাদ অবলম্বন করায় সৎকার্য্যবাদ অবলম্বন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতই তাঁহারা সৎকার্য্যবাদী। এই সৎকার্য্যবাদের প্রবল প্রতিপক্ষ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ। তাঁহারা সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হয়, এই মতের পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহারা আরম্ভবাদী। তাঁহাদের মতে জগতের মূলকারণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পরমাণু সৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বী পর্য্যন্ত কার্য্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে পরমাণু-সমারব্ধ অর্থাৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং কার্য্যকলাপ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ ছিল না, উৎপত্তির পরে সৎ হইয়াছে। অতএব সৎ হইতে

অসতের উৎপত্তি, ইহা সিদ্ধ হইল। আরম্ভবাদীদিগের মতে কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, কার্য্য কিন্তু তৎকালে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান।

উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান ছিল, ইহ প্রতিপন্ন হইলেই আরম্ভবাদের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিবার জন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে যদি বস্তুতই কার্য্য অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান হইত, তবে কেহই কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত না। সহস্র শিল্পী যত্ন করিয়াও নীলকে পীত বা পীতকে নীল করিতে পারে না। কারণ, নীল পীত নহে। তদ্রূপ কার্য্য বস্তুতঃ অসৎ হইলে কোন-মতেই সৎ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন ঘট পাকের পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ এবং পাকের পরে রক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ কার্য্যও কারণব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ এবং কারণব্যাপারের পরে সৎ হইবার বাধা নাই। অর্থাৎ কালভেদে শ্যামত্ব ও রক্তত্বের ন্যায় অসত্ত্ব ও সত্ত্বও ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলেই প্রকারান্তরে সৎকার্য্যবাদের অঙ্গীকার করা হয়। কেন না, শ্যামাবস্থা ও রক্তাবস্থা—এই উভয়কালে ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বরূপ ধর্ম্মভেদ হইতে পারে। প্রকৃতস্থলে কাল-ভেদে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটের অসত্ত্ব এবং উৎপত্তির পরে তাহার সত্ত্ব—ইহা স্বীকার করিলেই উভয়কালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ধর্ম্মীর আশ্রয়েই ধর্ম্মের অব-স্থিতি। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে ধর্ম্মিরূপ ঘট নাই, অথচ তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্ব থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব ও হাস্যাস্পদ।

কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি কার্য্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তবে কারণব্যাপার ব্যর্থ—এ আপত্তিও অসঙ্গত। কেন না, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যই কারণব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ কার্য্য কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বেও সৎ, সন্দেহ নাই, কিন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বে তাহা অনভিব্যক্ত থাকে, কারণব্যাপারদ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয়।

সুতরাং কারণব্যাপার নিরর্থক নহে। নিপীড়নদ্বারা তিলে তৈলের, অবঘাতদ্বারা ধান্যে তণ্ডুলের, এবং দোহনদ্বারা গবাদিতে দুগ্ধের অভিব্যক্তি হয়—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তিলে তৈলের, ধান্যে তণ্ডুলের এবং গবাদিতে দুগ্ধের বিদ্যমানতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। সুতরাং কারণ-ব্যাপারদ্বারা সতের অভিব্যক্তি সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে।

সতের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কিন্তু অসতের উৎপত্তির একটিও দৃষ্টান্ত নাই। যাহা বস্তুগত্যা অসৎ, কোনকালে তাহার উৎপত্তি হয় না—হইতে পারে না। মনুষ্যশৃঙ্গ, কূর্ম্মরোম ও গগন-কমলিনী বস্তুগত্যা সৎ নহে, এইজন্য তাহাদের উৎপত্তি কেহ কোন-কালে দেখেন নাই, শুনেন নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যেরই কারণব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্তি হয়, অসতের উৎপত্তি হয় না। আর এক কথা। যে কারণের সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয়; যে কারণের সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ নাই, সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় না; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তন্তুর সহিত পটের এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তন্তু হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব বা উৎ-পত্তি হইয়া থাকে। তন্তুর সহিত ঘটের বা মৃত্তিকার সহিত পটের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া তন্তু হইতে ঘটের বা মৃত্তিকা হইতে পটের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় না।

গবাদি-শরীরের বা তদুপাদানের সহিত শৃঙ্গের এবং মনুষ্যাদি-শরীরের বা তদুপাদানের সহিত রোমের সম্বন্ধ আছে বলিয়া গবাদির শৃঙ্গ এবং মনুষ্যাদির রোম হইয়া থাকে। মনুষ্যশরীরের বা তদুপাদানের সহিত শৃঙ্গের, এবং কূর্ম্মশরীরের বা তদুপাদানের সহিত রোমের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনুষ্যের শৃঙ্গ এবং কূর্ম্মের রোম হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি-কার্য্যের মৃত্তিকাদি কারণের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে অপরাপর কার্য্য যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ-শূন্য, ঘটও সেইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধশূন্য। তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, পটাদি অপরাপর কার্য্যের

উৎপত্তি হয় না—এরূপ নিয়ম হইবার কোনও কারণ নাই। সম্বন্ধশূন্যতার ইতরবিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্য্য সমস্ত কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে। এই অব্যবস্থা অর্থাৎ অনিয়মের নিবারণের জন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণবিশেষের সহিত কার্য্যবিশেষের সম্বন্ধ থাকে। তাহা হইলেই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। কেন না, একাধিক বিদ্যমান বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে। একটি বিদ্যমান, অপরটি অবিদ্যমান—এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কোনক্রমেই হইতে পারে না।

যদি বলা হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে,—যাহার প্রভাবে কারণবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কার্য্যের উৎপাদন করে না। তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ অসাধারণ শক্তির সহিত কার্য্যবিশেষের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না? যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে অসতের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, সম্বন্ধ না থাকিলে কারণের ন্যায় কারণগতশক্তিও কার্য্যবিশেষের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং 'অব্যবস্থা'দোষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কারণগতশক্তি কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা মাত্র। অন্যরূপ শক্তিবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা কারণাত্মক। কারণ সৎ, এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। সুতরাং কারণ হইতে অভিন্ন এবং কারণাত্মক কার্য্যও সৎ—ইহাতেও মতান্তর হইবার কোন কারণ নাই। কার্য্য কারণের অবস্থাবিশেষ মাত্র। ঘট মৃত্তিকার, পট তন্তুর, কুণ্ডল সুবর্ণের অবস্থাবিশেষ—ইহাতে সন্দেহই হইতে পারে না। যে সকল বস্তু পরস্পর ভিন্ন, তন্মধ্যে একটি বস্তু অপরের ধর্ম্ম অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ হয় না। গো-পশু ও অশ্ব-পশু পরস্পর ভিন্ন, এইজন্য তাহাদের একটি অপরের ধর্ম্ম হয় না। পট কিন্তু তন্তুর ধর্ম্ম, সুতরাং পট তন্তু হইতে ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে তন্তুর ধর্ম্ম হইত না। তন্তু উপাদান, পট উপাদেয়। যে বস্তুর নির্ম্মাণের জন্য লোকে যে বস্তুর সংগ্রহ করে অর্থাৎ যে বস্তুদ্বারা অভিলষিত বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান; যে বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম উপাদেয়। যে সকল বস্তু পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন,

তাহাদের উপাদান-উপাদেয়-ভাব হয় না। ঘট ও পট পরস্পর ভিন্ন, এই-জন্য তাহাদের উপাদান-উপাদেয়-ভাব নাই। তন্তু ও পটের উপাদান-উপাদেয়-ভাব আছে, অতএব তন্তু ও পট পরস্পর ভিন্ন নহে।

যে সকল বস্তু বাস্তবিক পরস্পর ভিন্ন, তাহাদের হয় পরস্পর সংযোগ, না হয় পরস্পর অপ্রাপ্তি বা অসম্বন্ধ থাকে। কুণ্ড ও বদর পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাহাদের কখনও পরস্পর সংযোগ কখনও বা পরস্পর অপ্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল পরস্পর ভিন্ন, তাহাদের সর্ব্বদাই পরস্পর অপ্রাপ্তি আছে। তন্তু ও পটের পরস্পর সংযোগ বা অপ্রাপ্তি নাই। কেন না, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক আচার্য্যদিগের মতে তন্তু ও পটের সম্বন্ধ সমবায়। সুতরাং তন্তু ও পট পরস্পর ভিন্ন নহে। অপিচ, গুরুত্ব একপ্রকার গুণ, তাহার কার্য্য অবনতি। অর্থাৎ ওজন করিবার সময় গুরুবস্তু অবনত হইয়া পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন, তাহার কার্য্য অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন। একপল সুবর্ণদ্বারা যে অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং দ্বিপল সুবর্ণদ্বারা যে অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ উভয় অলঙ্কার পরস্পর ভিন্ন, তাহাদের গুরুত্ব এবং গুরুত্বের কার্য্য অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন। একপলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্য্য অবনতি অপেক্ষা দ্বিপলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্য্য অবনতি অধিক—ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। কিন্তু একপল সুবর্ণের যেরূপ গুরুত্বকার্য্য অর্থাৎ অবনতি, এক-পলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্য্যও সেইরূপ। যে তন্তুসমষ্টিদ্বারা পট নির্ম্মিত হয়, ঐ তন্তুসমষ্টি ও পটের গুরুত্বকার্য্য একরূপ। অতএব কারণ ও কার্য্য পরস্পর ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে সুবর্ণের গুরুত্ব অপেক্ষা অল-ঙ্কারের গুরুত্বের এবং তন্তুর গুরুত্ব অপেক্ষা পটের গুরুত্বের কার্য্য অর্থাৎ অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন হইত। কেন না, কারণের গুরুত্ব ত আছেই, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন হইলে কার্য্যের গুরুত্ব কারণের গুরুত্ব অপেক্ষা অবশ্য ভিন্ন হইবে। সুতরাং গুরুত্বকার্য্য অবনতিও ভিন্ন হওয়াই সঙ্গত। মণ্ড-লেপনদ্বারা যে পটের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ অধিক হয়, তাহার কথা বলা হইতেছে না। কেন না, পট নির্ম্মিত হইলে মণ্ডলেপন করা হইয়া থাকে। এই মণ্ডলেপন যেমন পটে করা হয়, তেমনি সূত্রে করা হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু মণ্ডলেপনের পূর্ব্বে ওজন করিলে পটের এবং

তন্তুপাদান তন্তুসমষ্টির গুরুত্বকার্য্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। কার্য্য ও কারণ পরস্পর ভিন্ন হইলে কিন্তু এরূপ হইতে পারে না।

প্রত্যেক বাহক যেমন শিবিকাবহন করিতে পারে না, অথচ তাহারাই মিলিত হইয়া শিবিকাবহন করিতে পারে, সেইরূপ প্রত্যেক তন্তু প্রাবরণ করিতে না পারিলেও তন্তুসকল মিলিত হইয়া পটভাবাপন্ন হইলে প্রাবরণ করিতে সক্ষম হয়। বিশেষভাবে পরস্পর মিলিত তন্তুসমষ্টিই পট। অতএব সিদ্ধ হইলে যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। কারণ সৎ, সুতরাং কার্য্যও সৎ। ভাষ্যকার সৎকার্য্যবাদের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একখানি শিলাফলকদ্বারা অখণ্ড প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শিল্পী শিলাফলকে প্রতিমার আকার অঙ্কিত করিয়া লয়। পরে শিলাফলকের অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেই প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রতিমার জন্য শিল্পীকে নূতন কিছুই করিতে হয় নাই। অনপেক্ষিত অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে যে, শিলাফলকে প্রতিমা ছিল। অনপেক্ষিত অংশ সংযুক্ত থাকায় তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায় নাই বা অভিব্যক্ত ছিল না। শিল্পীর ব্যাপারদ্বারা ঐ অনপেক্ষিতাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্ব্বসিদ্ধ প্রতিমার অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র।

অষ্টম লেক্‌চর

সাংখ্যদর্শন।

কার্য্য কারণাত্মক, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কার্য্য জগৎ সুখদুঃখ-মোহাত্মক, সুতরাং তাহার কারণও সুখদুঃখমোহাত্মক হইবে, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। জগতের সমস্ত বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহ বা বিষাদের হেতু হয় বলিয়া উহা সুখদুঃখমোহাত্মকরূপে নিশ্চিত হয়। 'অমুক ব্যক্তি মরিয়াছে'—এই শব্দ শ্রুত হইলে, মৃত ব্যক্তির শত্রুর সুখ, মিত্রের দুঃখ এবং পিত্রাদির মোহ উপস্থিত হয়। ঐ শব্দই সুখ-দুঃখ-মোহ উৎপাদন করে, এইজন্য উহা সুখদুঃখমোহাত্মক। রূপ-যৌবনকুলশীলসম্পন্না একটি স্ত্রী স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী, তাহার লাভে বঞ্চিত পুরুষান্তরকে মোহ বা বিষাদযুক্ত করে। ইহার কারণ এই যে, স্বামীর প্রতি তাহার সুখরূপ সমুদ্ভূত, দুঃখাদিরূপ অভিভূত। সপত্নীর প্রতি দুঃখরূপ সমুদ্ভূত, সুখাদিরূপ অভিভূত। যে পুরুষান্তর তাহার লাভে বঞ্চিত, তাহার প্রতি তাহার মোহরূপ সমুদ্ভূত, সুখাদিরূপ অভিভূত। বাচস্পতিমিশ্র বলেন—"অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ"—অর্থাৎ এই স্ত্রীর সুখদুঃখমোহাত্মকত্বের ন্যায় সমস্ত পদার্থের সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব বুঝিতে হইবে। স্থির হইল যে, জগতের ন্যায় জগতের মূলকারণও সুখদুঃখমোহাত্মক। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় জগতের মূলকারণ। মূলপ্রকৃতি, প্রধান ও অব্যক্ত প্রভৃতি তাহারই নামান্তর। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, লঘু ও প্রকাশক। রজোগুণ দুঃখাত্মক, চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহাত্মক বা বিষাদাত্মক, গুরু, আবরক ও নিয়ামক।

যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া অনলের সহিত রূপপ্রকাশরূপ কার্য্য সম্পাদন করে, এবং বাত,

পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও মিলিত হইয়া শরীরধারণ-রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। সত্ত্বাদির পরস্পর সংযোগ ও লঘুত্বাদি গুণ আছে বলিয়া উহারা দ্রব্য। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পুরুষের উপকরণ বা পুরুষরূপ পশুর বন্ধনের হেতু বলিয়া গুণশব্দে অভিহিত হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বিবিধ পরিণাম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সদৃশ পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়। কেন না, পরিণাম সত্ত্বাদির স্বভাব। গুণত্রয় কোনরূপ পরিণাম ভিন্ন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। সৃষ্টিকালে বিসদৃশ পরিণাম হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুণ-ত্রয়ের বিসদৃশ পরিণাম হইলেই সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকালে প্রলয়কালের ন্যায় সমানরূপে গুণত্রয়ের পরিণাম হয় না, বিষমরূপে হইয়া থাকে। জগতে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, পরিণামবৈষম্য তাহার হেতু। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্য এবং অপরাপর গুণের গুণভাব বা অপ্রাধান্য হয়। যেমন জল একরস হইলেও সেই সেই ভূমিবিকারের সংযোগে নারিকেল-জম্বীর-চিরবিল্বাদি-ফলরস-রূপে পরিণত হইয়া মধুর, অম্ল ও তিক্তাদিরূপে অনুভূয়মান হয়, সেইরূপ কার্য্যবিশেষে গুণবিশেষের উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধান গুণ প্রধান গুণের আশ্রয়ে বিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়া বিচিত্র কার্য্যের উৎপাদন করে।

প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই সংহত বা মিলিতগুণত্রয়স্বরূপ, সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক, অত-এব পরার্থ, অর্থাৎ অপরের প্রয়োজনসম্পাদনার্থ তাহাদের উদ্ভব। গৃহ-শয্যা-আসনাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদনুসারে সংঘাতমাত্রই পরার্থ, ইহা স্থির হইতেছে। প্রকৃতি-মহদাদি সমস্তই সংঘাত, অতএব পরার্থ। সেই পর—পুরুষ বা আত্মা। এতাবতা পুরুষ সংঘাতাতিরিক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক নহে—গুণাতীত, ইহাও সিদ্ধ হইতেছে। কেন না, পুরুষ সংঘাতাত্মক হইলে সেও পরার্থ হইবে, সেই পর সংঘাতাত্মক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং পুরুষ অসংহত, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথিপ্রভৃতি চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও ত্রিগুণাত্মক, তাহাও অবশ্য অন্যকর্তৃক অর্থাৎ চেতন-কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে। সেই অন্যই পুরুষ বা আত্মা। তৃতীয়তঃ, সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে অনুকূল-বেদনীয় এবং প্রতিকূল বেদনীয়। সুখের অনুকূলনীয় এবং দুঃখের প্রতিকূলনীয় গুণাতীত পুরুষ। বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখাত্মক ও দুঃখাত্মক, এইজন্য সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতি-কূলনীয় হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে স্বক্রিয়াবিরোধ হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ, বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, অতএব তাহার দ্রষ্টারূপেও পুরুষ সিদ্ধ হইতেছেন। কেন না, দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য হইতে পারে না।

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সর্ব্বশরীরে এক পুরুষ নহেন। সমস্ত শরীরে এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মরণে সকলের মরণ, একের অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতাদি, একের প্রবৃত্তিতে সকলের প্রবৃত্তি, এবং একের সুখদুঃখে সকলের সুখদুঃখ হইতে পারে। তাহা হয় না বলিয়াই শরীরভেদে পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন। এই পুরুষ সাক্ষী। কেন না, প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদবিষয় যাহাকে দেখায়, লোকে তাহাকে সাক্ষী বলে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণাতীত, এইজন্য অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাব কৈবল্য। দুঃখ গুণধর্ম্ম, পুরুষ গুণাতীত। এইজন্য পুরুষ কৈবল্যযুক্ত। প্রধানমহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে। কেন না, ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্যতা হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদি-গত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন। বিবেকজ্ঞানদ্বারা তাহার পরিহার হয়। বিবেকজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। এইহেতু বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করেন। উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগ-বশতঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতিশক্তিহীন ও দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃক্‌শক্তিহীন গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ, এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু গতিশক্তিসম্পন্ন অন্ধের

স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথপ্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলষিতসিদ্ধি হয়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগও তদ্রূপ। পুরুষ দৃক্‌শক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তিশূন্য বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত ও দৃক্‌শক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগহেতুঃ প্রকৃতি-মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ বস্তুগত্যা অকর্ত্তা হইয়াও গুণের কর্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হন।

সর্গ বা সৃষ্টি দুইপ্রকার—প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ। বুদ্ধিসর্গের নাম প্রত্যয়সর্গ। ভূত-ভৌতিক সর্গের নাম তন্মাত্রসর্গ। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহার অসাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপার অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। বুদ্ধির ধর্ম্ম আটটি—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহাদের প্রথম চারিটি সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটি তামস। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব। অভিমান তাহার বৃত্তি। 'আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন-সম্পাদনের জন্য', ইত্যাদিরূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। অহঙ্কার তিনপ্রকার—বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস ও ভূতাদি বা তামস। সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তামস তন্মাত্রপঞ্চক তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। রাজস অহঙ্কার উভয়বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারী মাত্র। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্—এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তাহা উভয়াত্মক। অর্থাৎ মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই উভয়রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। গুণসকলের পরিণামবিশেষবশতঃ নানা ইন্দ্রিয় এবং নানা বাহ্যপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে কিনা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে কল্পনা। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা কিনা অপরিস্ফুট জ্ঞানমাত্র যথাক্রমে চক্ষুরাদি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার। বচন বা কথন, আদান বা গ্রহণ, বিহরণ বা গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ ও আনন্দ, এই পাঁচটি যথাক্রমে বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটি

অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি দশটি বাহ্যকরণ। অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তি বলা হইয়াছে। উহাদের সাধারণ বৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। প্রাণবায়ু—নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠবৃত্তি। কৃকাটিকা, পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্ববৃত্তি বায়ুর নাম অপানবায়ু। সমানবায়ু—হৃদয়, নাভি ও সমস্তসন্ধি-স্থানবৃত্তি। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যস্থানস্থিত বায়ুর নাম উদান। ত্বগ্‌বৃত্তি বায়ুর নাম ব্যান। উহা সর্ব্বশরীরব্যাপী। মহত্তত্ত্বাদের বৃত্তি বা কার্য্যগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে অপরিস্ফুটরূপে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। কেন না, ঐ জ্ঞান বিকল্পশূন্য অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য। বালক কিংবা মূক ব্যক্তি যেমন তাহাদের জ্ঞান শব্দের দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারে না, আলোচন-জ্ঞানও সেইরূপ অভিলাপ বা শব্দের দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারা যায় না। কেন না, শব্দদ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হইবে, তাহা অবশ্য বিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন হইবে। আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে, সুতরাং শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেই পারে না। অতএব বুদ্ধীন্দ্রিয়দ্বারা 'ইহা একটি বস্তু'—ইত্যাকার আলোচনমাত্র হয়। পরে 'ইহা এইরূপ, এরূপ নহে'—ইত্যাকারে সম্যক্‌রূপে কল্পনা কিনা বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিবেচনা করা মনের কার্য্য। মনঃসঙ্কল্পিত বিষয়ে অহঙ্কার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ 'আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ'—ইত্যাকার অভিমান করে। 'এই অভিমত বিষয়ে ইহা আমার কর্ত্তব্য'—ইত্যাকার নিশ্চয় করা বুদ্ধির কার্য্য। স্মরণ করিতে হইবে যে, অগ্নিসংযোগে অয়ঃপিণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষসংযোগে চিৎপ্রতিবিম্বদ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব পুরুষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাই পুরুষের সংসার। মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, সংসারদশাতেও বাস্তবিক পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। কেন না, পুরুষ তৎকালেও কেবলই রহিয়াছে। উক্তপ্রণালীক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগসম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেক-জ্ঞানদ্বারা পুরুষের মুক্তিসাধিকা। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার বস্তুগত্যা পুরুষের নাই। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসারভাগিনী।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, বাহ্যেন্দ্রিয়সকল গ্রামাধ্যক্ষের, মন বিষয়াধ্যক্ষের অর্থাৎ দেশাধ্যক্ষের, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষের এবং পুরুষ মহারাজের স্থানীয়। গ্রামাধ্যক্ষ প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া বিষয়াধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করে। বিষয়াধ্যক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষের নিকট দেয়। সর্ব্বাধ্যক্ষ মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহা মনের নিকট উপস্থিত করে। মন সঙ্কল্পপূর্ব্বক বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে, বুদ্ধি উক্তক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করে। বাহ্যেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের বৃত্তি ক্রমে হয়, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। কিন্তু কখন-কখন এককালেও সকলের বৃত্তি হইয়া থাকে। ঘোর অন্ধকারে ক্ষণিক-বিদ্যুৎপ্রকাশ-কালে যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি নিকটে ভয়ানক ব্যাঘ্র মুখব্যাদানপূর্ব্বক গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক দ্রষ্টা ঐ স্থান হইতে অপসৃত হইয়া পড়ে। ঐ স্থলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়। ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থনির্ব্বাহের জন্যই করণসকলের প্রবৃত্তি। অন্য প্রবর্ত্তয়িতার অপেক্ষা নাই। সমষ্টিতে করণ ত্রয়োদশপ্রকার। তন্মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল আহরণ করে অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণত্রয় সাধারণবৃত্তিরূপ প্রাণাদিবায়ুপঞ্চক দ্বারা শরীরধারণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক স্ব স্ব বিষয়ের প্রকাশ করে। ত্রয়োদশপ্রকার করণের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য—আহার্য্য শব্দাদি বিষয়। শব্দাদি বিষয়সকল দিব্য ও অদিব্য ভেদে প্রত্যেকে দুইপ্রকার। সুতরাং সমষ্টিতে আহার্য্য দশপ্রকার। অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণব্যাপার প্রাণাদিবায়ুপঞ্চক দ্বারা ধার্য্য শরীর বা শরীরধারণ। শরীর পাঞ্চভৌতিক। পঞ্চভূতসকল আবার দিব্য ও অদিব্য ভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং ধার্য্যও দশপ্রকার। বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকের প্রকাশ্য শব্দাদিপঞ্চক প্রত্যেকে দিব্য ও অদিব্য ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রকাশ্যও দশপ্রকার। দশপ্রকার বাহ্যকরণ ত্রিবিধ অন্তঃকরণের স্ব স্ব ব্যাপারের সহায়তা করে। কেন না, কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা আহৃত এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়দ্বারা প্রকাশিত বিষয়েই সচরাচর সঙ্কল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়রূপ অন্তঃকরণত্রয়ের বৃত্তি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালবিষয়েই

বাহ্যেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। কিন্তু অন্তঃকরণের ব্যাপার—বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত, এই কালত্রয়বিষয়েই অপ্রতিহত।

করণের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। এখন তন্মাত্রসম্বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। তন্মাত্রসকল সূক্ষ্ম বলিয়া অস্মদাদির ভোগ্য নহে। এইজন্য উহারা অবিশেষ বলিয়া কথিত। শান্তত্ব বা সুখত্ব, ঘোরত্ব বা দুঃখত্ব এবং মূঢ়ত্বরূপ বিশেষ—ভোগ্যবস্তুতেই অবস্থিত। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণক আকাশ, শব্দতন্মাত্রযুক্ত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু, শব্দস্পর্শতন্মাত্রসহিত রূপতন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শরূপগুণযুক্ত তেজঃ, শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্রসহকৃত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগুণযুক্ত জল এবং শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্রসংবলিত গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ-মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল, কেহ বিষাদকর ও গুরু। অতএব ইহারা বিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বিশেষ-সকলও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সূক্ষ্মশরীর, মাতাপিতৃজ বা স্থূল শরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-তন্মাত্র, এই সকলের সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। ইন্দ্রিয়সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক, অতএব বিশেষ। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত, অতএব বিশেষমধ্যে পরিগণিত। এক এক পুরুষের এক একটি সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূলদেহের গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার নাম সংসার। চিত্র যেমন আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইজন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয়-স্বরূপ স্থূলশরীর অপেক্ষিত। বাচস্পতিমিশ্রের মতে শরীর দুইটি—সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিনটি—সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও স্থূলশরীর। তিনি বলেন, স্থূলদেহের পরিত্যাগের পরে লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর কোন সময়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের

সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই অধিষ্ঠান-শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর। সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক, কাহারও বা উপায়ানুষ্ঠানসাধ্য। সূত্রকারেরা বলেন, সৃষ্টির আদিতে মহামুনি কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মদ্বারা ঊর্দ্ধগমন, অধর্ম্মদ্বারা অধোগমন, জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ, অজ্ঞানদ্বারা বন্ধ, বৈরাগ্যদ্বারা প্রকৃতিতে লয়, রাগদ্বারা সংসার, ঐশ্বর্য্যদ্বারা ইচ্ছার সফলতা এবং অনৈশ্বর্য্যদ্বারা ইচ্ছার বিঘাত বা নিষ্ফলতা হইয়া থাকে।

প্রত্যয়সর্গ প্রকারান্তরে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। বিপর্য্যয় পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ইহাদের যথাক্রমে নামান্তর—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। অনাত্মাতে আত্মখ্যাতির নাম অবিদ্যা। অনিত্য ও অনাত্মীয় বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয়রূপে অভিমান অস্মিতা। রাগ ও দ্বেষের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। অভিনিবেশ—ভয়। অস্মিতা বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানস্বভাব এবং রাগাদি বিপর্য্যয়মূলক বলিয়া বিপর্য্যয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অবিদ্যা বিষয়ভেদে আটপ্রকার। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টবিধ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অবিদ্যা আটপ্রকার। দেবগণ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া উহাকে নিত্য ও আত্মীয়-রূপে বিবেচনা করেন। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বস্তুগত্যা অনিত্য ও অনাত্মীয়। কেন না, ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিধর্ম্ম, এইজন্য অনাত্মীয়। সুতরাং অস্মিতাও বিষয়-ভেদে আটপ্রকার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহারাই রঞ্জনীয় অর্থাৎ রাগের বিষয়। শব্দাদি বিষয়গুলি দিব্য ও অদিব্য ভেদে প্রত্যেকে দ্বিবিধ। অতএব বিষয়ভেদে রাগ দশপ্রকার। শব্দাদি দশ বিষয় স্বভাবত রঞ্জনীয় হইলেও উহারা পরস্পর প্রতিহন্যমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ একবিধ শব্দাদি অপরবিধ শব্দাদির ভোগের প্রতিবন্ধক হয়। প্রতি-বন্ধক শব্দাদিবিষয়ে দ্বেষের আবির্ভাব স্বাভাবিক। ভোগ্য শব্দাদির উপায়স্বরূপ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য স্বভাবতই দ্বেষবিষয়। কেন না,

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পাদন বহু-আয়াস-সাধ্য। অতএব শব্দাদি দশটি ভোগ্যবিষয় এবং তৎসম্পাদক অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য—এই অষ্টাদশ বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া বিষয়ভেদে দ্বেষ অষ্টাদশপ্রকার। ভোগ্য শব্দাদি দশ বিষয় ও তাহার উপায়ভূত অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, এই অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশভয় হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অভিনিবেশও অষ্টাদশপ্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশপ্রকার এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশপ্রকার। সুতরাং মোটের উপর অশক্তি অষ্টাবিংশতিপ্রকার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অশক্তি অন্ধতাদি। তুষ্টি নয়-প্রকার, সিদ্ধি আটপ্রকার। ইহাদের বিপর্য্যয় বা অভাবনিবন্ধন বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশপ্রকার। বিষয়বৈরাগ্যজন্য তুষ্টি পাঁচ-প্রকার। কেন না, ভোগ্যবিষয় শব্দাদিভেদে পাঁচপ্রকার। বৈরাগ্যের হেতুও পাঁচপ্রকার। কারণ, অর্জ্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোষ, ভোগদোষ ও হিংসাদোষ দর্শনে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ধনোপার্জ্জনের উপায়সকল দুঃখকর। সেবা একটি ধনার্জ্জনের উপায়, তাহা কত কষ্টকর, তাহা সেবাকারী বিলক্ষণ জানেন। পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন

দৃপ্যদ্দুরীশ্বরদ্বাস্থদণ্ডিচণ্ডার্দ্ধচন্দ্রজাম্।
বেদনাং ভাবয়ন্ প্রাজ্ঞঃ কঃ সেবাসু প্রসজ্জতে॥

গর্ব্বিত দুষ্প্রভুর দ্বারস্থিত দণ্ডধারীর ভয়ানক অর্দ্ধচন্দ্র অর্থাৎ গলহস্তজনিত পীড়ার বিষয় চিন্তা করিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেবাতে আসক্ত হইতে পারে? কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি ধনার্জ্জনের উপায়গুলিও দুঃখকর, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রই অবগত আছেন। ধনার্জ্জনের উপায় দুঃখকর বলিয়া বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম পার। অর্জ্জিত ধন অগ্নি, জল ও চৌরাদি দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং ধন উপার্জ্জন করিলেই হয় না, অতি কষ্টে অর্জ্জিত ধনের রক্ষা করিতে হয়। এই রক্ষণক্লেশ চিন্তা করায় যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তজ্জনিত তুষ্টির নাম সুপার। মহাকষ্টে ধনের অর্জ্জন ও রক্ষা করিলেও ভোগদ্বারা তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই ক্ষয়দোষদর্শনজন্য বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম পারাপার। বিষয়ভোগের অভ্যাস ভোগাভিলাষ বর্দ্ধিত করে। কোনক্রমে বিষয়ের অপ্রাপ্তি ঘটিলে বর্দ্ধিত ভোগাভিলাষ নিরতিশয় কষ্ট-

কর হয়। এইরূপ ভোগদোষদর্শনে যে বৈরাগ্য জন্মে, তজ্জনিত তুষ্টির নাম অনুত্তমাম্ভঃ। প্রাণীদিগের পীড়া না জন্মাইয়া ভোগ হইতে পারে না, সমস্ত ভোগেই অল্পবিস্তর প্রাণিহিংসা আছে, ইত্যাকার হিংসা-দোষদর্শনাধীন বিষয়বৈরাগ্যে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম উত্তমাম্ভঃ। বিষয়বৈরাগ্যজন্য এই পঞ্চবিধ তুষ্টি বাহ্যতুষ্টি বলিয়া আখ্যাত। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারিপ্রকার—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্য-তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রকৃতিরই পরিণামবিশেষ। অতএব বিবেক-সাক্ষাৎকারও প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্রী, আমি বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্তা নহি। সুতরাং আমি সর্ব্বদাই কূটস্থ ও পূর্ণ, এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি, ইহারই অপর নাম অম্ভঃ। প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাসের উপাদান কিনা গ্রহণ করিলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম উপাদানতুষ্টি। ইহারই নামান্তর সলিল। সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে সমুৎপন্ন তুষ্টির নাম কালতুষ্টি। এই তুষ্টি 'ওঘ'নামে অভিহিত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ-স্বরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধি লাভ হইলে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি। ভাগ্যতুষ্টির নামান্তর বৃষ্টি। ভাষ্যকারের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টিচতুষ্টয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল। বাচস্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টিগুলি অসদুপদেশজন্য। তিনি বলেন, শিষ্য অবগত হইয়াছে যে, আত্মা প্রকৃত্যাদিরূপ নহে, প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত; কিন্তু অসদুপদেশ-দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করে না। শিষ্যের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতির পরিণামবিশেষ, প্রকৃতিই তাহা সম্পন্ন করিবে, তজ্জন্য ধ্যানাভ্যাসের প্রয়োজন নাই—এইরূপ উপদেশশ্রবণে প্রকৃতিবিষয়ে শিষ্যের যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি। বিবেকখ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃতিমাত্রের কার্য্য নহে। কেন না, বিবেকখ্যাতি প্রকৃতিমাত্রের কার্য্য হইলে সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের বিবেকখ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং বিবেকখ্যাতি সহকারি-কারণান্তরেরও অপেক্ষা করে। সেই সহকারি-কারণান্তর প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস। অতএব সন্ন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস করিয়া কষ্টস্বীকারের আবশ্যকতা নাই—ঈদৃশ উপদেশশ্রবণে যে তুষ্টি

হয়, তাহার নাম উপাদানতুষ্টি। যদিও সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় না, তথাপি কালক্রমে সন্ন্যাস হইতেই মুক্তিলাভ হইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই—এতাদৃশ অসদুপদেশশ্রবণে যে তুষ্টির আবির্ভাব হয়, তাহার নাম কালতুষ্টি। সন্ন্যাসও মুক্তির কারণ নহে, কালও মুক্তির কারণ নহে, ভাগ্যই মুক্তির কারণ, ধ্যানাভ্যাসাদির জন্য পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, ভাগ্য থাকিলে অবশ্যই মুক্তি হইবে। মদালসার পুত্রগণ সন্ন্যাসও করে নাই, ধ্যানাভ্যাসও করে নাই, অথচ অতি বাল্যকালে মাতার উপদেশশ্রবণমাত্রেই তাহারা মুক্ত হইয়াছিল—এইরূপ অসদুপদেশশ্রবণজন্য তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি।

সিদ্ধি আটপ্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ তিনপ্রকার, সুতরাং প্রতিযোগিভেদে দুঃখনিবৃত্তিও তিনপ্রকার। এই দুঃখনিবৃত্তিত্রয় মুখ্যসিদ্ধি। যথাক্রমে এই সিদ্ধিত্রয়ের নামান্তর—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। তাহার সাধনগুলি গৌণসিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত। গৌণসিদ্ধি পাঁচপ্রকার—অধ্যয়ন, শব্দ, ঊহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। গুরুর নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথাবৎ অক্ষরগ্রহণের নাম অধ্যয়ন। ইহার অপর নাম তার। গৃহীত অধ্যাত্মশাস্ত্রের অর্থাববোধের নাম শব্দ। ইহার নামান্তর সুতার। এই সিদ্ধিদ্বয় আত্মার শ্রবণ বলিয়া কথিত। ঊহ কিনা তর্ক। শাস্ত্রাবিরোধী যুক্তিদ্বারা সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের অবধারণই তর্ক। ইহাই আত্মার মনন বলিয়া অভিহিত। এই তৃতীয় সিদ্ধির অপর নাম তারতার। স্বয়ং যুক্তিদ্বারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিলেও যে পর্য্যন্ত তাহা অন্যের অর্থাৎ গুরুশিষ্য বা সব্রহ্মচারীর অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারা যায় না। অতএব সুহৃৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ গুরু-শিষ্য-সব্রহ্মচারী প্রভৃতির প্রাপ্তি চতুর্থসিদ্ধিরূপে কথিত হইয়াছে। ইহার নামান্তর রম্যক। বিবেকজ্ঞানের শুদ্ধির নাম দান। ইহার নামান্তর সদামুদিত। আদরপূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিরন্তর অনুশীলন বা অভ্যাস দ্বারা বিবেকখ্যাতির শুদ্ধিসম্পাদন হয়। পরিশুদ্ধ বিবেকখ্যাতিই সংশয়বিপর্য্যয়ের সমুচ্ছেদে সমর্থ। যাঁহারা আশা করেন যে, একবার তত্ত্বকথা শুনিয়াই তত্ত্বজ্ঞ হইবেন; অধিকন্তু, তত্ত্বকথা শুনিবার পরও মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হয় না দেখিয়া

তত্ত্বজ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞাননিরসনের সামর্থ্যে অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদের এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ করা উচিত। শুক্তিরজতাদি শতশত স্থলে দেখা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান অপনয়ন করিতে সমর্থ। রজ্জুসর্প-ভ্রম ও দিঙ্মোহাদিস্থলে দেখা গিয়াছে যে, অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞান পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অপনীত হয় না, অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাই অপনীত হয়। সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান বা অবিবেক অপরোক্ষ। সুতরাং বিবেক-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষত্বসম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের অভ্যাস আবশ্যক।

সে যাহা হউক, উপরে বাচস্পতিমিশ্রের মত প্রদর্শিত হইল। প্রবচন-ভাষ্যকারের মতে শিষ্যাচার্য্যভাবে গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করার নাম অধ্যয়নসিদ্ধি। শিষ্যাচার্য্যভাবে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করা হয় নাই, কিন্তু অন্যে অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, তাহা শুনিয়া বা স্বয়ং অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম শব্দ। উপদেশাদি ব্যতিরেকেই পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ স্বয়ং তত্ত্বের ঊহ করার নাম ঊহ। কোনও জ্ঞানী করুণাপরবশ হইয়া স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহার নিকট যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম সুহৃৎপ্রাপ্তি। কোন জ্ঞানীকে ধনদানদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ করার নাম দান। অধ্যয়ন, শব্দ ও ঊহ, এই তিনটি গৌণসিদ্ধি মুখ্যসিদ্ধিত্রয়ের অন্তরঙ্গ সাধন। সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান মন্দ-সাধন। বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি, এই তিনটি সিদ্ধির নিবারক কিনা প্রতিবন্ধক। তাঁহার মতে প্রত্যয়সর্গের মধ্যে সিদ্ধি উপাদেয়। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়। প্রত্যয়সর্গ ভিন্ন তন্মাত্র-সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধনত্ব হইতে পারে না। আবার তন্মাত্রসর্গ ভিন্ন প্রত্যয়সর্গ এবং তাহার পুরুষার্থসাধনত্ব সম্ভবে না। এইজন্য দ্বিবিধ সর্গের অর্থাৎ তন্মাত্রসর্গের ও প্রত্যয়সর্গের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ভোগ্য শব্দাদিবিষয় এবং ভোগায়তন শরীরদ্বয় ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসর্গের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কেন না, শব্দাদিবিষয় এবং শরীরদ্বয় তন্মাত্রসর্গের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না, ধর্ম্মাদি ভিন্ন

ইন্দ্রিয়াদি ও শরীরাদির সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যয়সর্গের আবশ্যকতাও অপরিহার্য্য। অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বিবেকখ্যাতিসাধ্য। বিবেকখ্যাতি—প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ উভয়সাপেক্ষ। এইহেতুও উভয়বিধ সর্গের আবশ্যকতা অনুভূত হইতে পারে। আপত্তি হইতে পারে যে, ধর্ম্মাদিসাপেক্ষ সৃষ্টি ও সৃষ্টিসাপেক্ষ ধর্ম্মাদি, সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হইতেছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাদিদ্বারা বর্ত্তমান শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বতরজন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাদিদ্বারা পূর্ব্বজন্মের শরীরাদি এবং পূর্ব্বতম জন্মে সমাচরিত ধর্ম্মাদিদ্বারা পূর্ব্বতর জন্মের শরীরাদি হইয়াছে। দার্শনিকদিগের মতে সংসার অনাদি বলিয়া আদিসর্গের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই অন্যোন্যাশ্রয় প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া দোষাবহ নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বীজাঙ্কুরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বীজ হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে বৃক্ষের উৎপত্তি, আবার বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বীজাঙ্কুরস্থলে অন্যোন্যাশ্রয় বা অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া দূষণাবহ হয় না। কর্ম্ম-প্রবাহ ও সৃষ্টিপ্রবাহ সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। আচার্য্যদের এ বিষয়ে মতভেদ নাই।

যদিও সংসারে বিচিত্র সুখভোগ করেন, এমন প্রাণীর অসদ্ভাব নাই, তথাপি জরা ও মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। সুতরাং সংসার স্বভাবতঃ দুঃখস্বরূপ, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কেন না, জরামরণাদিদুঃখ স্বাভাবিক। সুখ স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক-উপায়সাধ্য। জরামরণাদির জন্য কোন-রূপ চেষ্টাযত্ন করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টাযত্ন করিতে হয়। একজন দার্শনিক কুপিত-ফণিফণাচ্ছায়ার সহিত সাংসারিক সুখের উপমা দিয়াছেন। ফলতঃ উপরিভাগে শাণিতকৃপাণ সূক্ষ্মসূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্নভাগে উপ-বেশন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখানু-ষক্ত ও বিপৎসঙ্কুল। সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে রজোগুণ দুঃখাত্মক। সুতরাং সংসার দুঃখাত্মক হইবে, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। সত্য বটে সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, অতএব সংসারে

দুঃখ অপরিহার্য্য হইলেও সুখের অসদ্ভাব নাই। এ আপত্তি ভিত্তিশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কে বলে যে, সংসারে সুখ নাই? সংসারে সুখ আছে সত্য, কিন্তু দুঃখের তুলনায় তাহা নাই বলিলেও চলে। সাংসারিক সুখ কুপিতফণিফণাচ্ছায়ার তুল্য, এই উপমার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইতে পারে যে, সুখলেশ যৎসামান্য। দুঃখরাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ। মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ববহুল। সত্ত্ববহুল বলিয়াই তাহাতে সুখের আধিক্য আছে। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল। সুতরাং ভূলোকে দুঃখের আধিক্য স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত সৃষ্টি তমোবহুল, সুতরাং মোহময়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মরণ সর্ব্বসুখের আকর, মরণ দুঃখকর নহে। বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু কোন প্রমাণের দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিতে পারেন না। যে কথার কোনও প্রমাণ নাই, তাহার প্রতিবাদ করিয়া বৃথা সময়ক্ষয় না করাই সঙ্গত। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ কেহ ঐরূপ কথার প্রতি আস্থাস্থাপন করিয়া থাকেন। এইজন্য এ সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। কৃতবিদ্য শ্রোতৃমণ্ডলী ক্ষমা করিবেন। এস্থলে ধান ভানিতে শিবের গীতের ন্যায় একটি অসম্বদ্ধ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা দয়ালু মহর্ষিগণ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অনাদর করিতে—কেবল অনাদর করিতেই বা বলি কেন—কুসংস্কার বা মূর্খতানিবন্ধন অন্ধবিশ্বাস বলিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না, অথচ মরণ সুখের সোপান, উহাকে দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করা কুসংস্কার, ইত্যাকার ভিত্তিশূন্য কতগুলি কথার প্রতি বিলক্ষণ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঐরূপ আস্থাপ্রদর্শন না করিলে যেন অন্যায় করা হয় বিবেচনা করেন, কেমন যেন বাধবাধ বোধ করেন, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা বলিয়া ভাবেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ বা অধোগতির লক্ষণ বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কৃতবিদ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি

ইহার মীমাংসাভার অর্পণ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

সমস্ত প্রাণীরই মরণভয় স্বাভাবিক। কেহই মৃত্যুসম্ভাবনার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। সকল অবস্থায় সকল সময়ে আত্মরক্ষা ও মৃত্যুপরিহারের জন্য সকলেই যথাসাধ্য যত্ন করিয়া থাকেন, যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করেন। এতদ্দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, মৃত্যু সুখের সোপান নহে, উহা দুঃখকর। কেন না, দুঃখই ভয়ের কারণ, সুখ ভয়ের কারণ হয় না। যাঁহারা মৃত্যুকে সুখের সোপান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের চিত্তই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে মরণভয় বিলক্ষণ-রূপেই আছে। তাহা না হইলে মৃত্যুর নানাবিধ উপায় সুলভ ও স্বাধীন থাকা স্থলে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর হইত, মৃত্যুর ভয় করা কাহারও পক্ষে উচিত হইত না। সে যাহা হউক, সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা প্রকৃতিই কার্য্যমাত্রের কারণ। এই মতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন। চার্ব্বাক বলেন, কার্য্যমাত্রই নিষ্কারণ। কার্য্যের কোনও কারণ নাই, উহা আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, কার্য্য কাদাচিৎক, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ সকল সময়ে সকল কার্য্য হয় না, কোন সময়ে কোন কার্য্য হইয়া থাকে। কার্য্যের কারণ থাকিলে এই কাদাচিৎকত্ব উপপন্ন হয়। কেন না, যখন কারণ-কলাপের সমবধান বা মেলন হয়, তখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণকলাপের সমবধান সর্ব্বসময়ে হয় না বলিয়া সর্ব্বসময়ে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্য নিষ্কারণ হইলে কার্য্যের কাদাচিৎকত্ব উপপন্ন হয় না। তাহা হইলে হয় সর্ব্বকালেই সর্ব্বকার্য্য হইতে পারে, না হয় কোনকালেই হইতে পারে না। কারণ, কার্য্যের উৎপত্তির জন্য যখন কিছুই অপেক্ষণীয় নাই, তখন কার্য্যের উৎপত্তির বিলম্ব হওয়া অসম্ভব। অতএব চার্ব্বাকের আপত্তি সঙ্গত নহে। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতও সাংখ্যা-চার্য্যেরা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না। কেন না, চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম

অপরিণামী। ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম একান্তই অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ, ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতি অচেতন। অচেতন বস্তু চেতনপ্রবর্ত্তিত হইয়াই কার্য্যসম্পাদন করিয়া থাকে। বাসী অচেতন, কিন্তু চেতন-সূত্রধর-কর্তৃক অধিষ্ঠিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া ছেদনরূপ কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রকৃতিও অচেতন। অতএব তাহারও অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তয়িতারূপে কোন চেতনের স্বীকার করিতে হইতেছে। জীব-সকল চেতন হইলেও তাহারা প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ নহে। এইজন্য তাহারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। কেন না, বাস্যাদির স্বরূপের অভিজ্ঞ সূত্রধরাদিই বাস্যাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ চেতনই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। তিনিই ঈশ্বর। তবেই সিদ্ধ হইল যে, প্রকৃতিদ্বারা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, ঈশ্বরবাদীদিগের মতে ঈশ্বরের কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া নাই। সুতরাং তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূত্রধর যখন ব্যাপারযুক্ত হয়, তখনই বাস্যাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে, ব্যাপারশূন্য হইয়া বাস্যাদির অধিষ্ঠাতা হয় না। কেনই বা ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হন, কিজন্যই বা প্রকৃতির অধিষ্ঠানবিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি হয়, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হয় নিজের স্বার্থের জন্য, না হয় অপরের দুঃখপরিহারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের কোনরূপ স্বার্থ থাকিতে পারে না। কেন না, তিনি পরিপূর্ণ, তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই; সুতরাং প্রয়োজনীয় বা অপেক্ষণীয় এমন কোন বিষয় নাই,—যাহার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে। পরদুঃখ-প্রহরণের জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না। কেন না, সৃষ্টির পূর্ব্বে দুঃখই ছিল না। দুঃখও ত তাঁহারই সৃষ্ট। অপিচ, কারুণ্য ঈশ্বরপ্রবৃত্তির কারণ হইলে, ঈশ্বর করুণা করিয়া সমস্ত প্রাণীকে সুখী করিতেন, কাহাকেও দুঃখী করিতেন না। পূর্ব্বা-চরিত কর্ম্মের বৈচিত্র্য অনুসারে ঈশ্বর বিচিত্র প্রাণিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন —এ কথাও সমীচীন নহে। কেন না, কর্ম্মও অচেতন। চেতনের

অধিষ্ঠান ভিন্ন কর্ম্মও ফল জন্মাইতে পারে না। ঈশ্বরই সেই সকল কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কারুণ্য চরিতার্থ করিবার আরও এক সহজ উপায় এই হইতে পারিত যে, ঈশ্বর কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা না হইলেই শরীর ও দুঃখাদির উৎপত্তি হইত না। অতএব ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা নহেন; প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিকর্ত্রী। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেমন সভাসদ্দিগকে নৃত্যদর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ-প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোনরূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাঁহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করে না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎ স্খলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় একবারমাত্র কোন পুরুষ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, লজ্জায় যেমন দ্বিতীয়বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষকর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞানদ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি আর হয় না। পুরুষের আশ্রয়ে প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। বস্তুগত্যা পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই। ভৃত্যগত জয় ও পরাজয় যেমন স্বামীতে উপচরিত হয়, সেই-রূপ প্রকৃতিগত বন্ধমোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়। কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজেকে বন্ধন করে, প্রকৃতিও তেমনি নিজেই নিজেকে বন্ধন করে।

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে পূর্ব্বকথিত তত্ত্বসকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে, 'আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্বও নাই,' এইরূপ বিবেকবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানবাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেক-

জ্ঞানবাসনা অনাদিমতী, তথাপি বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং বিবেক-জ্ঞানবাসনা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করে। কেন না, তত্ত্ববিষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রবল ও মিথ্যাজ্ঞান দুর্ব্বল। বিরোধস্থলে প্রবল দুর্ব্বলের উচ্ছেদসাধন করে, ইহার শতশত দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধের আশঙ্কা এবং পুনর্ব্বার বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে না। যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতিদ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া, যাহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না। শব্দাদি-বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে। মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। উক্তরূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদিরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। বাচস্পতিমিশ্র বলেন—

ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে তত্ত্ব-জ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুর-প্রসবঃ।

জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে। প্রখর সূর্য্য-তাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ ঊষরভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদকতা অসম্ভব। তদ্রূপ, মিথ্যাজ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিতকর্ম্ম ফলজননে সমর্থ হয়। তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। উদ্ধৃতবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি ঊষর হইয়া যায়। তাদৃশ ঊষর ভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলপ্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভাবে অর্থাৎ যাহার ফলভোগজন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্তবেগ

বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। কুম্ভকার দণ্ডাদিদ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু ঐরূপে কয়েকবার চক্র ঘুরাইয়া দণ্ডটি তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্যসংস্কারবলে চক্র কিছুকাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও, যে কর্ম্ম ফল জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ প্রারব্ধফল-কর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। প্রারব্ধ-কর্ম্মফল-ভোগের পরে জ্ঞানীর দেহপাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পন্ন হয়। ঐকান্তিক কিনা অবশ্যম্ভাবী। আত্যন্তিক কিনা অবিনাশী। যেরূপ বলা হইল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধফল কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হয় না। অনারব্ধ-বিপাক বা অনারব্ধফল কর্ম্মাশয় তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দগ্ধবীজের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হয়, উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না। অতএব—

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি—

অর্থাৎ ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্পেও কর্ম্মক্ষয় হয় না—ইহা প্রারব্ধফল-কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন—

অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম করে—ইহা অনারব্ধবিপাক-কর্ম্মাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ আশঙ্কা করা অনুচিত।

নবম লেক্‌চর।

পাতঞ্জলদর্শন।

ভগবান্ পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা। পাতঞ্জলদর্শনের অপর নাম যোগদর্শন। এই দর্শনে যোগের বিস্তৃত ও বিশদ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিই যোগের উপদেষ্টা হইতে পারেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যোগী নহি। আমার বাক্য উপদেশরূপে গৃহীত না হয়, ইহা প্রার্থনীয়। দর্শনহিসাবে পাতঞ্জলদর্শনে আমার যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা যোগবিষয়ে উপদেশগ্রহণের অভিলাষী, তাঁহারা কোন যোগীর নিকট উপদিষ্ট হইবেন।

ভগবান্ বেদব্যাস পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত অথচ উপাদেয় ভাষ্য রচনা করেন। পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যাসকৃত, ইহা ভাষ্যে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু মাধবাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক আচার্য্যগণ যোগভাষ্য বেদব্যাসকৃত, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র পাতঞ্জলভাষ্যের উপর সমীচীন টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বকৃত টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

নত্বা পতঞ্জলিমৃষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে।
সংক্ষিপ্তস্পষ্টবহ্বর্থা ভাষ্যে ব্যাখ্যা বিধাস্যতে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—পতঞ্জলি-ঋষিকে প্রণাম করিয়া বেদব্যাসভাষিত ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, অথচ বহু অর্থ-প্রকাশক ব্যাখ্যা রচনা করিব। বাচস্পতিমিশ্রের মতে পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যাসরচিত, এ বিষয়ে সন্দেহই হইতে পারে না।

কিন্তু, 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' চেতনদিগের ঐকমত্যের আশা অনেকস্থলে নিষ্ফল হয়। বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায় অসামান্য আচার্য্যের সিদ্ধান্তও

সকলে অভ্রান্ত বিবেচনা করেন না। কেহ কেহ বলেন, ভগবান বেদব্যাস পাতঞ্জলভাষ্য রচনা করেন নাই। এই কল্পনার প্রমাণরূপে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শারীরকমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসাতে ভগবান্ বেদব্যাস "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—এই সূত্রদ্বারা পাতঞ্জলদর্শনের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাসের মতে পাতঞ্জলদর্শন শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অপ্রামাণিক। শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক বলিয়া বেদব্যাস যাহা নিজে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি তাহার ভাষ্যরচনা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অবিশ্বাস্য। যাঁহারা ইহা অনুধাবন না করিয়া বেদব্যাসকে পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকর্তার পদপ্রদানে সমুৎসুক, তাঁহারা প্রকারান্তরে নারায়ণের অংশাবতার ভগবান্ বেদব্যাসের মহিমায় কলঙ্ক আরোপ করেন, সন্দেহ নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের যুক্তি আপাতরমণীয় হইলেও নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য। বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি চিরন্তন আচার্য্যপরম্পরা পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাস্পচ্ছেদ্য অকিঞ্চিৎকর যুক্ত্যাভাসের সাহায্যে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সাহসিকতার পরিচায়ক হইতে পারে, অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় না। কেন হয় না, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় গৌণ ও মুখ্য ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গৌণবিষয়ের দোষে মুখ্যবিষয় দুষ্ট হইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গৌণবিষয়গুলি আনুষঙ্গিকভাবে বলা হয়, ঐ সকল বিষয়ে শাস্ত্রকারের তাৎপর্য্য বা নির্ভর থাকে না। মুখ্যবিষয়েই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য থাকে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সকল শাস্ত্রেই একটি বিষয় সমর্থন করিবার জন্য অনেকগুলি হেতুর উপন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভারতীয় আচার্য্যদিগের রীতিসিদ্ধ। কিন্তু উপন্যস্ত সমস্ত হেতুই সর্ব্বস্থলে অকাট্যপ্রমাণ হয় না। সচরাচর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হেতুতে অল্লাধিক দোষের সংস্রব থাকে। শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্য এবং তর্কশক্তির বিকাশের জন্য আচার্য্যেরা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ দোষস্পৃষ্ট হেতুরও নির্দ্দেশ করেন। সাধারণতঃ চরমনির্দ্দিষ্ট হেতুই নির্দ্দোষ ও সমীচীন হইয়া থাকে।

"সিদ্ধান্তে চোত্তরং বল্যম্"—অর্থাৎ একটি বিষয়ে একাধিক সিদ্ধান্তের অবতারণা থাকিলে, তন্মধ্যে পরনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বলবান্, সুতরাং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত অসমীচীন। ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের একটি গাথা। মীমাংসকাচার্য্যেরা বলিয়াছেন—"যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ"—অর্থাৎ যাহাতে শব্দের তাৎপর্য্য, তাহাই শব্দের অর্থ। এতদনুসারে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রার্থ। অনেক হেতুর উপন্যাসস্থলে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হেতুগুলি দুষ্ট ও অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হইলেও তদ্দ্বারা শাস্ত্রের দুষ্টতা বা অপ্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হয় না। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ অদুষ্ট ও অপ্রামাণিক হইলে তদ্দ্বারাই শাস্ত্রের প্রামাণিকত্ব রক্ষিত হয়। ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। ইহা অস্বীকার করিলে প্রায় সমস্ত শাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কেন না, প্রায় সর্ব্বত্রই বিষয়-বিশেষের সমর্থন করিবার জন্য একাধিক হেতুর অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ তাহাতে প্রায় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হেতুগুলি আংশিক-দোষ-সংস্পৃষ্ট। অতএব স্থির হইল যে, শাস্ত্রের মুখ্যবিষয় বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ নির্দ্দোষ ও প্রমাণসিদ্ধ হইলে, গৌণ বা আনুষঙ্গিক বিষয় দোষদুষ্ট ও প্রমাণবিরুদ্ধ হইলেও তদ্দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণিকত্ব বলা যাইতে পারে না।

এখন দেখিতে হইবে যে, যোগদর্শনে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মুখ্যবিষয় কি এবং গৌণবিষয়ই বা কি? এবং ব্রহ্ম-মীমাংসাতে যোগদর্শনের কোন্ বিষয়টিই বা খণ্ডিত হইয়াছে? কেন না, ব্রহ্মমীমাংসাতে যোগশাস্ত্রের মুখ্যবিষয় খণ্ডিত হইয়া থাকিলে যোগশাস্ত্রই খণ্ডিত এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং শ্রুতিবিরুদ্ধ যোগদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করা সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না, ইহা যথার্থ। পক্ষান্তরে, যোগশাস্ত্রের গৌণ বা আনুষঙ্গিক বিষয় শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অপ্রমাণ হইলেও তাহার মুখ্যবিষয়ের প্রামাণ্যের কোন বাধা হইতে পারে না। সুতরাং প্রামাণিক-যোগশাস্ত্রের ভাষ্যপ্রণয়ন করা সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে কোনমতেই অসঙ্গত বা অনুচিত বলা যায় না।

"অথ যোগানুশাসনম্।"—যোগদর্শনের এই প্রথম সূত্রের প্রতি লক্ষ্য

করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, যোগই যোগদর্শনের মুখ্যপ্রতিপাদ্য বিষয়। প্রধানমহদহঙ্কারাদি তাহার গৌণপ্রতিপাদ্য বা আনুষঙ্গিক বিষয়। অর্থাৎ পদার্থনিরূপণ যোগদর্শনের উদ্দেশ্য নহে, যোগের উপদেশই তাহার উদ্দেশ্য। কোন একটি দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া যোগের উপদেশ করিতে হইবে। কেন না, নিরালম্বন যোগ হইতে পারে না। যোগের আলম্বন বা বিষয়ের অপেক্ষা আছে। ন্যায় ও বৈশেষিকাদি দর্শনের পদার্থাবলী অধ্যাত্মবিদ্যার তাদৃশ উপযোগী নহে। শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অধ্যাত্মবিদ্যার অনেকটা কাছাকাছি। এইজন্য সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে মাত্র। সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে যেমন প্রত্যেক পদার্থ যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, যোগদর্শনে তাহা হয় নাই। এতাবতা বুঝা যাইতেছে যে, তাহা যোগদর্শনের মুখ্যবিষয় নহে, আনুষঙ্গিক বা গৌণ বিষয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, "স চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নো বেদান্তবাদস্য"—বৈদান্তিকদিগের ন্যায় সাংখ্যেরাও কার্য্য এবং কারণের অনন্যত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং সাংখ্যপক্ষ বেদান্তবাদের প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী। স্থির হইল যে, যোগদর্শনের মুখ্যবিষয় যোগ, প্রধান-মহদহঙ্কারাদি তাহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ বিষয়। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—এই ব্রহ্মমীমাংসাসূত্রদ্বারা যোগদর্শনের মুখ্য বা তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। গৌণ বা আনুষঙ্গিক বিষয় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 'এতেন' এই পদদ্বারা অবশ্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হেতুর পরামর্শ করা হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রটি এই—"ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ"—স্বতন্ত্র প্রধান জগতের কারণ এবং সাংখ্যপরিকল্পিত মহদহঙ্কার প্রভৃতি অপরাপর পদার্থগুলি বেদে উপলব্ধ হয় না, এইজন্য সাংখ্যদর্শন শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—অর্থাৎ এতদ্দ্বারা যোগদর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল। এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যোগদর্শনের অবলম্বিত সাংখ্যোক্ত পদার্থ-গুলিই নিরাকৃত হইয়াছে, যোগ নিরাকৃত হয় নাই। অর্থাৎ যোগদর্শনের গৌণ বা আনুষঙ্গিক বিষয়মাত্র ব্রহ্মমীমাংসাতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত মুখ্যার্থ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। কেন না, প্রধানমহদাদি শ্রুতিতে উপলব্ধ হয় না, সুতরাং যোগোক্ত প্রধানমহদাদিও প্রত্যাখ্যাত

হইল, "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই সূত্রটির এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। পক্ষান্তরে, প্রধানমহদাদি শ্রুতিতে উপলব্ধ হয় না, অতএব যোগ শ্রুতি-বিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক, ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। প্রধানমহদাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া যোগ শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যুত "তাং যোগমিতি মন্যন্তে", "বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্"—ইত্যাদি শ্রুতিতে যোগ নির্দ্দিষ্ট থাকায় যোগ শ্রুতিসিদ্ধ এবং প্রামাণিক বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয়। "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্"—ইত্যাদি শ্রুতিতে যোগশাস্ত্রোক্ত আসনাদিও উপদিষ্ট হইয়াছে। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যেত্যতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।"—অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান যোগস্মৃতিতে অতিদিষ্ট হইতেছে। কেন না, সাংখ্যস্মৃতির ন্যায় যোগস্মৃতিতেও স্বতন্ত্র প্রধান জগতের কারণরূপে এবং মহদাদি কার্য্যরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু লোকবেদপ্রসিদ্ধ নহে। যোগশাস্ত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত প্রধানমহদাদির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার নির্ভর নাই, অর্থাৎ উহা বিবক্ষিত নহে। এইজন্য যোগশাস্ত্রপ্রণেতা ভগবান্ বার্ষগণ্য বলিয়াছেন—

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥

সত্ত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ অধিষ্ঠান আত্মা দৃক্‌পথের অতীত। দৃক্‌পথপ্রাপ্ত অর্থাৎ দৃশ্য প্রধানমহদাদি মায়ার ন্যায় তুচ্ছ। কোন একটি আলম্বন ভিন্ন যোগ হইতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে গুণের কথা বলা হইয়াছে মাত্র। বস্তুগত্যা প্রধানমহদাদি বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ তাহাতে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই। কেন না, তাহা তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে। যোগীরাও উহা মায়ার ন্যায় তুচ্ছ বলিয়াই বিবেচনা করেন। ইহা যোগাচার্য্য বার্ষগণ্য স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। সুতরাং যোগাচার্য্য পতঞ্জলির মতও ঐরূপ, ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শেষনাগ

অর্থাৎ অনন্তদেব নাতিবিস্তৃত একখানি আর্য্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি বৈদান্তিক সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যমত তাঁহার অনুমোদিত হইলে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সমর্থন না করিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বৈদান্তিকসিদ্ধান্তের সমর্থন করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। স্মরণ করা উচিত যে, যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি অনন্তদেবের অবতার। "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—এই সূত্রের টীকায় বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—

"নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদানস্বতন্ত্রপ্রধানতদ্বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্র-গোচরং প্রামাণ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে। ন চৈতাবতৈষামপ্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি। যৎপরাণি হি তানি তত্রাপ্রামাণ্যেঽপ্রামাণ্যমশ্নুবীরন্। ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।"

এতদ্দ্বারা হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলি প্রভৃতির প্রণীত যোগশাস্ত্রের সর্ব্বথা-রূপে প্রামাণ্য নিরাকৃত হইতেছে না। স্বতন্ত্র প্রধান জগতের উপাদান, মহদহঙ্কারাদি তাহার কার্য্য, এই বিষয়ে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে। এতাবতা যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। কেন না, প্রধানাদির সদ্ভাবপ্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয় নহে। যোগ এবং তৎসাধনাদির নিরূপণই যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়। সে বিষয়ে যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইবার কোনও কারণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, মহাভারত এবং পুরাণে ভগবান্ বেদব্যাস যোগবিষয়ে বিস্তর উপদেশ দিয়াছেন। যোগ শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অপ্রমাণ হইলে, তিনি তাহা করিতেন না। সুতরাং যোগভাষ্য বেদব্যাসপ্রণীত, পূর্ব্বাচার্য্যদিগের এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ধারেশ্বর মহারাজ ভোজ পাতঞ্জলদর্শনের একখানি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। তিনি তাহার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, ভগবান্ পতঞ্জলি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বৈদ্যকগ্রন্থদ্বারা শারীরিক মল, ব্যাকরণ-দ্বারা বাচিক মল এবং যোগদ্বারা মানসিক মল অপনীত করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ভোজরাজের মতে ব্যাকরণমহাভাষ্যপ্রণেতা পতঞ্জলি এবং যোগশাস্ত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি অভিন্ন ব্যক্তি। পতঞ্জলি অনন্তদেবের অবতার। ভগবান্ অনন্তদেব পতঞ্জলিশরীর পরিগ্রহ করিয়া ব্যাকরণমহাভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এ বিষয়ে ভারতীয় আচার্য্যদিগের মতভেদ নাই। এইজন্য ব্যাকরণমহাভাষ্যের অপর নাম ফণিভাষ্য। ঐতিহাসিকদিগের মতে বেদব্যাসের আবির্ভাবকাল এবং পাণিনির আবির্ভাবকালের মধ্যে বিস্তর অন্তর; অর্থাৎ বেদব্যাসের আবির্ভাবের অনেককাল পরে পাণিনি আবির্ভূত হন। পাণিনির আবির্ভাবের অনল্পকাল পরে ফণিভাষ্য রচিত হয়। কেন না, পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র রচনা করেন। তদুপরি কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করেন। তৎপরে মহাভাষ্য রচিত হয়। মহাভাষ্যে বার্ত্তিকের বিস্তর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পতঞ্জলি বেদব্যাসের বহুকালপরবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার যোগসূত্রও বেদব্যাসের বহুকালপরবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই। এইজন্য যোগসূত্রের ভাষ্য বেদব্যাসরচিত হওয়া অসম্ভব। কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। ব্যাকরণমহাভাষ্যপ্রণেতা পতঞ্জলি এবং যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বেদব্যাস যোগভাষ্যের রচয়িতা কি না, এ সকল বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু কথিত আপত্তির সারবত্তা অতি অল্পই আছে। কারণ, বেদব্যাস চিরজীবী, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ভগবান্ অনন্তদেব কোন্ সময়ে পতঞ্জলিরূপে প্রাদুর্ভূত হন, এবং পতঞ্জলি শরীরপরিগ্রহ করিয়া কতকাল ভূতলে বিরাজমান ছিলেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। বেদব্যাসের আবির্ভাবের অনেক পরে মহাভাষ্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালেই পতঞ্জলির আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা কল্পনামাত্র। তাহা হইলেও চিরজীবী বেদব্যাসের পক্ষে যোগভাষ্যপ্রণয়ন কিছুই অসম্ভব নহে। পতঞ্জলি যোগী ছিলেন, যোগপ্রভাবে আয়ু বর্দ্ধিত হয়, ইহা অভিজ্ঞদিগের অবিদিত নাই। বর্ত্তমান সময়েও মিতাচারীদিগের সার্দ্ধশতবর্ষ জীবনের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, একজন রাজা তিনশত বৎসর কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইদানীন্তন কালে সংযমীদিগের

দীর্ঘজীবনের উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং যোগীদিগের দীর্ঘজীবন বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। ভোজদেবের অনুকূলে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহাই বলা হইল। এখন সমস্ত সামঞ্জস্যের ভার ঐতিহাসিকদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া অপরাপর বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে।

পাতঞ্জলদর্শনে ১৯৫টি সূত্র আছে। সূত্রগুলি চারি পাদে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পাদের নাম সমাধিপাদ, দ্বিতীয় পাদের নাম সাধনপাদ, তৃতীয় পাদের নাম বিভূতিপাদ, চতুর্থ পাদের নাম কৈবল্যপাদ। নামের দ্বারাই পরিচ্ছেদগুলির স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝা যাইতেছে। বাচস্পতিমিশ্র প্রত্যেক পাদের ব্যাখ্যাপরিসমাপ্তিকালে একএকটি শ্লোকদ্বারা পাদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

যোগস্যোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ উপবর্ণিতাঃ॥

যোগের উদ্দেশ ও লক্ষণ, বৃত্তির লক্ষণ, যোগের উপায় এবং যোগের প্রকারভেদ, এ সমস্ত প্রথম পাদে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্॥

ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, কর্ম্মফলের দুঃখত্ব এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়রূপ ব্যূহচতুষ্টয়, এই পাঁচটি বিষয় দ্বিতীয়পাদে বলা হইয়াছে।

অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।
সংযমাদ্ভূতিসংযোগস্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্॥

তৃতীয়পাদে যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ, পরিণাম, সংযমবিশেষদ্বারা বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যবিশেষ এবং বিবেকজ জ্ঞান ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

মুক্ত্যর্হচিত্তং পরলোকমেয়স্তুসিদ্ধয়ো ধর্ম্মঘনঃ সমাধিঃ।
দ্বয়ী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাঽস্মিন পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্যদুক্তম্॥

মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোকসিদ্ধি, বাহ্যার্থসম্ভাবসিদ্ধি, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি, ধর্ম্মমেঘ সমাধি, জীবন্মুক্তি, বিদেহকৈবল্য এবং প্রকৃতাপূরাদি চতুর্থপাদে কথিত হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর বিস্তর বিষয়ের

আলোচনা করা হইয়াছে। বেদব্যাসের ভাষ্য, বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্ব-বৈশারদীনাম্নী টীকা, ভোজরাজের বৃত্তি এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগ-বার্ত্তিক, এই গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। অপরাপর ব্যাখ্যা ও প্রকরণ-গ্রন্থও অনেকগুলি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে প্রকৃতপক্ষে যোগের উপদেষ্টা বিরল। সুতরাং আলোচনার হ্রাস-হওয়াতে অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে। অধিকন্তু, সাংখ্যদিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতঞ্জলদর্শনে অঙ্গীকৃত এবং সমর্থিত হইয়াছেন। পতঞ্জলি বলেন যে, যে সকল পদার্থের তারতম্য অনুভূত হয়, তাহার তারতম্য কোনস্থলে অবশ্যই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে। পরিমাণের তার-তম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুবল অপেক্ষা আমলক মহৎ, আমলক অপেক্ষা বিল্বফল মহৎ। এইরূপে মহৎ-পরিমাণের তারতম্য অনুভূত হইতেছে। অথচ আত্মাতে মহৎ-পরিমাণের নিরতিশয়ত্ব বা তারতম্যের বিশ্রান্তি সর্ব্বসম্মত। অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা মহান্। আত্মা অপেক্ষা মহদ্বস্তু দ্বিতীয় নাই। আত্মাতে মহৎ-পরিমাণ নিরতিশয় বা কাষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ চরম-উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। সেইরূপ জ্ঞানেরও তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে। একের জ্ঞান অপেক্ষা অপরের জ্ঞান অধিকবিষয়গ্রাহী দেখিতে পাওয়া যায়। দেবদত্ত যে পরিমাণে অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান বস্তু জানিতে পারেন বা জানেন, যজ্ঞদত্ত তদপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন বা জানেন। বিষ্ণুমিত্রের জ্ঞান তদপেক্ষাও অধিক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। সামান্য সামান্য অতীত-অনাগত বিষয় আমরাও জানিতে পারি, আমাদের অপেক্ষা অধিকবুদ্ধিশালী ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষা অধিকপরিমাণে অতীত-অনাগত বিষয় জানিতে পারেন। সুতরাং পরিমাণের ন্যায় জ্ঞানের তারতম্য আছে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, মূর্খ এবং পণ্ডিতের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য এবং পণ্ডিতের মধ্যেও পরস্পর জ্ঞানের ন্যূনাধিকভাব অর্থাৎ অল্প ও অধিকবিষয়গ্রাহিত্ব সকলেই অবগত আছেন। অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান বিষয় গ্রহণের আপেক্ষিক আধিক্য অনুভূত হইতেছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব এই আধিক্যও পরিমাণের ন্যায় অবশ্য কোনস্থলে চরমোৎকর্ষ

প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। যে স্থলে জ্ঞান চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। তিনিই ঈশ্বর। এই প্রণালী গণিত-শাস্ত্রের শ্রেঢ়ীব্যবহারের অনুরূপ। ঈশ্বর ব্রহ্মাদিরও গুরু। লোকে ঐশ্বর্য্যেরও তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিরতিশয়। তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যান্তর নাই,—থাকিতে পারে না। কেন না, যে ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য। যে স্থলে ঐশ্বর্য্য চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যান্তরও নাই। কেন না, তত্তুল্য ঐশ্বর্য্যান্তর থাকিলে ঐ ঐশ্বর্য্যশালীও ঈশ্বর বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু একাধিক ঈশ্বর থাকা অসম্ভব। কেন না, ঈশ্বরদ্বয়ের একটি বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক সময়ে কোনমতেই থাকিতে পারে না। সুতরাং একের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, একের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে। যাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কেন না, অস্মদাদির ন্যায় তাঁহার ইচ্ছারও বিঘাত আছে। মনে করুন, একটি বস্তুবিষয়ে এক ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল যে—ইহা নূতন হউক, অপর ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল যে—ইহা পুরাতন হউক। একটি বস্তুতে এককালে নবত্ব এবং পুরাতনত্ব, এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ কোনমতেই হইতে পারে না। এস্থলে একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। যাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, তিনি ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অতএব স্থির হইল, ঈশ্বর এক।

অন্যান্য পুরুষ অর্থাৎ জীবগণ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়সম্পর্ক-যুক্ত। ক্লেশাদি ভোগের হেতু। ঈশ্বর ক্লেশাদিসম্পর্কশূন্য, সুতরাং তাঁহার ভোগ নাই। যদিও ক্লেশাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, সুতরাং জীবাত্মাও বস্তুগত্যা ক্লেশাদিসম্পর্কশূন্য, তথাপি অন্তঃকরণধর্ম্ম ক্লেশাদি জীবাত্মাতে ব্যপদিষ্ট বা উপচরিত হয়। কেন না, পুরুষ বা জীবাত্মা, তদীয় ফলের ভোক্তা কিনা চেতয়িতা। বাস্তবিক, ভোগ বুদ্ধিস্থিত হইলেও জীবাত্মাতে তাহার ব্যপদেশ হয়। যেমন যোদ্ধৃস্থিত জয় বা পরাজয় স্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, কেন না, স্বামীই তাহার ফলভোক্তা; সেইরূপ বুদ্ধিস্থিত ভোগাদি

জীবাত্মাতে ব্যপদিষ্ট হয়। বুদ্ধিস্থ ক্লেশাদিও কিন্তু ঈশ্বরে ব্যপদিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের উপাধিরূপ বুদ্ধিসত্ত্ব অপরাপর পুরুষের উপাধিরূপ বুদ্ধিসত্ত্বের ন্যায় মলিন নহে। উহা বিশুদ্ধ। সুতরাং তাহাতে ক্লেশাদি আদৌ নাই।

ক্লেশ পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা কিনা মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান চারিপ্রকার—অনিত্য ভূলোক-দ্যুলোকাদিতে নিত্যখ্যাতি অর্থাৎ নিত্যত্বজ্ঞান; শরীর স্বভাবতঃ অশুচি, অশুচি শরীরে শুচিখ্যাতি; অনাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মখ্যাতি এবং দুঃখে সুখখ্যাতি। বৈষয়িক সুখ পরিণামে দুঃখের কারণ হয় বলিয়া দুঃখরূপ। সুখপ্রত্যয় চিত্তের পরিণামবিশেষ। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, তাহার পরিণামও অবশ্য ত্রিগুণাত্মক হইবে। তন্মধ্যে রজোগুণের পরিণাম দুঃখাত্মক। তাহা অপরিহার্য্য। সংসারী ব্যক্তি সুখভোগকালে এই অপরিহার্য্য দুঃখকণিকাকেও সুখ বলিয়াই বিবেচনা করে। যোগী কিন্তু সুখভোগকালেও দুঃখের অনুভব করিয়া ক্লিষ্ট হয়। যেমন ঊর্ণাতন্তু শরীরের অন্য অবয়বে ন্যস্ত হইলে স্পর্শদ্বারা দুঃখদায়ক হয় না, কিন্তু চক্ষুর্গোলকে ন্যস্ত হইলে দুঃখের হেতু হয়; সেইরূপ পরিণামদুঃখাদি সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ক্লেশকর না হইলেও অভিজ্ঞের পক্ষে ক্লেশকর হইয়া থাকে। অপুণ্যে পুণ্যখ্যাতি, অনর্থে অর্থখ্যাতিও অবিদ্যামধ্যে গণ্য। বুদ্ধি পরিণামিনী, পুরুষ অপরিণামী। সুতরাং বুদ্ধি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। বুদ্ধি ও পুরুষ বস্তুগত্যা পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়ের একরূপের ন্যায় প্রতীতির নাম অস্মিতা। সুখ এবং সুখসাধন বিষয়ে অভিলাষের নাম রাগ। দুঃখ এবং দুঃখসাধন বিষয়ে ক্রোধ বা জিঘাংসার নাম দ্বেষ। অভিনিবেশ—মরণভয়। জাতমাত্র প্রাণীরও মরণভয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতমাত্র প্রাণীর মরণদুঃখের অনুভব ইহজন্মে হয় নাই, অথচ তাহার মরণভয় হইয়া থাকে। মরণদুঃখের জ্ঞান ভিন্ন মরণভয় হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বজন্মে অনুভূত মরণদুঃখের স্মৃতি হইয়া তাহার মরণত্রাস উৎপন্ন হয়। এই মরণত্রাসদ্বারা পূর্ব্বজন্ম অনুমিত হইতেছে। কর্ম্ম চারিপ্রকার—কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল ও অশুক্লাকৃষ্ণ। নিরবচ্ছিন্ন পাপকর্ম্মের নাম কৃষ্ণকর্ম্ম, দুরাত্মাদিগের ঐ কর্ম্ম প্রায় হইয়া

থাকে। বহিঃসাধনসাধ্য কর্ম্মের নাম শুক্লকৃষ্ণ। কারণ, বহিঃসাধনসাধ্য যাগাদিকর্ম্মে কিছু-না-কিছু পরপীড়া ও পরানুগ্রহ থাকে। পরপীড়া থাকে বলিয়া তাহা কৃষ্ণ এবং পরানুগ্রহ থাকে বলিয়া তাহা শুক্ল। এইজন্য যাগাদিকর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ বলিয়া কথিত। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ধ্যানসাধ্য কর্ম্ম শুক্ল। কেন না, উহা বহিঃসাধনসাধ্য নহে বলিয়া উহাতে পরপীড়ার সংস্রব নাই। যোগীদিগের যোগানুষ্ঠান অশুক্লাকৃষ্ণ। কেন না, তাহাতে পরপীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পিত হয়। কর্ম্মফলের নাম বিপাক। বিপাক তিনপ্রকার—জন্ম, আয়ু ও ভোগ। বিপাকানুগুণ সংস্কারের নাম আশয়। অনুরূপ সংস্কার ভিন্ন বিপাকনির্ব্বাহ হয় না। করভজাতির ভোগজনিত বাসনা ভিন্ন করভজন্মসম্পাদক কর্ম্ম বিপাক অর্থাৎ করভজন্মরূপ ফল জন্মাইতে পারে না। কারণ, এরূপ সংস্কার ভিন্ন করভোচিত ভোগনির্ব্বাহই হইতে পারে না।

এই ক্লেশাদির সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্লেশাদিসম্পর্ক থাকে না বটে, কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের ক্লেশাদিসম্পর্ক ছিল। ঈশ্বরের ক্লেশাদিসম্পর্ক কোনকালে ছিল না, কোনকালে হইবে না। এইজন্য তিনি নিত্যমুক্ত। অপরাপর পুরুষের পক্ষে যোগের সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকারপূর্ব্বক ক্লেশাদির প্রহাণ করিতে হয়। এক্ষণে যোগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই পাঁচটি চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থা। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। রজোগুণের সমুদ্রেক বা আধিক্যহেতুক বস্তুদ্বয়ে পরিচালিত চিত্তের অত্যন্ত অস্থির অবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম ক্ষিপ্ত। তমোগুণের সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম মূঢ়। ক্ষিপ্ত-মূঢ় অবস্থাতে যোগের সম্ভাবনাই নাই। ক্ষিপ্ত অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষযুক্ত চিত্তের নাম বিক্ষিপ্ত। কিঞ্চিৎ বিশেষ কিনা অত্যন্ত অস্থির চিত্তের কাদাচিৎক বা ক্ষণিক স্থিরতা। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কদাচিৎ স্থিরতা হয় বলিয়া তৎকালে ক্ষণিক বৃত্তিনিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ বৃত্তিনিরোধ ক্লেশাদির পরিপন্থী বা নিবারক হয় না বলিয়া যোগশব্দবাচ্য হইতে পারে না। যে চিত্তবৃত্তিনিরোধ ক্লেশাদিক্ষয়ের সাধন, তাহাই যোগ। একাগ্র এবং

নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযুক্ত। ধ্যেয়বিষয়ে একতান চিত্তের নাম একাগ্র। যখন চিত্তের ধ্যেয়বিষয়িণী বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়, কেবল বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথাবিধ চিত্তের নাম নিরুদ্ধ। যোগ দুই-প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধচিত্তের যোগের নাম অসম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ। চিত্তের বৃত্তি দুইপ্রকার—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যে সকল বৃত্তি ক্লেশজনিত বা ক্লেশের হেতু এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রসবভূমি, তাহার নাম ক্লিষ্টবৃত্তি। সত্ত্ব ও পুরুষের বিবেকবিষয়িণী বৃত্তির নাম অক্লিষ্ট-বৃত্তি। সংক্ষেপতঃ রাজস ও তামস বৃত্তি ক্লিষ্ট, সাত্ত্বিক বৃত্তি অক্লিষ্ট। প্রকারান্তরে বৃত্তি পাঁচপ্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণবৃত্তি তিনপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ হইলে সম্বদ্ধবস্তুবিষয়ে চিত্তের বিশেষাব-ধারণপ্রধানা যে বৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। লিঙ্গনিবন্ধন সামান্যাব-ধারণপ্রধানা চিত্তবৃত্তির নাম অনুমান। শ্রোতার শব্দজনিত শব্দার্থ-বিষয়িণী বৃত্তি আগম। মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। সংশয়ও বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। বস্তু না থাকিলেও শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধন যে বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম বিকল্প। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ—ইহা একটি বিকল্পের উদাহরণ। কেন না, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, অর্থাৎ চৈতন্য ও পুরুষ একই পদার্থ। সুতরাং চৈতন্য ও পুরুষের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বস্তুগত্যা নাই। অথচ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ, এতাদৃশরূপে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে ব্যবহার হইতেছে। শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধি বিপর্য্যয়ের উদাহরণ। বিশেষদর্শন হইলে সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষেই রজতবুদ্ধি বাধিত বলিয়া প্রতীত হয়। বাধিত বলিয়া নিশ্চয় হইলে আর তদ্দ্বারা কোনরূপ ব্যবহার হয় না। বিকল্পস্থলে সর্ব্বসাধারণের বাধবুদ্ধি আদৌ হয় না। বিচারনিপুণ সুধীগণেরই বাধ-বুদ্ধি হইয়া থাকে। অথচ বাধবুদ্ধি হইলেও উহার ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না। বিপর্য্যয় এবং বিকল্পের এই সূক্ষ্ম ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। সুষুপ্তিকালীন চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। কোন কোন দার্শনিকের মতে

সুষুপ্তিকালে চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকে না বটে, কিন্তু পাতঞ্জলাদি-দর্শনের মতে সুষুপ্তিকালেও চিত্তের বৃত্তি থাকে। ঐ বৃত্তি কোন বাহ্যার্থ-বিষয়িণী নহে, অন্তর্বিষয়িণী। 'সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—সুপ্তোত্থিত পুরুষের এই প্রত্যবমর্শ বা স্মৃতি সুষুপ্তিকালে চিত্তবৃত্তির সদ্ভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। কেন না, অননুভূত বিষয়ে স্মৃতি হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে সুখ এবং জ্ঞানাভাবের অনুভব হইয়াছিল। বৃত্তি ভিন্ন অনুভব অসম্ভব। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, সুষুপ্তিকালেও চিত্তবৃত্তির সদ্ভাব থাকে। অনুভূত-বস্তু-বিষয়িণী বৃত্তির নাম স্মৃতি। এই পাঁচপ্রকারের অতিরিক্ত চিত্তবৃত্তি নাই। যে কোন বৃত্তি হউক না কেন, তাহা উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তির কোনও এক প্রকারের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উক্ত বৃত্তি-সকলের নিরোধ করিতে হয়। চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের যত্নের নাম অভ্যাস। সৎকারপূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্য্যাদিপূর্ব্বক নিরন্তরভাবে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাসের দৃঢ়তা হয়। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। অভ্যাসদ্বারা বিবেক উদ্ঘাটিত এবং বৈরাগ্য-দ্বারা বিষয়প্রবণতা নিবারিত হয়। সুখসম্ভোগাপন্নপ্রাণিবিষয়ে মৈত্রী, দুঃখিতপ্রাণিবিষয়ে করুণা, পুণ্যশীলবিষয়ে মুদিতা এবং পাপশীলবিষয়ে উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এই ভাবনাচতুষ্টয়দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সম্পন্ন হয়।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটি যোগের অঙ্গ। যোগাঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং বিবেকখ্যাতিরূপ সম্যক জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। যতই যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, ততই অশুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অশুদ্ধিক্ষয়ের অনুসারে বিবেকজ্ঞানের পরিদীপ্তিও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বা বিষয়ের অস্বীকরণের নাম যম। সর্ব্বকালে কোনরূপে কোনও প্রাণীর অভি-দ্রোহ বা পীড়া না করার নাম অহিংসা। সত্য, অস্তেয় প্রভৃতির দ্বারা অহিংসার নির্ম্মলতাসম্পাদন হয়। যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত হয়, ঠিক সেইরূপ বাক্য ও মনের অবস্থা হইলেই সত্য হইয়া থাকে। এক-

রূপ বুঝিয়া অন্যরূপ ব্যক্ত করিলে বা অন্যরূপ বলিবার জন্য অভিলাষ হইলে সত্য হয় না। কেন না, নিজের বোধ পুরুষান্তরে সংক্রান্ত বা সঞ্চারিত করিবার জন্যই বাক্য বলা হয়। সেই বাক্য যদি পুরুষান্তরের বঞ্চনা বা প্রতারণার কারণ হয়, তবে তাহা সত্য হইতে পারে না। কারণ, ঐ বাক্যদ্বারা পুরুষান্তরে স্ববোধের সঞ্চার হয় না, অন্যবিধ বোধের উৎপত্তি হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কুরুক্ষেত্রসংগ্রামে অশ্বত্থামানামক একটি হস্তী হত হয়। তাহা যুধিষ্ঠির জানিতেন। পরন্তু দ্রোণাচার্য্যকে শুনান হয় যে, তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি সন্দিহান হইয়া সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুধিষ্ঠির, সত্যই কি অশ্বত্থামা হত হইয়াছে?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।" যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর সত্য হয় নাই। কেন না, অশ্বত্থামানামক হস্তী হত হইয়াছে, ইহার অভিসন্ধান করিয়াই যুধিষ্ঠির ঐরূপ উত্তর করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। এস্থলে যুধিষ্ঠিরের বোধ হইয়াছিল,—হস্তী হত হওয়া বিষয়ে। দ্রোণাচার্য্যের বোধ হইয়াছিল,—তাঁহার পুত্র হত হওয়া বিষয়ে। সুতরাং দ্রোণাচার্য্যের অন্তঃকরণে যুধিষ্ঠিরের বোধের সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার অন্যরূপ বোধ হইয়াছিল। এইজন্য যুধিষ্ঠিরের বাক্য সত্য হয় নাই।

সর্ব্বভূতের উপকারের জন্যই বাক্যের প্রবৃত্তি হইয়াছে, ভূতের উপঘাত অর্থাৎ পীড়ার জন্য বাক্যের প্রবৃত্তি হয় নাই। যথাদৃষ্ট-যথাশ্রুত বিষয় বলিলেও যদি তাহা ভূতের উপঘাত সম্পাদন করে, তবে তাহা সত্যাভাসমাত্র। বস্তুগত্যা তাহা সত্য হয় না। অতএব বিবেচনাপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের হিতকর সত্য বলিবে। অশাস্ত্রীয় উপায়ে পরদ্রব্যগ্রহণের নাম স্তেয়। স্তেয়াভাব অস্তেয়। অনুরাগপূর্ব্বক স্ত্রীর দর্শনস্পর্শনাদি বিষয়ে লোলুপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য। বিষয়ের অর্জনদোষ, রক্ষণদোষ প্রভৃতির আলোচনাপূর্ব্বক বিষয়ের অস্বীকরণ—অপরিগ্রহ।

জাতি, দেশ, কাল, সময় অর্থাৎ নিয়ম—এতদ্দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বা অনিয়মিত, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বথা অব্যভিচরিত অহিংসাদি মহাব্রত বলিয়া

অভিহিত হইয়াছে। তাদৃশ অহিংসাদিই যোগীদিগের অবলম্বনীয়। ইহার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। মৎস্যঘাতকের মৎস্যেই হিংসা আছে, অন্যত্র নাই। তাহার অন্যত্র অহিংসা জাত্যবচ্ছিন্ন বা জাতিদ্বারা নিয়মিত। 'তীর্থে মৎস্যহিংসা করিব না'—ইহা হইল দেশাবচ্ছিন্ন অহিংসা। 'পুণ্যদিনে মৎস্যহিংসা করিব না'—ইহা কালাবচ্ছিন্ন অহিংসা। 'কেবল দেবব্রাহ্মণার্থ মৎস্যহিংসা করিব, অন্য কারণে করিব না'—ইহা সময়াবচ্ছিন্ন অহিংসা। সত্যাদিরও যথাসম্ভব জাতি, দেশ, কাল ও সময়াবচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। বাহুল্যভয়ে বিস্তৃত উদাহরণ দেওয়া গেল না।

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম নিয়ম। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃজ্জলাদিদ্বারা সম্পাদিত শরীরশুদ্ধি এবং পবিত্রবস্তুভোজন বাহ্য শৌচ। চিত্ত-মল-ক্ষালন আভ্যন্তর শৌচ। সন্নিহিত বস্তুর অধিক বস্তুর গ্রহণেচ্ছা না হওয়াই সন্তোষ। শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহন তপঃ। মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণবজপের নাম স্বাধ্যায়। ঈশ্বরপ্রণিধান কিনা পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মের অর্পণ করা। নিশ্চল অথচ সুখাবহ অবস্থান যদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহার নাম আসন। পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন প্রভৃতি অনেকপ্রকার আসন যোগশাস্ত্রে বিহিত আছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ রেচন ও পূরণপূর্ব্বক কুম্ভকের নাম প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়সকলের স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইলে চিত্তস্বরূপের অনুকারের ন্যায় অবস্থার নাম প্রত্যাহার। চিত্তের নিরোধ হইলে চিত্তের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলও আপনা-আপনিই নিরুদ্ধ হয়। ঐরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধই প্রত্যাহার। নাভিচক্রাদি আভ্যন্তরদেশে বা চন্দ্রাদি বাহ্যবিষয়ে চিত্তের বন্ধন বা বৃত্তিবিশেষের নাম ধারণা। অভিলষিত দেশে ধ্যেয়বিষয়ে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তিপ্রবাহের নাম ধ্যান। ধ্যান যখন ধ্যেয়াকারমাত্রের পরিস্ফূর্ত্তিসমন্বিত হয়, প্রত্যয়ের আকারের স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়।

যোগের কতগুলি অন্তরায় বা বিঘ্ন আছে। যাহা চিত্তবিক্ষেপক, তাহাই যোগের অন্তরায়। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য,

অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব, এইগুলি চিত্তের বিক্ষেপক এবং যোগের অন্তরায়। বাতপিত্তশ্লেষ্মরূপ ধাতুর, আশিত-পীত আহারের পরিণামবিশেষরূপ রসের ও ইন্দ্রিয়সকলের বৈষম্যের নাম ব্যাধি। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতার নাম স্ত্যান। 'ইহা এইরূপ কি অন্যরূপ'—ইত্যাকার অনিশ্চিত জ্ঞানের নাম সংশয়। সমাধিসাধনবিষয়ে যত্নের অভাবের নাম প্রমাদ। কফাদিহেতুক শরীরের, এবং তমোগুণের আধিক্যহেতু চিত্তের গুরুত্বনিবন্ধন অপ্রবৃত্তির নাম আলস্য। চিত্তের বিষয়তৃষ্ণার নাম অবিরতি। বিপর্য্যয়জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিদর্শন। সমাধি-যোগ্য ভূমি অর্থাৎ চিত্তাবস্থার অলাভের নাম অলব্ধভূমিকত্ব। যোগোপযুক্ত-ভূমি-লাভ হইলেও যদি তাবন্মাত্রেই অর্থাৎ ভূমিলাভমাত্রেই নিজেকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ সমাধির উপযুক্ত ভূমিলাভ হইলেও যদি সমাধিলাভ না হয় বা সমাধিভ্রষ্ট হওয়া যায়, তবে লব্ধ-ভূমি অবস্থিত থাকে না। ইহারই নাম অনবস্থিতত্ব। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস, এগুলি বিক্ষেপের সহচর; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপ হইলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখাদিও অবশ্য হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ ত্রিবিধ। ইচ্ছার অভিঘাত বা অপূর্ণতানিবন্ধন চিত্তের ক্ষোভের নাম দৌর্মনস্য। অঙ্গ-কম্পের হেতুর নাম অঙ্গমেজয়ত্ব। অনিচ্ছাবস্থাতেও প্রাণ বাহ্যবায়ুকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, ইহারই নাম শ্বাস। ঐরূপ আভ্যন্তরীণ বায়ুর নিঃসারণের নাম প্রশ্বাস। শ্বাস ও প্রশ্বাস প্রাণায়ামের প্রতি-কূল। বিক্ষেপনিবারণের জন্য ঈশ্বরচিন্তাতে চিত্তকে অভ্যস্ত করিবে, প্রণবের জপ করিবে এবং প্রণবপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরের ভাবনা করিবে। প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনারও অপর নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। তদ্দ্বারা অন্তরায়ের অভাব এবং প্রত্যক্‌-চেতনের অর্থাৎ অবিদ্যাশালী জীবাত্মার যথার্থস্বরূপের জ্ঞান হয়। চিত্তের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্যসম্পাদনের অনেক-গুলি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান উৎকৃষ্ট এবং সুলভ উপায়। এইজন্য তন্মাত্রই প্রদর্শিত হইল।

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ। সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির সমাধিযোগে অধিকার; বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগের

অধিকারী নহে, ক্রিয়াযোগের অধিকারী। প্রথমাধিকারী ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্দ্বারা কালে তাহার ক্লেশসকল তনূকৃত হয় এবং সমাধিযোগের যোগ্যতালাভ হয়। রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য ভেদে চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন চতুর্ব্যূহ বা চতুরবয়ব, তদ্রূপ সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে অথবা হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় ভেদে যোগশাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ। তন্মধ্যে দুঃখবহুল সংসার হেয়। প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু। সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান। সম্যগ্দর্শন বা বিবেকখ্যাতি হানোপায় অর্থাৎ হানের কারণ। ভাষ্যকারের মতে কারণ নয়প্রকার। যথা—

উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ।
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্॥

অর্থাৎ উৎপত্তিকারণ, স্থিতিকারণ, অভিব্যক্তিকারণ, বিকারকারণ, প্রত্যয়কারণ, প্রাপ্তিকারণ, বিয়োগকারণ, অন্যত্বকারণ ও ধৃতিকারণ ভেদে কারণ নয়প্রকার।

বিজ্ঞানের অর্থাৎ বৃত্তির উৎপত্তিকারণ মন। মনের স্থিতিকারণ পুরুষার্থতা। শরীরের স্থিতিকারণ আহার। আলোক রূপের অভিব্যক্তিকারণ। বিষয়ান্তর মনের বিকারকারণ, যেমন তপস্বীদিগের অপ্সরোদর্শনাদি। পাক্যবস্তুর বিকারকারণ অগ্নি ইত্যাদি। ধূমজ্ঞান অগ্নির প্রত্যয়কারণ। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ। স্বর্ণকার সুবর্ণের অন্যত্বকারণ। কেন না, স্বর্ণকার কুণ্ডলকে বলয় ও বলয়কে কুণ্ডল করিয়া থাকে। শরীর ইন্দ্রিয়ের ধৃতিকারণ। স্থাবরজঙ্গমাদিও পরস্পর পরস্পরের ধৃতিকারণ। কেন না, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি জঙ্গমপদার্থ এবং ফলমূলাদি স্থাবরপদার্থের ভক্ষণদ্বারা মনুষ্যশরীর ধৃত হয়, ব্যাঘ্রাদির শরীর মনুষ্যাদিশরীরভক্ষণদ্বারা ধৃত হয়। এবং মনুষ্যাদির মাংসরুধিরাদি 'সার'রূপে পরিণত হইয়া স্থাবরের পরিপোষণ করে ও তাহার ধৃতিকারণ হয়। ফলতঃ, পাতঞ্জলদর্শনের মতে সমস্ত বস্তুতেই সমস্ত শক্তি আছে বলিয়া সমস্ত বস্তুই সমস্তাত্মক। জলভূমির যেরূপ রূপরস অনুভূত হয়, ফলপল্লবাদিতে তাহার নানারূপ বিচিত্র পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায় স্থাবরের বিচিত্র পরিণাম জঙ্গমে-

দৃষ্ট হয়। কেন না, মনুষ্যাদি ফলাদিভোজন করিয়া রূপবিশেষ প্রাপ্ত হয়। সমস্ত বস্তু সমস্তাত্মক হইলেও দেশকালভেদে কোন কোন বস্তুতে কোন কোন শক্তির বিকাশ হয় মাত্র। কোন শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া অপরাপর শক্তির অসদ্ভাব বলা যায় না। যেমন চৈত্র একটি স্ত্রীতে অনুরক্ত হইলেও অন্যান্য স্ত্রীতে বিরক্ত, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না, কালান্তরে অন্য স্ত্রীতেও তাহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, এক স্ত্রীতে অনুরাগকালেও অপরাপর স্ত্রীতেও অনুরাগ আছে। কিন্তু চৈত্র যে স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়াছে, ঐ স্ত্রীতে অনুরাগ তৎকালে বৃত্তিলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। অপরাপর স্ত্রীতে অনুরাগ ভবিষ্যদ্বৃত্তি অর্থাৎ তৎকালে বৃত্তিলাভ করে নাই কিনা পরিস্ফুট হয় নাই, প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। তদ্রূপ জল ও ভূমির ফল-পল্লবাদিতে রূপরসের যে বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে, ঐ পরিণামশক্তি তৎকালে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। যাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেও অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। কেন না, সৎকার্য্যবাদে কোন অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বা অনভিব্যক্ত শক্তিকে অব্যপদেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সৎ-কার্য্যবাদে অসদুৎপত্তি অলীক কথা। সুতরাং অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মূলকারণে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় জগতের মূলকারণ। জগৎ ত্রিগুণাত্মক। শক্তি আর কিছুই নহে, কার্য্যের সূক্ষ্মাবস্থামাত্র। সুতরাং সমস্ত বস্তু সমস্তাত্মক, ইহা ধ্রুব-সত্য, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

পরিণাম কিনা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। পরিণাম তিনপ্রকার—ধর্ম্ম-পরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম। পৃথিব্যাদি ধর্ম্মীর মনুষ্যাদি-শরীর ও ঘটাদিরূপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তির নাম ধর্ম্মপরিণাম। মনুষ্যাদি-শরীর ও ঘটাদি পূর্ব্বে অনাগত ছিল, এখন বর্ত্তমান হইয়াছে, পরে অতীত হইবে। অতএব মনুষ্যশরীর ও ঘটাদিধর্ম্মের অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীতরূপতার নাম লক্ষণপরিণাম। বর্ত্তমানলক্ষণাপন্ন মনুষ্যশরীরের বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য এবং ঘটাদির নূতনত্ব ও পুরাণত্ব অবস্থাপরিণাম। জগৎ ত্রিগুণাত্মক। গুণসকল পরিণামস্বভাব। তাহারা ক্ষণকালও পরিণামশূন্য

হইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত বস্তুই প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। তাহা সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য হয় না, এইমাত্র বিশেষ। বস্ত্র পুরাতন হইয়া যায়। কিন্তু এই পুরাতনতা একদিনে হয় না, ক্ষণে ক্ষণে অবস্থা-পরিণাম হইয়া পরিশেষে যখন তাহা অভিব্যক্ত হয়, তখন পুরাতনত্ব অনুভূত হয়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর পরস্পর ভেদবিবক্ষা করিয়া এই ত্রিবিধ পরিণাম বলা হইল। ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদপক্ষে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম দ্বারা ধর্ম্মীর পরিণামেরই প্রপঞ্চন হইতেছে মাত্র। পরমার্থপক্ষে দেখিতে গেলে পরিণাম এক, অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিণাম একই পরিণামের অন্তর্গত হইতেছে।

প্রথম বর্ষ সমাপ্ত।